মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা

গবেষক

বিদ্যুৎকুমার দাস

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মঞ্জুলা বেরা

প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

LIBRARY

NBU, DARJEELING

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০১২

Th
80·01
বিষ্ণু / মর্ন

271075
07 JUN 2014

প্রাক্-কথন

ছাত্রজীবনে আমি ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের'যোগাযোগ' উপন্যাসটি দ্বিতীয়বার পাঠ করি। দ্বিতীয় পাঠের সময়েই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ঘরেবাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাসে দেখেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদন-কুমুদিনীর দাম্পত্য-জীবনের সমস্যা-সংকটের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিকে আমার প্রধান কারণ বলে মনে হয় নি। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, এক্ষেত্রে মুখ্য কারণ কী? মনোবিজ্ঞানসম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা আমার ছিলই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকার সুবাদে। এর পর আমি মনোবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে থাকি কিছু জেগে ওঠা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য। এই ভাবে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যার কারণও আমি মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে ভাবতে শুরু করি। দেখা যায়, দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য নষ্টের জন্য পুরুষ বা নারীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দায়ী যার সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। অর্থাৎ শুধু ব্যক্তিত্ব বা রুচিবোধের দ্বন্দ্ব নয়, ব্যক্তির অচেতন বা অবচেতনের কিছু মৌলিক প্রবণতা এ ধরণের দূরত্ব তৈরি করে। এই একটি ক্ষেত্রে আমার ছাত্র সুলভ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর পাবার পর আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে মীমাংসা তথা উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমার জিজ্ঞাসা আরও ব্যাপ্ত হয় এবং স্নাতকোত্তর পাশ করার পর, বিশেষতঃ শিক্ষকতার পেশায় বৃত হবার পর এই ব্যাপ্ত অনুসন্ধিৎসাকে আমি লালন করতে থাকি। আমার এই অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরার কাছে। তিনি আমার এই জিজ্ঞাসাকে বিদ্যায়তনিক কাঠামোর মধ্যে (academic frame work) বিন্যস্ত করে, পদ্ধতিগত ভাবে সাজিয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত অনুসন্ধানে তৎপর হবার জন্য উৎসাহ দেন।

এরপর আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডঃ বেরার তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজে অগ্রসর হই। গবেষণা কর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ডঃ মঞ্জুলা বেরা আমাকে নিয়মিত উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

তাঁর মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ ছাড়া এই গবেষণাকর্ম সুসম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। এই গবেষণা চালাতে গিয়ে আমি আমার সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকের কাছ থেকেই আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রয়োজনীয় গ্রন্থের জন্য আমি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, এ.বি.এন.শীল কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এ.বি.এন.শীল কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার প্রভৃতি থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। ঐ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে, গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকে জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

স্থান ঃ- কোচবিহার

বিদ্যুৎকুমার দাস

তারিখ ঃ- ১৯-১১-২০১২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রাক্‌কথন	ক-খ
ভূমিকা	১-৭
প্রথম অধ্যায় ঃ দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যান	৮- ২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বঙ্কিম উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ	২৮-৯১
তৃতীয় অধ্যায় ঃ রবীন্দ্র উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ	৯২-২৩৮
চতুর্থ অধ্যায় ঃ শরৎ-উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ।	২৩৯-২৭৪
উপসংহার	২৭৫-২৭৯
গ্রন্থপঞ্জি	২৮০-২৯০

ভূমিকা

উপন্যাস জীবনের দর্পণ। শুধু উপন্যাস কেন যে কোনো সাহিত্যই জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে। কিন্তু উপন্যাসের গুরুত্ব এই যে, যে জীবন আমরা যাপন করি এবং যে জীবনের স্বপ্নে আমরা সর্বক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকি, তাদের মধ্যে এক সংযোগ রচনার প্রয়াস করে উপন্যাস। অর্থাৎ আমাদের বাস্তব জীবন শুধু চিত্রিত হয় না উপন্যাসে, বাস্তব জীবনের পাশাপাশি ধরতে না-পারা পলায়নমুখী যে জীবনের বিস্তার — উপন্যাস সেই জীবনকেই ধরার চেষ্টা করে হয়ে ওঠে সেই জীবনেরই শিল্পিত রূপ। লেখকের যেমন আগ্রহ সেই জীবনের প্রতি, সামাজিক মানুষ হিসেবে পাঠকেরও সমান আগ্রহ সেই জীবনের প্রতি। তাই উপন্যাস লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ-সেতু তৈরি করে হয়ে ওঠে এক সামগ্রিক জীবনের ভাষ্য। বাস্তব জীবনের যে সামগ্রিকতাকে আমরা ধরতে পারি না, উপন্যাসে তারই মুখোমুখি হওয়ার প্রয়াস পাই। আধুনিক মানুষ শুধু অনুভূতি নয়, শুধু কর্ম নয়, যখন এ সবেরও উপরে সমাজ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে অথবা নিছক ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক সংকটে বিদীর্ণ হতে শুরু করল, উপন্যাসের জন্ম সেই মহালগ্নে। তাই উপন্যাস বার বার ধাক্কা দিয়েছে মনের গহন অন্দরে, খুঁজে নিয়েছে ব্যক্তিত্বের বহুমুখী দ্বন্দ্বকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিঃ) থেকেই সেই প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। বন্দী পিতৃশত্রুকে আয়েষা যখন প্রাণেশ্বর বলে উল্লেখ করে, তখনই তার ব্যক্তিত্বের বহুমুখী দ্বন্দ্ব যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি কপালকুণ্ডলার আত্মবিসর্জন, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু, রোহিণীর তীব্র জীবন-সংযোগ, কারাগারে গোরার আত্মোপলব্ধি, বিনোদিনী-অচলার শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ একাকীত্বের যন্ত্রণা — সেই দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণতিকেই স্পষ্ট করে।

জীবন মানেই নানাবিধ সম্পর্কের ওঠাপড়া, নানা সম্পর্কের আসা-যাওয়া। — এই বহুধা বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে দ্বান্দ্বিক অথচ প্রায় অপরিহার্য সম্পর্ক সম্ভবত দাম্পত্য-সম্পর্ক। জীবনের সমগ্রতার সন্ধানে এগিয়ে চলা উপন্যাসেও নানা ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই সম্পর্কের জটিল গভীর রূপ। বাংলা

উপন্যাসে কীভাবে বিস্তার পেয়েছে এই সম্পর্কের গভীরতা, কীভাবে মূর্ত হয়েছে এই সম্পর্কের হাসি-কান্না, আনন্দ-যন্ত্রণা বিদীর্ণ রূপ —— আলোচ্য গবেষণা-অভিসন্দর্ভে তারই বিশ্লেষণে আমরা প্রয়াসী হয়েছি। 'মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা' শীর্ষক আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে চেয়েছি। বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সংকটের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সে বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা যে কোথাও কিছু হয়নি এমন নয়। কিন্তু সেসব আলোচনা-সমালোচনায় সম্পূর্ণভাবে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার প্রযত্ন আমাদের চোখে পড়েনি। তাই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে সেই অসম্পূর্ণতা দূর করে বিষয়টির একটি স্পষ্ট পূর্ণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব। উপন্যাস আধুনিকসভ্যতার দান। সেই আধুনিকতা ব্যক্তি ও সমাজের এবং ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক সংকট ও দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। আমাদের বর্তমান সন্দর্ভে এর সঙ্গে মনস্তত্ত্বের গভীর সংযোগ দেখানোর চেষ্টা থাকবে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক সূচনা পর্ব থেকে তিনজন মুখ্য ঔপন্যাসিক —— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে অবলম্বন করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব দাম্পত্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক কারণ ; দেখব দাম্পত্য-সংকটের চিত্র কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের উপন্যাসে ; কীভাবে তা কাহিনি ও চরিত্রের পরিণতির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক বা দিক-নির্দেশক হয়ে উঠেছে।

সমাজবীক্ষা ও অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে আমরা দেখেছি বঙ্কিম-উপন্যাসের দাম্পত্য-সংকটের মূলে রয়েছে নায়কের রূপজ মোহ এবং গুরুতর সামাজিক সমস্যা, রবীন্দ্রনাথে এই সঙ্কটের চেহারা বিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধের দ্বন্দ্বে, শরৎচন্দ্রে তা পরিণতি পায় সমাজ-বিধৃত ব্যক্তির সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যে। —— এই তিনজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনার কালপর্বে সময় বদলেছে আশ্চর্য গতিতে। বদলেছে চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, তার অর্জিত চেতনা। তার ফলে দাম্পত্য-সম্পর্কের বিন্যাসও গেছে বদলে। কী সেই পরিবর্তন? কোথায় তার স্বকীয়তা; কোথায় তার গূঢ় জটিলতা এবং কোথায় তা

জীবনের যথার্থ ভাষ্য — বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে এই সব বিষয়ে বিস্তারিত ও অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ থাকবে।

'মনস্তত্ত্ব' একটি আধুনিক চর্চার বিষয়। উনিশ শতকে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ গুস্তাভ ফেকনার (১৮০৩ খ্রিঃ -১৮৮৭ খ্রিঃ) মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে ঐ শতকে মনস্তত্ত্বের ধারণা তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। মনস্তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটে বিশ শতকের সূচনায় সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রিঃ) ও Psycho-pathology of Everyday life (১৯০৪ খ্রি.) প্রকাশিত হলে। ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে জানান, মানুষ তার মনের কারখানা ঘরেরও মালিক নয়। মানুষের মনের চেতন অংশ হল সমগ্র মনের খন্ডাংশ মাত্র। শুধুমাত্র চেতন স্তরের মাধ্যমে ব্যক্তিমনের সমগ্ররূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনের আরো দুটি স্তরের কথা জানান — অবচেতন বা প্রাক্‌চেতন (Pre-conscious or Sub-conscious level) ও অচেতন বা নির্জ্ঞান অংশ (Uconscious level)। মনের ঐ দুটি স্তরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে ব্যক্তির মানসিক রোগ ও আচার-আচরণের অসঙ্গতির কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি জানান যে, বাল্য ও কৈশরের যেসব কামনা-বাসনা চরিতার্থ হতে পারে না, তারা মনের নির্জ্ঞান গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, কখনোই বিলুপ্ত হয় না। মনের অবরুদ্ধ ও অসামাজিক কামনা-বাসনা সুযোগ পেলেই বিভিন্ন ছদ্মবেশে বা বিকৃত রূপে চেতন স্তরের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ভুলভ্রান্তি, অগোচর আবেগ, স্বপ্ন, মুদ্রাদোষ, মনোরোগ ও মানসিক বিকৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন।

বিশ শতকের চিন্তা জগতে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা মনের গোপন রাজ্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকেরা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পাত্র-পাত্রীর আচার-আচরণ, তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে থাকেন। উপন্যাসে ঘটনা-প্রাধান্য হ্রাস পায়, চরিত্রায়নের প্রাধান্য দেখা যায়। অষ্টাদশ

শতকে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা' (১৭৪০ খ্রি.) রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে সাধারণ মানুষের স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটেছিল। উপন্যাসটিতে রাজা-রাজড়ার কাহিনি নয়, একজন সাধারণ দাসীর সুখ-দুঃখ ভরা জীবনকথা অকপটে প্রকাশিত হয়। বিশ শতকে মনস্তত্ত্বের প্রসারের ফলে উপন্যাস-শিল্প আরো অনেকদূর এগিয়ে যায় — উপন্যাস মানব-স্বীকৃতি থেকে বিবর্তিত হয়ে মানব-মনের স্বীকৃতির স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। বিশ শতকের পূর্বে ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনের উপরি স্তরের আবেগ-অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিতেন। পাত্র-পাত্রী হৃদয়াবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে যে সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম সংঘটিত করত , উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায় তাদের ফুটিয়ে তুলতেন। বিশ শতকে মন-সম্পর্কিত ধারণা বদলে যায়। মন বলতে ঔপন্যাসিকেরা চেতন মনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় গোপন মনকেই বুঝতে শুরু করেন। চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা চেতন-উর্ধ্ব মনের গভীরতম প্রদেশের নিগূঢ় প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদানের কথাই ভাবলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন, পাত্র-পাত্রীর বাহ্য ক্রিয়া-কলাপে তাদের সমগ্র পরিচয় ধরা পড়ে না। ঐ সব ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে যে সব আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি সক্রিয় থাকে, চরিত্রের সম্পূর্ণায়নের জন্য তাদের পরিচয় ও প্রকাশিত হওয়া দরকার। তাই ঔপন্যাসিকেরা নির্জ্ঞান মনের অবদমিত আবেগ-অনুভূতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্য 'সাহিত্যিক চরিত্র' সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন। 'সাহিত্যিক চরিত্র' বাস্তবে দেখা চরিত্র থেকে একটু আলাদা ধরনের। সাহিত্য-সমালোচক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন—''উপন্যাসের চরিত্র মাত্রেরই দুটি মাত্রা আছে। এক দিকে সে বাইরের জীবনের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে সে অন্তর্জীবনের আলোড়নে আলোড়িত। এই দ্বিমাত্রিক গতিবিধি নিয়েই তার তথাকথিত 'চরিত্র' নামটি সার্থক। এই সূত্রেই 'সাহিত্যিক চরিত্র' 'বাস্তব চরিত্র' থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জীবন যাপন বা জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বাস্তব মানুষের গতিবিধিকে ভিতরে আমরা বাইরে থেকে দেখি। আর সাহিত্যিক চরিত্রকে একই সঙ্গে আমরা ভিতরে বাইরে দেখি।'' ('চৈতন্যের গভীরে', উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯, দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮, পৃ.৪৯।)

'আঁতের কথা' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয় 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসটি রচনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'' সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।'' (চোখের বালি, সূচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ২১২।)

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন— ''চোখের বালি'-কে উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার সূত্রপাত।'' (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৯।)

'চোখের বালি' উপন্যাসটিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ পাত্র-পাত্রীর অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র রূপায়িত করেছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চোখের বালি' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—''চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথের প্রথম শক্তিমান সৃষ্টি। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের পাত্র-পাত্রীকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম কাহিনির ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করলেন।'' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুন ১৯৮০, পৃ. ১৩৮।) এরপর বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেও উপন্যাসে চরিত্রায়নের প্রতিই ঝোঁক দেখা যায়। আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় 'মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা'। স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে — ফ্রয়েড বা ফ্রয়েড-সমসাময়িক

অথবা ফ্রয়েড-পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীদের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সম্পর্ক কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে কোনো মনস্তত্ত্বেরই তাত্ত্বিক সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। আমাদের বক্তব্যও তাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ভগীরথ। বাংলা উপন্যাস তাঁর হাতেই প্রথম শিল্প-সম্মত রূপ লাভ করে। তাঁর উপন্যাস রচনার সময়কাল —১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ে বাঙালি ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে নবজীবনরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই নবজীবনের উদ্‌গাতা। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম সন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি ও অসামান্য সৃজনী প্রতিভার দ্বারা বাংলা উপন্যাসে অনেক নতুন বিষয়ের অবতারণা করে পথিকৃৎরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আধুনিক উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিকতা বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলতে যা বোঝায়, প্রকৃষ্ট অর্থে তার প্রয়োগ বঙ্কিম উপন্যাসে নেই। তবে তাঁর উপন্যাসে চেতন-উর্ধ্ব মনের ইঙ্গিত রয়েছে। রয়েছে মনের দুর্জ্ঞেয় প্রদেশ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার পরিচয়। তিনি তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে উপন্যাসের আখ্যানে বিধৃত পাত্র-পাত্রীদের মানসিক অবস্থার দিকটি লক্ষ্য করে তাদের মানস-জগতের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নর-নারীর দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে মনের গহন গভীরে সৃষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে উপন্যাস-শিল্প পৌঁছে গিয়েছে একটা বিশিষ্ট স্থানে।

আমরা তাই মনস্তত্ত্বের আলোচনায় বঙ্কিম উপন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক কারণ আলোচনার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের আলোচনাকেও প্রাসঙ্গিক মনে করে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মনস্তত্ত্বের প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহের কথা আমরা জানি; তিনি মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার কালে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি, মনস্তাত্ত্বিক ধারণার বিকাশও সেইভাবে ঘটে নি। আর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস বিশ শতকের সূচনালগ্নেই প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির রচনা শুরু হয়েছিল ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams'

(১৯০০ খ্রিঃ) ও 'Psycho-pathology of Everyday life' (১৯০৪ খ্রি.) গ্রন্থদুটি প্রকাশের পূর্বেই। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব সর্বাধিক হলেও একথা বলা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রি.) উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাত্র-পাত্রীর 'আঁতের কথা' শিল্পরূপ দেন। তাই ফ্রয়েড, ফ্রয়েড়-সমসাময়িক বা ফ্রয়েড-উত্তর কালের মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কার কোন্ তত্ত্বের প্রভাব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই প্রধান তিন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যা চিত্রণের ক্ষেত্রে পড়েছে — সে বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে রাখি নি। পাত্র-পাত্রীর অবদমিত কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তির প্রাবল্য, চরিত্রের অন্তর্নিহিত ঈর্ষাবোধ, হীনতাবোধের ধারণা প্রভৃতি যে সব মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্য উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের দাম্পত্য-জীবনে সমস্যা সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে সেই কারণগুলিকেই আমরা মনস্তত্ত্বের সাধারণ পারিভাষিক শব্দাবলীর সাহায্যে চিহ্নিত করে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে তাদের সমস্যা-সংকটের স্বরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আমাদের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের নির্যাসকে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে নিম্নরূপ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি —

প্রথম অধ্যায় ঃ দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বঙ্কিম উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রবীন্দ্র উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ শরৎ-উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ।

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় তত্ত্ব ব্যাখান

সামাজিক নিয়ম মেনে দুই'জন অনাত্মীয় নারী-পুরুষ অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন ও হৃদয়ভরা আবেগ নিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু দেখা যায় নরনারীর ঐ সম্পর্ক কখনো তাদের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলে, তাদের বাঁধে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বন্ধনে, কখনো বা ঐ সম্পর্কের বন্ধন জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট-দাম্পত্যে পরিণত হওয়ার কারণ হিসেবে বিবাহিত নারী পুরুষের কোনো একজনের জীবনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিকেই আমরা বড় করে দেখি। কিন্তু এই একটি কারণ ছাড়াও রয়েছে আরও শত-সহস্র কারণ, যা সম্পর্কের মাধুর্য নষ্ট করে। বাল্য বিবাহ, বয়সগত ব্যবধান, রুচিবোধের পার্থক্য, নারীর অন্ধ কুসংস্কার, আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব, বহুবল্লভতার কামনা, পুরুষতন্ত্রের জবরদস্তি, স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের অমানবিক নিষ্ঠুর ব্যবহার, অসংকোচ লালসা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, বাস্তবতা বোধের অভাব হীনমন্যতা বোধ প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি নর- নারীর সম্পর্ককে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রুচিগত বৈষম্য যেমন সম্পর্ককে বিষিয়ে তোলে, তেমনি স্বভাব-প্রকৃতির মিল হলে সম্পর্ক স্নিগ্ধ মাধুর্যে ভরে ওঠে। সুখী দাম্পত্য-জীবন পারস্পরিক ছন্দ-মিল, একটু সহানুভূতি, একটু সহমর্মিতা এবং কিছুটা যত্ন, ধৈর্য প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা পূরণ না হলে স্বামী-স্ত্রী একই ছাদের নীচে বসবাস করলেও প্রেমহীন জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের মনোবীণার তারে ভাঙনের গান তীব্র থেকে তীব্রতর সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। তখন মানব-মানবীর পরস্পরকে নিয়ে গড়ে তোলা স্বপ্নের অমরাবতী একটু ঝোড়ো হাওয়াতেই মাটিতে গড়াগড়ি খায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই, কখনো বা কোনো একজন নীরব রক্তক্ষরণে নিরূপায় ভাবে ক্ষয়িত হয়। অপচয় ঘটে জাতীয় মানব সম্পদের। গান শেষ হয়, তবে গানের রেশ থেকে যায়। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হলে তারা একই পরিবারে থেকেও

স্বতন্ত্র জীবন যাপন করতে পারে। আবার আজ একবিংশ শতাব্দীতে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আলাদা জীবন যাপনের অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আছে। তবে প্রশ্ন হল — যে সব স্বামী-স্ত্রী সন্তানের পিতা-মাতা,তাদের সম্পর্ক অনিশ্চিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হলে শিশুরা কী বিপন্নতার শিকার হয় না ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে কোনো সচেতন ব্যক্তিই হয়তো বলবেন, পিতা-মাতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে শিশুরা নিজেদেরকে অসহায়, নিঃসঙ্গ ও বিপন্ন বলে মনে করে। এর কারণ হল —"শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বংশগতি কাঁচামাল জোগায়, কৃষ্টি নকসা জোগায় এবং পিতামাতা কারিগর হিসেবে কাজ করে থাকে। শিশুরা তাদের দাবী দাওয়া পূরণের ব্যাপারে তাদের পিতামাতার উপর নির্ভরশীল। তার ফলে শিশুরা বইয়ের কী জানবে ও কী শিখবে এ ব্যাপারে পিতা-মাতার একটা একচেটিয়া অধিকার পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত শিশুরা কোন্ মূল্যবোধ গ্রহণ করবে বা কোন্ কৃষ্টি অনুসরণ করবে এ ঠিক করার ব্যাপারে পিতা-মাতার হাতই বেশি।"[১]

— এই জন্য দাম্পত্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে প্রতিটি সচেতন মানুষ আজ আর শুধুমাত্র দুজন নর-নারীর হৃদয় যন্ত্রণা বলে মনে করেন না। তারা জানেন পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা নির্ভর ঐ সম্পর্কের ফাটল গোটা সমাজ-রাষ্ট্রের ভিতই নড়বড়ে করে দিতে পারে। তাই আজ স্বতন্ত্র দু'জন নর-নারীর যে সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ দাম্পত্য-সম্পর্ক, তা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমরাও ভাঙন প্রতিরোধ করে দাম্পত্য-সম্পর্ককে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার বিষয়ে প্রয়াসী। এই জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপন্যাসের দাম্পত্যকে আমরা আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে রেখেছি। কারণ, মানুষের বাস্তব জীবনের শৈল্পিক রূপ-ই তো উপন্যাস। তাই উপন্যাসে বর্ণিত স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব-জটিল মনের বিশ্লেষণ করে দাম্পত্য জীবনের-সমস্যা-সংকটের কারণ আমরা অনুসন্ধান করবো। এ ক্ষেত্রে সাহায্য নিতে হবে মনস্তত্ত্বের। তাই বর্তমান অধ্যায়ে থাকবে মনস্তত্ত্ব ও তার পারিভাষিক শব্দাবলী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অলোচনা।

উনিশ শতকে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ গুস্তাভ ফেকনার (১৮০৩ -১৮৮৭) মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনস্তত্ত্বের প্রচার বা প্রসার তেমন ছিল না, বিংশ শতকের সূচনায় মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০খ্রিঃ) ও 'Psycho-pathology of Everyday life' (১৯০৪ খ্রিঃ) প্রকাশিত হলে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁরা মানব মনের গোপন রাজ্য সম্পর্কে আগ্রহী হন। এরপর আমরা দেখি, ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর গহন-মনের গভীর রাজ্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এর ফলে উপন্যাস মানব স্বীকৃতি থেকে বিবর্তিত হয়ে মানব-মনের স্বীকৃতির স্তরে পৌঁছায়। প্রাধান্য পায় মানুষের গোপন মন অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনের বিশ্লেষণ বর্ণনা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'মনস্তত্ত্ব' বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে বা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আবিষ্কারের আগে নির্জ্ঞান বা অচেতন মন সম্বন্ধে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না, এমনটি নয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের নয়, সুতরাং ফ্রয়েড মানব মনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে কিছু সৃষ্টি করেন নি। তাই বঙ্কিম সাহিত্যে আমরা মনের নির্জ্ঞান প্রদেশের কথা অন্যভাবে ব্যক্ত হতে দেখি। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও মনের চেতন স্তর ছাড়া অন্য স্তরগুলিরও ইঙ্গিত রয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখি, শকুন্তলা কুটীরে উপস্থিত, কিন্তু সেখানে অতিথি দুর্বাসা উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানাননি। এর কারণ কী? কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা অনুসূয়াকে বলেছে — " প্রিয়ংবদাঃ ননু উটজে সন্নিহিতা শকুন্তলা। (আত্মগতম্) আম্ , অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা ।" অর্থাৎ 'কুটীরের কাছেই শকুন্তলা আছে। (স্বগতঃ) কিন্তু মন তো তার নিজের মধ্যে নেই ।' — প্রিয়ংবদার এই উক্তিটিতে আজ একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মানসপটে শকুন্তলার অবচেতন বা প্রাক্ চেতন মনের (Pre-Conscious mind- এর) কথাই ভেসে ওঠে, যেখানে সদ্য বিগত চিন্তাভাবনা, স্মৃতি ও নিরুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত থাকে। প্রিয়ংবদা ঐ অবচেতন

মনের কথাই বলেছিল। শুধু তাই নয়, শকুন্তলা 'দিবা স্বপ্নে' মগ্ন থাকার জন্যই (রাজা দুষ্মন্তকে কেন্দ্র করে) যে, কুটীরে ঋষি দুর্বাসার উপস্থিতি টের পান নি— একথাও আমরা বলতে পারি।

এই নাটকেরই পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায়, রানী হংসপদিকার গান শুনে রাজা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন এবং তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন —

"রাজা ঃ- (আত্মগতম্) কিং ন খলু গীতার্থমাকর্ণ ইষ্টজন
বিরহাদৃতেহপি বলবদুৎ কণ্ঠিতোহস্মি।

অথবা —

রম্যানি বীক্ষা মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জুননান্তর -সৌহৃদানি।"

অর্থাৎ "রাজা ঃ (স্বগতঃ) কোন ইষ্টজনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তথাপি এই গান শুনিয়া আমি অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইয়াছি।" অথবা — "সর্বপ্রকারে সুখী হইয়াও কোন সুন্দর বস্তু দেখিয়া বা মধুর শব্দ শুনিয়া মানুষ কেন আকুল হয়? কারণ তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল কোন জন্মান্তরীণ স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার মনে জাগিয়া উঠে।"[২]

এখানে 'বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ স্মৃতি' মানুষের চেতনায় বা চেতন মনে থাকা কোনো স্মৃতির ইঙ্গিত করছে না ; তা মনের নির্জ্ঞান প্রদেশের সুপ্ত স্মৃতি ও চিন্তা ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে। শুধু কালিদাসের সাহিত্যেই নয়, একটু অনুসন্ধান করলে ফ্রয়েড পূর্ববর্তী যুগের আরো অনেক সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেও চেতনোর্ধ্ব মন সম্পর্কে মানুষের অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ নং শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন —

"অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত ঃ।।"

অর্থাৎ ''হে কৃষ্ণ, তা হলে মানুষ স্বেচ্ছায় না করলেও যেন বলপূর্বক কার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে?''[৩]

— এখানে বলা হচ্ছে, স্বেচ্ছায় অর্থাৎ চেতন মনের ইচ্ছায় পাপাচরণ করতে না চাইলেও মানুষ কখনো কখনো তা করতে বাধ্য হয়। — এই বাধ্যবাধকতার মধ্যেই আমরা চেতন মনের নিয়ন্ত্রক অন্য কোনো মনের ইঙ্গিত পেয়ে যাই। সেই মন অচেতন মন যা অদৃশ্যে থেকেই ব্যক্তির সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। মনের এই স্তরটি সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষের কোনো তাত্ত্বিক ধারণা না থাকায় তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই আকারে ইঙ্গিতে ঐ চেতনোর্ধ্ব মনোরাজ্যের আভাস দিয়েছেন।

ফ্রয়েড মানব-মন সম্পর্কে সুদীর্ঘ গবেষণা করার পর জানান যে, মানুষ তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আদিম যৌন কামনা-বাসনা ও জিঘাংসার অবদমন (repression) আর উত্তরোত্তর উদ্‌বর্তন (Sublimation) ঘটিয়ে মানব সভ্যতার প্রগতির রথকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, বিকাশ ঘটেছে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির। কিন্তু কামনা-বাসনাকে অবদমিত (repressed) করার একটা মূল্য মানুষকে দিতে হয়েছে। অবদমিত কামনা-বাসনা স্বপ্ন-দৃশ্য হয়ে ব্যক্তির জীবনে ফিরে এসেছে। কখনো কখনো স্বপ্নই হয়ে উঠেছে মানুষের স্নায়ুরোগের উপসর্গ। তাই স্নায়ুরোগের স্বরূপ জানার জন্য 'স্বপ্নতত্ত্ব' সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। আবার নির্জ্ঞান মন বা অবদমন ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে স্বপ্নতত্ত্ব বা মানুষের বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব। ফ্রয়েডের মতে — ''রোগলক্ষণ, স্বপ্ন, ঠাট্টা-তামাশা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি কোন মানসিক ঘটনাই আকস্মিক নয়। প্রত্যেকটি মানসিক ঘটনার পেছনে মানসিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে যা ঐসব ঘটনার জন্ম দেয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে কোন মানসিক ঘটনার মানসিক কারণ সংজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া না গেলে, তাকে — আকস্মিক বলে ধরা ঠিক নয়। কারণ যদি সংজ্ঞান মনে না থাকে, তাহলে নির্জ্ঞান মনে আছে, বর্তমান বয়সের ঘটনাবলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া না গেলে শৈশবের ঘটনার মধ্যে রয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে

মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা, কামনা-বাসনা খুঁজে বের করে আনলে, তবেই ঐ কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে।''[৪]

আমাদের আলোচ্য 'মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা'। অর্থাৎ ঐ ত্রয়ী ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে বর্ণিত দম্পতিদের সমস্যা সৃষ্টির মূলে যে সব মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ক্রিয়াশীল, সে দিকটি উদঘাটন করা। দাম্পত্য-সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনস্তত্ত্বের যে পরিভাষাগুলির ব্যবহার করা হবে আলোচ্য অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক অলোচনা করব। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ঐ তিনজন ঔপন্যাসিকের প্রত্যেকেই যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাত্র-পাত্রীর মনের চিত্র-অঙ্কন করেছেনএমনটি নয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ফ্রয়েডের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশিত হবার অনেক পরে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রচার ও প্রসার লাভ করে। তাই একথা বলতেই হয়, মনস্তত্ত্বের আবিষ্কারের পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখেই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মানস জগতের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভকে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তাই পাত্র -পাত্রীর নিজ্ঞান প্রদেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে মনে সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে, সেই দিকটিও আমরা মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যাখা বিশ্লেষণ করবো।)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কিছু সাহিত্যে চেতন অবচেতন নিজ্ঞান মনের ইঙ্গিত থাকলেও মন বলতে শুধুমাত্র মনের উপরিস্তর (Surface mind) - কেই বোঝানো হত ; মনের এই চেতন অংশটি বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই অংশেই মানুষের সুখ-দুঃখের — চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছার বহুবিধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।চেতন মনের দ্বারাই আমরা জগৎকে জানি এবং দেখি। বাইরের জগৎ-এর বিভিন্ন উদ্দীপক দ্বারা আমরা যেমন প্রভাবিত হই, তেমনি চেতন মনের দ্বারাই বাইরের জগৎ এর উপর প্রভাব বিস্তার করি। ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ঘোষণা করেন— মনের চেতন অংশটি মনের খন্ডাংশ মাত্র ; চেতন স্তরের মাধ্যমে মনের সমগ্র রূপের

পরিচয় জানা যায় না। মনঃ সমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে তিনি বোঝালেন, চেতন স্তর (Conscious level) ছাড়া মনের আরো দুটি স্তর রয়েছে — প্রাক্‌চেতন বা অবচেতন অংশ (Sub-conscious or pre- conscious level) এবং অচেতন অংশ বা নির্জ্ঞান মন(Unconscious level) । মনকে জলে ভাসমান তুষার স্তূপের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভাসমান তুষার স্তূপের খুব কম অংশই সাগর জলের ওপরে থাকে, যা আমরা দেখতে পাই ; বাকি অংশ থাকে জলের নীচে। তেমনি আমাদের মনের অতি অল্প অংশই সংজ্ঞান বা চেতন, বাকি অংশ নির্জ্ঞান বা অচেতন।

অচেতন বা নির্জ্ঞান মন (Unconscious mind) - এর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের (যেমন - হিস্ট্রিরিয়া, শুচিবায়ু রোগ, বাতুলতা, হীনমন্যতা) বা ব্যক্তির আচার-আচরণের অসঙ্গতির যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। ফ্রয়েড তাঁর "Psycho-Pathology of Everyday life " গ্রন্থে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটো খাটো অনেক ভুল -ভ্রান্তির ব্যাখ্যা করে মনের নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious level) -এর অস্তিত্বের যুক্তি দিয়েছেন।

আমাদের আকস্মিক ভাবে কিছু মনে পড়ে যাওয়া, অগোচর আবেগ, নিদ্রাকালীন মনের ক্রিয়া অদ্ভূত, উদ্ভট বা অর্থহীন স্বপ্ন প্রভৃতি বিষয়গুলি অবচেতন ও নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। উদ্‌গতি (Sublimation),অভিক্রান্তি (Displacement), পশ্চাদ্‌গমন বা প্রত্যাবৃত্তি (Regression) ইত্যাদিকে ফ্রয়েড নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশের উপায় বলে মনে করেন।

অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর (unconscious level) মনের নিষ্ক্রিয় কোনো অংশ নয়। বরং মনের এই তৃতীয় স্তরটিই অত্যন্ত সক্রিয়। 'অচেতন' শব্দটি এখানে 'চেতনাবিহীন' অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। ফ্রয়েডীয় মনঃ সমীক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'unconscious' বা 'অচেতন' কথাটির স্বতন্ত্র একটি অর্থ আছে। চেতন স্তর বহির্ভূত অথচ মনের অন্তর্গত গভীরতম গতিশীল স্তরটিকেই ফ্রয়েড 'নির্জ্ঞান' বলে অভিহিত

করেছেন। তাঁর মতে নির্জ্ঞান মন অবদমিত কামনা-বাসনার আশ্রয়স্থল। আমাদের অবদমিত বাসনাগুলি মনের নির্জ্ঞান প্রদেশে নির্বাসিত হয়। তবে সেখানে গিয়ে তারা নিষ্ক্রিয় থাকে না, সর্বদাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের জাগ্রত অবস্থায় অসামাজিক কামজ ইচ্ছাগুলি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কারণ জাগ্রতকালে ন্যায়-নীতি-পুষ্ট অধিশাস্তা বা Super-ego সর্বদা প্রহরীর মত সজাগ থাকে। তাই নির্জ্ঞানের অবদমিত ইচ্ছাগুলি জাগ্রত অবস্থায় পরোক্ষভাবে দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ত্রুটি দিবা-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, কখনো বা মানসিক রোগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অবদমিত ইচ্ছার ঐ প্রকাশগুলি সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে। তাই তাদের ছদ্ম আবরণ উন্মোচন না করে নির্জ্ঞান ইচ্ছার স্বরূপ জানা যায় না। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা নির্জ্ঞান-ইচ্ছার অব্যক্ত রূপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায়। নির্জ্ঞান কোনো যুক্তি বুদ্ধি বা ন্যায় নীতি বোধের ধার ধারে না। নিজের দাবী পূরণ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান মানসবৃত্তির উৎস দুটি — কিছু মানসবৃত্তি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, কিছু মানসবৃত্তি ইচ্ছার অবদমন জনিত। নিষ্পাপ শিশু — যারা জটিল জগতের কিছুই জানে না, বোঝে না, তাদের মনেও কামনা পুঞ্জীভূত থাকে। শিশুরা স্বার্থপর, আত্মসুখ পরায়ণ। তারা নিজের সুখের জন্য, মনের নিত্য নতুন সাধ মেটাবার জন্য ভালো মন্দ সব ধরনের কর্মের জন্য প্রস্তুত। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলকেই সে তার প্রীতি বা সুখ উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করে। সুখের ব্যাঘাত ঘটলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। জীবনের প্রথমে তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না বলে নিজ সুখের জন্য এমন অনেক কিছু সে কামনা করে যা ন্যায় সঙ্গত নয়। কিন্তু একটু একটু করে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করতে পারে বড়রা তার অনেক কামনা বাসনা পছন্দ করছে না, কিছু কিছু কামনা বাসনা পূরণের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে, শাস্তির ভয়ে শিশুর মনে অবদমন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের নৈতিক মানদন্ডে শিশুর যে ইচ্ছাগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়, সে সেগুলি অবদমন করে। আর তার ঐ অবদমিত কামনা বাসনাগুলি তখন মনের সচেতন স্তর থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নির্জ্ঞানে আশ্রয় নেয়—"শিক্ষা শাসন প্রভৃতির ফলে শিশুর সহজাত কামপ্রবৃত্তি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎসংক্রান্ত অসামাজিক ভাবগুলি মনের গভীর স্তরে চলিয়া যায়। শিশুর অসামাজিক

কামবৃত্তিগুলি কখনোই একেবারে নষ্ট হয় না ; নির্বাসিত হইয়া রুদ্ধাবস্থায় তাহারা অজ্ঞাত মনে থাকিয়া যায়। এই রুদ্ধ প্রবৃত্তি হইতেই পরবর্তীকালে মানসিক রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।''[৫]

জৈবিক প্রবৃত্তি, অবদমিত অসামাজিক নগ্ন কামনা-বাসনা ও প্রক্ষোভ প্রভৃতি মনের অচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious) প্রদেশের অধিবাসী —একথা আজ মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবিরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ফ্রয়েড বলেছিলেন যে, সহজাত কামনা-বাসনাগুলি জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী। তারা সরাসরি চেতন স্তরে উঠে আসে না ঠিকই, তবে অচেতনে থেকেই সচেতন আচরণকে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েড অচেতন ও চেতন মনের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তন করে অদস্ বা ইদ্ (id) এবং অহম্ বা ইগো (ego) রেখেছিলেন।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে ইদ্ (id) বা নির্জ্ঞান মন হল, মানুষের আদিম যুগের যুক্তিহীন, দুর্জ্ঞেয়, অপ্রতিরোধ্য সহজাত প্রবৃত্তি। ইদ্ (id) অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় অবরুদ্ধ কামজ ইচ্ছাগুলিকে চেতন বা সংজ্ঞানে পাঠাতে চায়। ইদ্ (id) অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, বাহ্যপরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় তার কোন বাস্তববোধ (reality sense) থাকে না, সে পরিচালিত হয় সুখনীতি বা সুখসূত্রের (Pleasure Principle) দ্বারা। ইদ্ সব সময় চায়, জৈবিক চাহিদার তাৎক্ষণিক পূরণ। বৈধ-অবৈধ, সময়-অসময় বিবেচনা ইদ্ বা অদসের জন্য নয়। ইদ্ বা অদস বন্য, বর্বর, বিশৃঙ্খল সব ধরনের নিয়মকানুনের বিরোধী, প্রবৃত্তির সেবাদাস।

সাধারণভাবে আমরা যাকে অহং বা চৈতন্য বলি ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে তাকেই বলা হয় ইগো (ego) বা চেতন মন (Consciousmind)। জন্মগ্রহণের পর প্রতিটি শিশুই হচ্ছে কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তির (Instincts) আধার। সে তখন ইদ্ বা অদসের দ্বারা পরিচালিত হয়। এরপর একটু একটু করে বড় হবার সাথে সাথে শিশুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বেড়ে যায়। সে বুঝতে পারে কখন কোন্ প্রবৃত্তির দাবী মেটানো উচিৎ। বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিবার, সমাজের দৃষ্টিতে কোন ধরনের প্রবৃত্তির

দাবী চরিতার্থ করতে চাওয়া অন্যায়। এরপর সে সময় ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তার গড়ে ওঠা মূল্যবোধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে জৈবিক ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে চায়। প্রতিকূল অবস্থায় সে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ বিলম্বিত করে, কখনো আবার তার ইচ্ছাকে অবদমিত করে। শিশু বা ব্যক্তির এই ধরনের বাস্তব সত্তাই হচ্ছে ইগো (ego) বা অহম্। অর্থাৎ ইগো বা অহম্ যে ধর্ম মেনে চলে তা হল বাস্তব নীতি (reality principle)। ইগো সহজাত প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে চায়, কিন্তু ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তার দৃষ্টি সজাগ — ঐ গুলির বিচার বিবেচনা করেই সে তার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে।

ইদ্, ইগোর আলোচনা প্রসঙ্গে এসে পড়ে সুপার ইগো (Super-ego বা অধিশাস্তার কথা। ফ্রয়েড সুপার ইগোকে 'Censorial guardian' বা 'অভিভাবক প্রহরী' বলে মনে করেন। সুপার ইগো বা অতি অহম্ - এর ধর্ম হল 'আদর্শ'— যা কিছু মহৎ বা নৈতিকতাপূর্ণ তাই করণীয়, অনৈতিক কর্ম সর্বদা পরিত্যাজ্য। এই জন্য সুপার ইগোকে ব্যক্তিত্বের নৈতিক হাতিয়ার (Moral arm of personality) বা 'অনমনীয় বিবেক' (uncompromising conscience) বলা হয়। সুপার ইগোর কাজ হল, " ইদ্ বা অদসের অন্ধ কিন্তু দুর্বার সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে শাসন করা এবং অহম্ যদি কখনো ইদ্-এর দাবীকে মান্য করে নিরুদ্ধ ইচ্ছাকে চেতনায় স্থান দেয় তাহলে অহংকে কঠোর শাস্তি দেওয়া। কোন্ যৌনতৃষ্ণাটি (ব্যাপক অর্থে) চরিতার্থ করা যাবে, অহং-এর কোন্ দাবিটি বাস্তব পরিবেশ অনুসারে অনুমোদন যোগ্য হবে — এই সবই নির্ধারণ করে অধিশাস্তা বা বিবেক।"[৬]

স্বপ্নতত্ত্ব ঃ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন তত্ত্বাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল স্বপ্ন। স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পূর্বে 'স্বপ্ন' বলতে সাধারণ মানুষ দৈবাদেশ বা ভাবী মঙ্গল অমঙ্গলের ইঙ্গিতকেই বুঝতো। অনেকে মনে করত স্বপ্নে আত্মা দেহের বাইরে এসে বিচরণ করে। ফ্রয়েড স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জানান যে, স্বপ্ন হল আমাদের অপূর্ণ ইচ্ছা ও বাসনার পরিপূরণ, মানুষের অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের গোপন চিন্তাভাবনা স্বপ্নের মাধ্যমে চেতন মনে এসে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেন যে, নির্জ্ঞান মনের কোন অপূর্ণ ইচ্ছাই অবিকৃতভাবে স্বপ্নের মধ্য

IBRARY
NBU, DARJEELING
271075
07 JUN 2014

দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। যে সব অনৈতিক, অসামাজিক কামনা-বাসনা সমাজ শাসনের ভয়ে অবদমিত হয়, সেগুলিই সেন্সর (Censor) বা প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্য ছদ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চেতন রাজ্যে স্বপ্নের প্রকাশিত রূপকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন 'Manifest dream content' বা স্বপ্নের প্রকাশিত রূপ। স্বপ্নের অন্তর্নিহিত রূপ হল নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনা-বাসনা ; ফ্রয়েড এই রূপের নাম দিয়েছেন 'Latent dream Content'। তিনি 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রিঃ) গ্রন্থে স্বপ্নের বিচিত্র ছদ্মবেশ বা সঙ্কেতের ব্যাখ্যা করেছেন। পাভলভের মতে স্বপ্ন হল, "এক ধরনের মননক্রিয়া, হ্যালুসিনেশানের সমগোত্র। ঘুমের মধ্যে আমরা একেবারে অচেতন হই না। মস্তিকের কিছু জায়গা স্বপ্নের মধ্যেও জেগে থাকে। জৈব প্রক্রিয়ার কেন্দ্রগুলি শুধু নয়, যে সব জায়গা দিনের কার্য উপলক্ষে খুব বেশি উত্তেজিত বা নিস্তেজিত হয়েছে, সেগুলো জেগে থাকতে পারে। এই সব কেন্দ্র ও কোষসমষ্টির উদ্দীপনার ফলে স্বপ্নদৃশ্যের অভিনয় ঘটে...।"[৭]

স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ ছাড়া আর একটি মতবাদ হল শারীরবৃত্তীয় মতবাদ। তবে ফ্রয়েডের মতটিই অনেক বেশি বিজ্ঞান সম্মত এবং নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ফ্রয়েড মনে করেন যে, স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেই মানুষের নির্জ্ঞান রাজ্যের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়

ফ্রয়েডের 'Psycho-Pathology of Everyday life' গ্রন্থের সর্বরতিবাদ (Pansexuality) বা লিবিডো (Libido) সংক্রান্ত আলোচনা মানব আচরণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এখানে ফ্রয়েড জীবনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে লিবিডো-র কথা বলেছেন। লিবিডোকে তিনি যৌনপ্রবৃত্তি মূলক শক্তি বলেছেন। যৌনপ্রবৃত্তির অর্থকরণে ভিন্নতাই ফ্রয়েডের মূল্যায়নকে জটিল করে তুলেছে। অনেকের কাছে 'লিবিডো' সংকীর্ণ অর্থে যৌনতা বা যৌনকর্ম, অনেকে আবার যৌনতা ছাড়াও যেকোনো সুখানুভূতিকেই 'লিবিডো' র আলোচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ বৃহৎ অর্থ ধরেই 'লিবিডো' শব্দটির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো।

লিবিডো (Libido) হল মানুষের যৌন প্রবৃত্তিমূলক সহজাত মানসশক্তি। ফ্রয়েড বলেছেন যে, এই লিবিডোর একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মসুখ বা আত্মতৃপ্তি। লিবিডো যে শুধুমাত্র শৈশবের প্রেম-ভালবাসা ও যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমনটি নয়। মানুষের প্রভুত্ব প্রিয়তা, কর্তৃত্বের ইচ্ছা ও দাসত্বের মধ্যেও থাকে একধরণের যৌনতার (আত্মসুখ বা Pleasure Principle) প্রকাশ। লিবিডো মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। লিবিডোকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে 'তৃতীয় স্তরটি' আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়বস্তু আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা তৃতীয় স্তর বা উপস্থ স্তর (Phallic stage) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এই উপস্থ স্তরে পুত্র-কন্যা উভয়েই মাকে স্বাভাবিক ভাবে ভালোবাসে। ফ্রয়েড বলেছেন যে, সন্তানের মনে মায়ের প্রতি কামেচ্ছা জাগে। এখানে আমরা 'কামেচ্ছা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ধরব, আত্মসুখ পরায়ণতার ইচ্ছা। এই স্তরেরই (৩ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত) প্রথম দিকে ছেলে-মেয়েদের দাবী-দাওয়া পূরণের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাই প্রধান থাকে। মাকে তারা মনে করে প্রীতি উৎপাদনের যন্ত্র। প্রাথমিক স্তরের পর (বয়স একটু বাড়লে) তাদের মানসিকতার পরিবর্ত্তন ঘটে। ফ্রয়েডের মতে এই সময় ছেলেদের মনে মায়ের প্রতি কামেচ্ছা জাগে। কিন্তু মা ছেলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে তার মধ্যে জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তারা খুব অসহায় বোধ করে। ছেলেদের এই জটিল অবস্থাকেই ইডিপাস গূঢ়ৈষা (Oedipus Complex) বলে। এই অবস্থার নামকরণে ফ্রয়েড গ্রীক পুরাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গ্রীক পুরাণের হতভাগ্য রাজা ইডিপাস অদৃষ্টের পরিহাসে নিজের অজান্তেই বাবাকে হত্যা করে মাকে বিয়ে করেছিলেন। ফ্রয়েড হয়তো ব্যক্তির অসহায় করুণ মানসিক অবস্থা বোঝানোর জন্য ঐ ধরণের নামকরণ করেছেন।

আমরা দেখলাম, ছেলেদের অনুরাগ সৃষ্টি হয় মায়ের প্রতি। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপারটিই ঘটে থাকে। তাদের অনুরাগ দেখা যায় বাবার প্রতি, কখনো বা দাদার প্রতি। বাবার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হলে তারা বাবার কাছ থেকে

স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে মাকে-ই প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ফ্রয়েডের ভাষায় মেয়েদের এই অবস্থার নাম ইলেকট্রা গূঢ়ৈষা (Electra Complex)। শৈশবে বাবা অথবা দাদা —— এদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার জন্য এবং তাদের আচরণকে আদর্শ স্বরূপ মনে করার ফলে মেয়েদের অজ্ঞাতেই আদিম যৌনপ্রবৃত্তিমূলক শক্তি বাবা বা দাদার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করে। এই সহজ সত্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, লিবিডো যদি কোন স্তরে অতৃপ্ত থাকে বা নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে তাহলে ব্যক্তির আচরণে নানা ধরণের অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে —— একথাও আজ প্রমাণিত।

ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, অধিকাংশ অস্বাভাবিক আচরণের মূলে থাকে কোনো অতৃপ্ত যৌন কামনা বৃহৎ অর্থে, শুধুমাত্র Sex নয়, যে কোনো সখানুভূতি। অবদমিত যৌন কামনার পরিতৃপ্তির প্রয়াসই মনোরোগের লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। সমাজ সভ্যতা বিরোধী যে সব ইচ্ছা বাস্তবে পূর্ণ হয় না, সেই ইচ্ছাগুলিই বিকল্প আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাই ফ্রয়েড যে কোনো মনোব্যাধিকেই যৌনধর্মী বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে শৈশবকালীন লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation of libido) হল পরোক্ষ কারণ, আর যে আঘাত মূলক অভিজ্ঞতার জন্য লিবিডো বা যৌনমানসশক্তি শৈশবকালীন সংবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে, সেটি হল মানসিক রোগের প্রত্যক্ষ কারণ।

ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনকে (Unconscious mind) কেবলমাত্র অবদমিত (repressed) কামনা বাসনার রাজ্য বলেই মনে করেননি। তিনি জানিয়েছেন, নানা প্রকার উদ্দেশ্য বা প্রেষণাও নির্জ্ঞান মনে জন্মলাভ করে। তবে নির্জ্ঞানের কোনো কামনা-বাসনাই সচেতন মনে অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। ঐ স্তরের প্রেষণাগুলিও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত না হয়ে বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে —— "শিশুকাল থেকেই অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই শিশুর যে চাহিদা বা বাসনা-কামনা থাকে তার একটা বিরাট অংশ অন্ততঃ শিশু বড় হবার পর সম্পর্ণ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। এই চাহিদা বা বাসনা-কামনার সমস্তই কোন না কোন যৌন চাহিদা। অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই শিশুর যৌন চাহিদা থাকে। ঐ যৌন-চাহিদা সামাজিক

দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে নোংরা ও অনৈতিক। তাই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই সব চাহিদাগুলিকে নিজের অজান্তেই নির্জ্ঞানে নির্বাসিত করি। এইভাবে যে চাহিদাগুলিকে আরা নির্বাসিত করেছি, সেই চাহিদাগুলিই অন্য রূপ নিয়ে অনেক সময় রোগলক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এর থেকে প্রমানিত হয় যে আমাদের চাহিদা নির্বাসিত করা মানে তাকে ধ্বংস করা নয়। প্রতিটি চাহিদার সঙ্গে কিছু মানসিক শক্তি (psychic energy) যুক্ত থাকে। যতক্ষণ সেই ক্রিয়াশক্তির (energy) কোন না কোন রূপে মুক্তিলাভ ঘটছে না, ততক্ষণ তা ক্রিয়াশীল থাকে এবং বিভিন্ন উপায়ে — যথা স্বপ্ন বা রোগলক্ষণের মাধ্যমে — মুক্তিলাভ করে। অবশ্য অবদমিত বাসনা-কামনার সুস্থ ও স্বাভাবিক মুক্তিলাভও সম্ভব যা রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে না।"[৮]

"স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি মানব জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যগুলির এবং নানা রোগ লক্ষণ বা উপসর্গের মধ্য দিয়াও নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। স্বভাবী লোকের অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে।"[৯] এই তিনটি উপায় হল- ১. উদ্‌গতি (Sublimation) ২. অভিক্রান্তি (Displacement), ৩. প্রতিক্রিয়া গঠন বা বিপরীত গঠন (Reaction Formation), এছাড়া আরও বিভিন্নরূপে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রকাশের রূপগুলি হল — অভিক্ষেপ (Projection), ২. যুক্তসভাস (Rationalization), ৩. ক্ষতিপূরণ (Compensation) ৪. মনঃসৃষ্টি (Phantasy), ৫. প্রত্যাবৃত্তি (Regression) ইত্যাদি।

উদগতির (Sublimation) ফলে ব্যক্তির অবরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ ইচ্ছা তার অসামাজিক লক্ষ হতে সরে এসে কোন কল্যাণমূলক কর্মের দিকে চালিত হয় এবং দেশ ও দশের মঙ্গলময় কর্মে নিয়োজিত হয়ে তৃপ্তি লাভ করে। উদ্‌গতির ফলেই শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান সমাজ হিতৈষণা , দেশপ্রেম প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শ গুলির বিকাশ ঘটে। আসল কথা, ব্যক্তির লিবিডো (Libido) যখন কোন ক্ষেত্রে অতৃপ্ত হয়, তখন সমাজ স্বীকৃত সম্মানজনক কোনো কাজের মাধ্যমে সে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। লিবিডোর তৃপ্তিলাভের এই ধরনের প্রয়াসকে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পরিভাষায়

Sublimation বলা হয়। উদ্‌গতি বা Sublimation সংজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয় না। আমরা যখন কোনো মহিলাকে সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করতে দেখি, তখন ধরে নিতে হবে, তাঁর অবদমিত মাতৃত্বের কামনাই তাকে ঐ কাজে উৎসাহিত করেছে।

নির্জ্ঞান ইচ্ছার অপর একটি প্রকাশ হল অভিক্রান্তি। এক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা উদগতির মতো কোনো কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না। এই পদ্ধতিতে এক উদ্দেশ্যের লক্ষ্যবস্তু অন্য কোন লক্ষবস্তুর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। যেমন কোনো মহিলার অবদমিত মাতৃত্ব কামনা কুকুর, বিড়াল, পাখি পোষার মধ্য দিয়ে বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রতিক্রিয়া গঠন হল নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রকাশের এমন একটি উপায়, যেখানে মনের উদ্দেশ্য বিপরীত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই সমাজে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, কোনো সাধু হঠাৎ চোরে পরিণত হচ্ছে, আবার কোনো দুর্বৃত্ত রাতারাতি সাধুতে পরিণত হয়েছে।

বিকৃত ইচ্ছার প্রকাশ অভিক্ষেপ বা Projection এর মাধ্যমেও রূপায়িত হয়ে থাকে। " ব্যক্তির নিজের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা এবং নিজের কাছে অবাঞ্ছিত ধারণা আকাঙ্ক্ষা গূঢ়ৈষা (Complex) প্রভৃতির চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেগুলি অপরের ঘাড়ে চালান করে দেওয়ার নির্জ্ঞান (Unconscious) প্রক্রিয়া"[১০] আমরা সমাজে তাই দেখতে পাই, যে সকল পুরুষ অন্য স্ত্রী লোকের প্রতি আসক্ত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই পতিব্রতা স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে।

যুক্ত্যাসভাস (Rationalization) হল এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল, ভাবনাচিন্তা না করে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে কোন কাজ করতে পারে ভেবে চিন্তে একটা উচ্চমার্গের যুক্তি খাড়া করার ঘটনা। বাবা হঠাৎ রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছেলেকে মারলেন, পরে যুক্তি খাড়া করলেন তিনি ছেলের ভালোর জন্যই মেরেছেন। নির্জ্ঞান উদ্দেশ্যকে ছদ্ম আবরণে প্রকাশের একটি পন্থা বা উপায় হল ক্ষতিপূরণ বা অনুপূরণ। ব্যক্তি নিজের কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতা ঢাকার জন্য এমন কোনো গুণ কিংবা

সমাজের চোখে প্রশংসার যোগ্য এমন কোনো কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। এমন অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা নিজেদের নিজেরাই সুশ্রী বলে মনে করে না, তাই তাদের সৌন্দর্যের ক্ষতিপূরণের জন্য তারা পড়াশোনা, সাহিত্য সঙ্গীত, খেলাধূলা বা ব্যবসা বানিজ্যে অসম্ভব রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। আবার দেখা যায়, নিরক্ষর পিতা পুত্র বা কন্যাকে উচ্চশিক্ষিত করে নিজের নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ বা অতিপূরণ করেন।

মনঃসৃষ্টি বা (Phantasy) সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার কৌশল (ego-defence Mechanism) হিসাবে দেখা দিতে পারে। এ হল এক ধরনের উদ্ভট কল্পনা যার মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান উদ্দেশ্য সংজ্ঞা মনে প্রকাশিত হয়।

মনঃসৃষ্টির একটা স্তর পর্যন্ত ব্যক্তি তার কল্পিত বিষয়ের অবাস্তবতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সচেতন থাকে। কিন্তু সে যখন তার নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে উৎপন্ন উদ্ভট কল্পনাকে বাস্তব সত্য বলেই মনে করে তখন তা গুরুতর মানসিক রোগের (চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা Schizophrenia) লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে (Regression) বা প্রত্যাবৃত্তি হল এক ধরনের পশ্চাদগমন বা পশ্চাদপ সরণ। ব্যক্তির যৌনমানস শক্তি (Libido) -র আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা কারণে বাধার সৃষ্টি হয়। এই বাধার জন্য লিবিডো যদি কোনো স্তরে অতৃপ্ত থেকে যায় অথবা ব্যক্তি যদি নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে তখন বয়সোপযোগী পর্যায় থেকে পূর্ববর্তী পর্যায়ে (সাধারণত শৈশবের যে পর্যায়ে সে আনন্দ পেয়েছিল) সে ফিরে পেতে চেষ্টা করে। তাই অনেক সময় আমরা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে শিশু বা কিশোর-সুলভ আচার আচরণ করতে দেখি।

উভাবেগ ঃ ব্যক্তির দ্বৈত মানসিকতা বা উভাবেগ তার নিজস্ব এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ স্বজন পরিজনদের জীবনে জটিল সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি করে। Ambivalence বলতে বোঝানো হয়, দোদুল্যমানতা, দ্বিমুখিনতা, দোটানা। যুগপৎ

আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার মনোভাব। সুইস মনোবিজ্ঞানী ইউজেন ব্লয়েলার ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রয়োগ করেন। ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষার ক্ষেত্রে Ambivalence বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে Ambivalence হল, "Ambivalence is the Contrasting pair of impalses developed in almost the same manner."[১১] অর্থাৎ একইভাবে বর্ধিত বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাব বা আবেগের যুগপৎ অবস্থানকে Ambivalence বলে। একই ব্যক্তির মনে একই সঙ্গে ভালবাসা-ঘৃণা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আকষর্ণ-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি বিপরীতধর্মী মনোভাবের প্রকাশ ঘটলে তাকে আমরা বলবো উভাবেগ বা দ্বৈতমানসিকতা বা দোলাচলচিত্ততা। ব্যক্তির আচার আচরণের ঐ জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তির ঐ অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের মূলে কাজ করে নিজ্ঞান মনের ক্রিয়া। বিভিন্ন আবেগ ও ইচ্ছার দ্বন্দ্বময় সংঘাতের ফলেই যে চারিত্রিক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়, তা মনস্তাত্ত্বিকেরা জানেন। তাই তাঁদের কাছে ব্যক্তির গহন মনের খবর জানার জন্য দোলাচলচিত্ততা বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বহুবল্লভতার কামনাঃ ''নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো;
ইহাদের অতিলোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহুজন !''[১২]

— শুধু নারী নয়, প্রত্যেক পুরুষের প্রবৃত্তির মধ্যেও এই আদিম প্রবণতা রয়েছে। শিক্ষা-সংস্কার মানুষের ঐ প্রবৃত্তি প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বহুবল্লভতার কামনায় এক ধরণের শিশুসুলভ স্বার্থপরতাবোধ কাজ করে। বহুবল্লভতার কামনা (Polymorphous Perverse) হল এক ধরনের বিকৃত মানসিক প্রবণতা। শৈশব থেকেই মানুষ যৌনমানসশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় — একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যখন কোনো বাইরের উদ্দীপক মানুষের প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তখন মানুষের প্রেম-প্রবৃত্তি বিকৃতি লাভ করে বহুবল্লভতার কামনায় রূপান্তরিত হয়। বহুবল্লভতার কামনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছেন—"...Under the influence of seduction, the child may become polymorphous perverse and may

be misled into all srots of transgressions. This goes to show that the child carries along the adaptation from them in his disposition. The formation of such perversions meets but slight resistance because the psychic dams against sexual trans-gressions, such as, shame, loathing, and morality—which depend on the age of the child — are not yet erected or are only in the process of formation. In this respect, the child perhaps does not behave differently from the average uncultured women in whom the same polymorphous perverse disposition exists." [১৩]

অবদমন ঃ দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টির মূলে অবদমিত কামনা বাসনা বা নির্জ্ঞান ইচ্ছা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফ্রয়েডের মতে, ইদ্ বা অদসের সুখসূত্র (Pleasure principle) এবং অহম্ (ego)-এর বাস্তবতা সূত্র (reality)- এর দ্বন্দ্বই অবদমনের মূল কারণ। সমাজ অস্বীকৃত কামনা-বাসনা, আবেগ ইত্যাদি চেতন বা সংজ্ঞান (Conscious) মনের কাছে গ্রহণীয় না হলে, যে স্বতঃক্রিয় (automatic) প্রক্রিয়ায় তাদের নির্জ্ঞানের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়, তাকেই অবদমন (repression) বলে— "আমাদেরই নিজেদেরই বাসনা-কামনা নিজেদেরই অজান্তে আমরা নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত করি। এই নির্বাসনের নামই অবদমন (repression)। অনেক সময় আমরা সজ্ঞান ভাবেই নিজেদের চাহিদা নির্জ্ঞান মনে পাঠিয়ে দিই। একে ফ্রয়েড নিরোধ বা Suppression বলেছেন।"[১৪]

হীনম্মন্যতা ঃ অস্ট্রিয়ার মনোরোগ চিকিৎসক আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০ - ১৯৩৭) ব্যক্তি অস্বাভাবিক আচরণ তথা মনোরোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ব্যক্তির হীনম্মন্যতার অনুভূতির মধ্যে মনোব্যাধির কারণ নিহিত থাকে। হীনমন্যতা (Inferiority Complex) হল, নিজের সম্বন্ধে বাস্তব ভিত্তিক বা কাল্পনিক হীন ধারণা পোষণ এবং তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হামবড়া ও আক্রমণাত্মক ভাব প্রদর্শন। অ্যাডলার এবং তাঁর অনুগামীরা মনঃসমীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব (Individual Psychology)- এর ক্ষেত্রে এই মতের প্রচলন করেন।

সুইস মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (1875 -1961) এর মতে শৈশবকালীন সংবন্ধন মানসিক রোগের অপরিহার্য কারণ নয়। ব্যক্তি যদি বর্তমান সমস্যার সমাধান বা বর্তমান কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসমর্থ হয়, তাহলে মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে, মানিয়ে নেবার অক্ষমতা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন ব্যক্তির লিবিডো তার শৈশব কালীন জীবনযাত্রা ও আচরণ ধারাতে প্রত্যাবর্তন করে। এর ফলে ব্যক্তির আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানুষের মন সত্যই জটিল ও রহস্যময়। সে নিজেও জানে না তার অসঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণের কারণ। এ সম্বন্ধে ব্যক্তি সব সময় সচেতনও নয়। তাই সমাজ সংসারে নানারকম ঘটনার পাশাপাশি অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে চলে। মানুষের অবদমিত কামনা-বাসনা ও তার নির্জ্ঞান প্রদেশের নিগূঢ় প্রবৃত্তি গুলিই তার আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি-মনের স্বরূপ উদঘাটনে তাই মনের অভ্যন্তর প্রদেশের চিন্তা-অনুভূতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

<u>উৎসসূত্র</u>

১। সমাজ মনোবিজ্ঞান, জহিরুল হক, আলেয়া বুক ডিপো, ৩৮/ ২ক বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পরিমার্জিত সপ্তম সমস্করণ, মে ২০০৭, প.৩৯।

২। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৭, পৃ. ১৪৮।

৩। শ্রী মদ্ভগবদ্গীতা, অনুবাদিকা, গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২৭৩০০৫, তেত্রিশতম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ৫২।

৪। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মণঃসমীক্ষণের রূপরেখা, পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ৮ / ১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পুণমুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩৪-৩৫।

৫। স্বপ্ন, গিরীন্দ্রশেখর বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৫১, পঞ্চম মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৩, পৃ. ৯।

৬। মনোবিদ্যা, সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৬, পুনমুদ্রণ, আগষ্ট, ২০১১, পৃ. ৬।

৭। পাভলভ পরিচিতি, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাভলভ ইনস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬, পরিমার্জিত অখন্ড সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০০, পৃ. ২৩৬।

৮। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, ৮ / ১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, পুণমুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ. ২২।

৯। মনোবিদ্যা, পরেশনাথ ভট্টাচার্য, এ মুখার্জ অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭০, পৃ. ২৭২।

১০। অস্বভাবী মনোবিদ্যা এবং মনোরোগবিদ্যার অভিধান, ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯১, পৃ. ২২৩।

১১। Introductory Lecture on Psycho-analysis, Sigmund Freud, Translated by John Riviere, George Allen & Unwin, London, First Ed. 1922, পৃ. ৩৪।

১২। পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র (নং-৮) পৃ. ২২।

১৩। সঞ্চিতা, নজরুল্ ইসলাম, ভি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৩৫, আটষট্টিতম সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১৬, পৃ. ২৩।

১৪। An Introduction To Jungs Phychology, Fordham Friede, Published by Penguin, Harmonds worth, Middle Sex, (1956 ed.) পৃ. ২১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিম উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর দাম্পত্য প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে। রমণী-রমণ পুরুষের লাম্পট্য ও নারীলোলুপতা বাঙালির সংসার জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে নি তার অন্যতম কারণ, বাঙালি রমণীর সনাতনী কল্যাণকর মাতৃমূর্তি। সর্বংসহা ভূমিকায় বাঙালি-নারী দাম্পত্যের বোঝা কায়ক্লেশে বহন করেছে। তবে দাম্পত্য সম্পর্কের পুরুষতান্ত্রিকতায় এর ব্যতিক্রম যে ঘটেনি তা নয়। বরং 'চর্যাপদ', 'বৈষ্ণব পদাবলী', 'মঙ্গল কাব্য' বা শিবায়নে নষ্ট দাম্পত্যের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। শাশুড়ীর নজর এড়িয়ে কুলবধূ পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে অভিসারে যাবে, চর্যাপদে তার পরিচয় রয়েছে। 'বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা রাধিকা যতই অলৌকিকতার প্রচ্ছদপটে বাঙালি জীবনে আবির্ভূত হোন না কেন; তার সংসার জীবনের গভীর পার্থিব অসুখ আমাদের নজর এড়ায় না। স্বামী আয়ান ঘোষের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক তেমন মধুর নয় বলেই, অতৃপ্তির ছিদ্রপথে কাহ্নর প্রবেশ ঘটেছে বালিকা কিশোরী রাধিকার সংসার-জীবনে। আর আর্থ সামাজিক প্রতিবেশে সনকা, ফুল্লরা কিংবা গৌরী শাপভ্রষ্ঠ সংসারে দাম্পত্য-কলহের প্রচুর নিদর্শন রেখেছেন। তাঁদের এই অপ্রচলিত আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সমকালের সেই স্রষ্টাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বিশ শতকের বাঙালি লেখক বাঙালির নষ্ট-দাম্পত্যের আখ্যান পরিবেশনের পাশাপাশি দাম্পত্যের গভীর অসুখের সুলুক সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র দম্পতির চিত্তজগতের গভীর-গহনে অবগাহন করে দাম্পত্যের সমীকরণের যে অনুসন্ধান করেছেন, তার সূচনা ঘটেছিল পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প' গ্রন্থে বলেছেন—'' বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বাংলা উপন্যাস-শিল্প পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত ভদ্রলোক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। উপন্যাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান তিনিই আমাদের দিয়েছেন। সমসময়ের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইতিহাস ও সমাজ-জ্ঞান তাঁর মতো আর কোনো ঔপন্যাসিকেরই ছিল না। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বাসনা বুকে নিয়েই বঙ্কিম বাস্তব মানুষের সাধনা ও ব্যর্থতাকে লক্ষ্য করেছেন। দেবেন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ,

প্রতাপ, গোবিন্দলাল, নবকুমার, সীতারাম এই বাসনা-চরিতার্থতার ব্যর্থ-সন্ধানী। জীবনের সামঞ্জস্য সন্ধ্যানের মূলে যে শুভবুদ্ধি কাজ করে প্রবৃত্তি তার বিরুদ্ধে যায়। তখনই অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরু হয়।'''[১] অবশ্য বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্বে সলতে পাকানোর যুগেও বাঙালির দাম্পত্য-প্রসঙ্গ এসেছে।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় উনিশ শতকের আখ্যান বৃত্তে বাঙালির নিজস্ব যুগচিহ্ন বিধৃত হয়েছে। ১৮২৩ সালে প্রকাশিত ভবানীচরণের উপন্যাসপ্রতীম নক্সাজাতীয় রচনা 'নববাবু বিলাস'-এ নববাবুর দাম্পত্য প্রসঙ্গ এসেছে। সমকালীন বাবুকালচারে অভ্যস্ত নববাবুর জীবনে স্ত্রী-সঙ্গ ঘটেনি কখনও। কেননা স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করলে বাবুশ্রেণীর চারিত্রিক গৌরব লাঘব হতে পারে। নববাবুর সঙ্গে তার স্ত্রীর যে কোনো মানসিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি, তা এই আখ্যান থেকেই জানা যায়। অথচ অন্তপুরবাসিনী বাঙালি নারীর সতীত্বও যে নতুন যুগে প্রবেশ করে মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণও মেলে এখানে। স্ত্রীর সঙ্গে নববাবুর কোনও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। অথচ নববাবু পাঁচটি কন্যার পিতা। পাঁচ কন্যার বিবাহ দিতে গিয়ে তিনি সর্বশান্ত। এই সন্তানগুলি যে তার নয়, নববাবু তা বিলক্ষন জানেন।

উনিশ শতকে এই লেখা প্রকাশের সময় নারী স্বাধীনতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। পুরুষের বহুগমন সমাজ নীরব প্রশ্রয়ে প্রায় স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু নারীর এই বহুগমন বা 'পরপুরুষ গমন' সমাজ অপরাধ হিসেবেই গণ্য করেছে। নারী দাম্পত্যের নিগড়ে নিজেকে বন্দিনী করেছে — অথচ পুরুষ স্বামীর বহুগমন সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে মূলত অর্থনৈতিক পালাবদলের সূত্রেই। কোম্পানীর সহযোগী ব্যবসায়ী-কর্মচারী হিসাবে নব্য বাবুশ্রেণি প্রভূত অর্থের মালিক হচ্ছেন। তাদের সামনে ভোগ-বিলাসের দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে। ফলে স্ত্রীর সঙ্গে এতদিনকার গ্রামীণ মানস-সম্পর্কের চিরাচরিত যোগসূত্রটি বিচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বাঙালির দাম্পত্য সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক সম্পর্কে প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। কেননা স্ত্রীদের স্বামীরা চিরকাল অধস্তন হিসেবেই গণ্য করেছে। তবুও স্ত্রীজাতিকে বাঙালি সমাজ অন্তত দেবীত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত

করেছিল। উনিশ শতকের বাবু সমাজে স্ত্রী তার স্বামীর মর্মস্থল থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হলো ; বিচ্যুত হলো মর্যাদার আসন থেকেই।

স্বামীর উপেক্ষা-অবহেলা, দাম্পত্য সম্পর্কের শীতলতার শৈথিল্যের সঙ্গে স্ত্রীরও যে অতৃপ্তি, পার্থিব বাসনা জড়িয়ে থাকতে পারে, তার অনেক প্রমাণ আমরা উনিশ শতকে পেয়েছি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এক্ষেত্রে স্ত্রী জাতিকে ভ্রষ্টা, নষ্টচরিত্রের বলতে দ্বিধা বোধ করেনি। বাল্যবিবাহ, কুলীন বিবাহের জন্য বহু দম্পতির বয়সজনিত পার্থক্য এতই বেশি ছিল যে, দম্পতির মধ্যে শারীরিক ও মানসিক ব্যবধানও দুস্তর ছিল। বারাঙ্গনা সংসর্গের কারণে স্বামী তার সহধর্মিণীকে সময় দিতে পারছে না, সে কারণে স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এমন প্রমাণ ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস'-এ (১৮৩০) আমরা পেয়েছি। সামাজিক অধঃপতন সমকালীন দাম্পত্য জীবনেও গভীর সংকটের জন্মদিয়েছিল, বঙ্কিম পূর্ববর্তী উপন্যাস-প্রতীম রচনা সমূহে তার উল্লেখ রয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির চিন্তাজগতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ঘটতে থাকে। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-বাঙালী সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন ঘটছে এসময়ে। নারীশিক্ষার কল্যাণে স্বামীর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যে নারীর এতদিন প্রবেশাধিকার ছিল না, তার প্রবেশ ঘটলো। মননের সূত্রে এতদিন পর বাঙালি নারী তার স্বামীর নর্মসহচরী হবার সুযোগ পেলো। স্থূল মাংসপিন্ডের পরিবর্তে বাঙালি নারীরা স্বামীর দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মানবী হওয়ার অবকাশ পেল। ব্রাহ্মসমাজে নারী স্বাধীনতার সুফলও ফলেছে এসময়ে। বিতর্কের যাবতীয় রসদ সত্ত্বেও উনিশ শতকের স্ত্রীরা দাম্পত্যের খেলাঘরে শুধুমাত্র পুতুল খেলার ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকলো না। বাংলার আখ্যানবৃত্তে এই নারী জাগৃতি নতুন পাঠক সমাজের কৌতুহলের বিষয় হয়ে দেখা দিল। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনুশীলিত লেখক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর সুবর্ণপথ পরিহার করে সামাজিক প্রসঙ্গে প্রবেশ করেই দাম্পত্যের সম্পর্ককে এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ যে

সমাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সেখানে দাম্পত্যও যে গভীর সংকটের জন্ম দিতে পারে ; ভবিষ্যতের পাঠককে সেই মার্গেই প্রেরণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষিতে নতুন ও পুরাতনের টানাপোড়নের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কৃতি ছাত্র ও দক্ষ প্রশাসক বঙ্কিমচন্দ্র একইসঙ্গে সাম্প্রতিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, আবার কর্মসূত্রে গ্রামবাংলার অজ্ঞান-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনজীবন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সমাজের উচ্চবাটিতে অবস্থিতির কারণে একদিকে যেমন তিনি শিক্ষিত ধনী দাম্পত্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি গ্রামীণ দম্পতিদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল নিশ্চয়। তিনি লক্ষ করেছিলেন, নারী শিক্ষার উদ্যোগ ও আয়োজনে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও সমাজের সুপ্ত শক্তিরূপে জাগরিত হচ্ছেন। একারণেই তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা মননের দিক থেকে সচেতন —

" লক্ষণীয়, বঙ্কিম নারীশিক্ষামনস্ক সাহিত্যজীবনের গোড়া থেকেই। তিলোত্তমা, বিমলা, আয়েষা, মেহেরউন্নিসা, মৃণালিনী, দলনী, চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী রাজঘরানার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রমাণ দেয়। কপালকুন্ডলা মন্দিরের অধিকারীর কাছে বাংলা সংস্কৃত দুই-ই শেখে। মনোরমা পালক পিতার মুখে মুখে পুরান শুনে শাস্ত্র শিখেছে। মুখে মুখে কবিতা বলা, (কপালকুন্ডলা), ছড়াকাটা (ইন্দিরা), দোঁহা আওড়ানো (রাজসিংহ) ও গল্পবলার (রাজসিংহ এবং দেবী চৌধুরানী) মধ্য দিয়ে যে সহজ সাহিত্য বোধ এবং জীবন শিক্ষার ঐতিহ্যিক ধারা অন্তঃপুরিকা মহলে বর্তমান, তারও নানা উদাহরণ বঙ্কিম সচেতনভাবে সাহিত্যে ছড়িয়ে রেখেছেন।"[২]

সুতরাং একেবারে অনভিজ্ঞ, সমাজও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অচেতন নায়িকাদের পরিবর্তে বঙ্কিম তাঁর আখ্যানবৃত্তে যে নারীদের স্থান দিলেন বঙ্কিমের উপন্যাসে তারাও দাম্পত্য প্রসঙ্গে অন্যতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত উপন্যাস সৃজন পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে আধুনিক মনস্তত্ত্বের সুবিখ্যাত তত্ত্বসমূহ উপস্থিত ছিল না। সুতরাং দাম্পত্য সম্পর্কের ওঠা নামার পিছনে সক্রিয় থাকা পুরুষ বা নারী মনস্তত্ত্বের বৈদেশিক তাত্ত্বিক

পরিচয় তাঁর কাছে অচেনা হলেও, তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্যের গভীর অসুখ ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর গভীর অনুভবী মন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই।

এই অনুভূতির জগতে তিনি দেখেছেন, দাম্পত্য সম্পর্কে নারী ও পুরুষের ভূমিকা উভয়তই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত তাঁর নায়িকারা যখন স্বামী নামক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে নিরুদ্ধার প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, দাম্পত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলির পিছনে থাকা গভীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। আসলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম, উপন্যাসের পরিকল্পনায় এমনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও বিবেচক যে, প্রায় পরিচিত দাম্পত্য বিভ্রাট ও তাঁর উপন্যাস সমূহে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের প্রয়াস ছিল মূলত ঐতিহাসিক ও পারিবারিক আবহ রচনা। যদিও তাত্ত্বিক আদর্শও তাঁর উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মূলত ইতিহাস ও সমকালের সমাজ তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে। বিষয় হিসেবে যা-ই নির্বাচন করুন না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে প্রাচীন রক্ষণশীলতা ও নবযুগের-অদ্ভুত সঙ্গম লক্ষ্য করা গেছে। ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দিচ্ছিল সে সময়, ফলে রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙ্গে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন সমকালীন যুবসম্প্রদায়। এই ভাঙনের ফলে পুরোনো সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষায় দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন বঙ্কিম। পুরোনো সমাজ কাঠামোর উপর নতুন যুগের রঙের প্রলেপ দিয়ে তিনি প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে আপাত সমন্বয়ের প্রয়াস করেছেন। ফলে তাঁর অধিকাংশ লেখার মতোই তাঁর উপন্যাসেও এক আশ্চর্য স্বরিরোধ লক্ষ্য করা যায়। মিল বেন্থাম-কোঁতের যুক্তির জগতে তিনি স্থিতু হতে চেয়েছেন, অথচ তাঁর সত্তায় মিশে আছে চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার। ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্র অঙ্গীকার ভুলে তাঁর নায়করা অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রূপের বহ্নিজালে পতঙ্গের মতো আত্মসম্বিত বিসর্জন দেয় — " উপন্যাস পড়তে গিয়ে কখনও কি মনে হয়নি রূপ বর্ণনা বা সৌন্দর্যমুগ্ধতার ক্ষেত্রে সংযতচিত্ত বঙ্কিম যেন কেমন ধরনের

দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। কখন কখন ভাবতে ইচ্ছা জেগেছে, দ্বি-পত্নীক বঙ্কিমের দাম্পত্যে নিশ্ছিদ্র রসতৃপ্তিই বোধহয় এই আত্মহারা ভাবাবেশের মূলে।''[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের দাম্পত্যের অভিজ্ঞতা, সমকালীন যুগ পরিবেশও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীকে প্রভাবিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দাম্পত্যের শ্রী ও সৌন্দর্য একদিকে যেমন বিকশিত, তেমনি নষ্ট দাম্পত্যেরও অজস্র উদাহরণ রয়েছে। 'দুর্গেশ নন্দিনী'-র বীরেন্দ্র-বিমলা, 'মৃণালিনী'-র পশুপতি-মনোরমা, 'দেবী চৌধুরানী'-র প্রফুল্ল ব্রজেশ্বর, 'ইন্দিরা'-র উপেন্দ্র-ইন্দিরা সম্পর্কের বিপ্রতীপে আমরা অনায়াসে 'বিষবৃক্ষ'-র নগেন্দ্র-সূর্যমুখী, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর 'গোবিন্দলাল-ভ্রমর' এবং দাম্পত্যকেও প্রত্যক্ষ করি।

দাম্পত্য সম্পর্কের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা ভারতবর্ষের প্রাচীন বিশ্বাসকে ছুঁয়ে আছে। তবে নব্যশিক্ষিত বাঙালি পাঠক 'ভিক্টোরিয়ান' নীতিবোধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে দাম্পত্য-সম্পর্কে অন্যকোন স্ত্রী বা পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রাচীন যুগ থেকে বঙ্গদেশে বহুবিবাহ সমাজ স্বীকৃত ছিল। ভাগ্যকে যতই অভিশম্পাত দিক না কেন, সতীন সহযোগে বাঙালী রমণী গৃহস্থ সংসারে এতদিন তো অভ্যস্তই ছিল। তাহলে 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — উপন্যাসে কোন সামাজিক সংকট তৈরী হলো, যা ভেঙ্গে দিল দাম্পত্যের চিরাচরিত সম্পর্ককে?

তাহলে কি বিধবাকেন্দ্রিক প্রণয়-জটিলতা উপন্যাসে এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছে? নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনী বা গোবিন্দলালের 'রোহিনী'— উভয়েই বিধবা। নগেন্দ্রের বিধবা বিবাহ সুখের হয় নি। কিংবা গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সম্পর্কও কোনো সুষ্ঠু মার্গ দেখাতে পারেনি পাঠককে। অর্থাৎ ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস থেকে ১৮৭৮ সালে এসেও ('কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ) সমাজ অস্বীকৃত প্রণয়কে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি বঙ্কিমচন্দ্র। 'বিষবৃক্ষ'-র মূল বিষয় বিধবার বিয়ে আর 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর বিষয় বিধবার সমাজ অস্বীকৃত প্রেম। কিন্তু এই প্রেম ও বিবাহ শেষ পর্যন্ত উপন্যাস দুটির দাম্পত্য সংকটের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় না। ''এই উপন্যাসে বিধবার বিয়ে নিয়ে সোজাসুজি কিছু কথা বলা হয়েছে, কিছু ভাবনা

আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশে স্থাপিত বলে তা সত্য হয়েও উঠেছে। কিন্তু বিষবৃক্ষের মানবিক সমস্যার ভিতরে তার শিকড় নেই। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে বিয়ে করার জন্য বিধবা-বিবাহের সমর্থন করেছে। কিন্তু তার যন্ত্রণা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এ কারণে নয় যে 'বিধবা' কুন্দনন্দিনীকে ভালোবেসে বা বিয়ে করে সে সনাতন নীতির লঙ্ঘন করেছে। সূর্যমুখী ব্যক্তিগত কারণেই বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছে।... অন্যচিন্তায় অন্য ভাবাবেগে এদের মনের সঙ্কট।''[৪] অর্থাৎ শুধুমাত্র বৈধব্য সমস্যাই নয়, বঙ্কিমের বিখ্যাত এই দুটি সামাজিক উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে 'অন্য ভাবাবেগে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এ পাঁচটি দাম্পত্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ আছে। তারাচরণ-কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী-নগেন্দ্র, শীশ-কমল, হৈমবতী-দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী। এরমধ্যে সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রের দাম্পত্যই লেখকের মূল অন্বিষ্ট। সেখানে কুন্দনন্দিনীর প্রবেশ দুই দম্পতির মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের প্রবেশে যে মানসিক টানপোড়ের জন্ম হতে পারে তার বিস্তারিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লেখকের পক্ষে উপস্থিত করা যুগগত কারণেই সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু তার প্রেক্ষাপট যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে, উপন্যাসে তার প্রমাণ মেলে। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক যোগাযোগ ও বন্ধন শিথিল হয়ে পড়লেও যে দাম্পত্য সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে, দেবেন্দ্র ও হৈমবতীর ক্ষেত্রে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। একমাত্র কমল ও শীশ-এর দাম্পত্য প্রীতি-মধুর। কেননা সেখানে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্ভ্রমের সঙ্গে মিশেছে সহমর্মিতার অনিবার্য স্পর্শ। এই জিনিসটির অভাব ছিল বলেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমর ও গোবিন্দলালের দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বামীর জন্য নিজের সতীত্বধর্ম বিসর্জন দিতে রাজী হয় নি ভ্রমর। সনাতন ভারতীয় দাম্পত্যের ঐতিহ্য অস্বীকার করে ভ্রমর স্বামীর বিরুদ্ধে যে নিরুচ্চার প্রতিবাদ করেছে, বঙ্কিম মানসে তাও অভূতপূর্ব।

দাম্পত্য শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সংকটের মুখোমুখি হয় না। নারীদের অপরিমেয় জীবনতৃষ্ণাও দাম্পত্য সংকটকে ঘনীভূত করে তুলতে পারে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের

'শৈবলিনী' তার প্রমাণ। পন্ডিত স্বামী চন্দ্রশেখর স্বয়ং জানেন যে তিনি তার যুবতী স্ত্রীর জীবনতৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করতে অপারগ। এই অসম দাম্পত্যে শৈবলিনী অস্বস্তিবোধ করেছে। স্বামীর বিকল্পের অনুসন্ধান করে সে বাল্যপ্রেমিক প্রতাপকে আকড়ে ধরতে চেয়ে সংসার ছেড়ে পথে নেমেছে। নারীর এই কুলত্যাগ বঙ্কিমচন্দ্র নৈতিকভাবে সমর্থন করেননি। ফলে উপন্যাসের শেষপর্যন্ত শৈবলিনী মানসিক বিকারগ্রস্থতায় নিমজ্জিত হয়েছে। রোহিনী বা কুন্দনন্দিনীরও পরিণতি সুখকর হয়নি, আসলে সমাজ স্বীকৃত, ঐতিহ্যাশ্রয়ী দাম্পত্যেই বঙ্কিম চিরকাল আস্থা রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির পর্যালোচনা করলে দাম্পত্য মনস্তত্ত্বের এই সত্যই উদঘাটিত হবে।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ — এই সময়সীমার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মোট চোদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছেন —

১. দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫ খ্রি.)
২. কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)
৩. মৃণালিনী (১৮৬৯)
৪. বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
৫. ইন্দিরা (১৮৭৩),
৬. যুগলাঙ্গুরায় (১৮৭৪)
৭. চন্দ্রশেখর (১৮৭৫),
৮. রজনী (১৮৭৭),
৯. কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
১০. রাজসিংহ (১৮৮২, প্র.সং)
১১. আনন্দমঠ (১৮৮৪),
১২. দেবী চোধুরানী (১৮৮৪),
১৩. রাধারানী (১৮৮৬),
১৪. সীতারাম (১৮৮৭ খ্রি.)

* রাজসিংহ (চতুর্থ সং ১৮৯৩ খ্রি.)

— এই উপন্যাগুলির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'রজনী'। 'রজনী' উপন্যাসটিতে দাম্পত্য জীবনের জটিল কোনো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ছবি নেই। তবুও আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয়ের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের গভীর সংযোগ থাকায় 'রজনী' উপন্যাসের আলোচনাকে আমাদের প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে এবং আলোচনার প্রথমেই আমরা উপন্যাসটিকে রেখেছি।

মনসচেতনতা বা মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে বঙ্কিম উপন্যাসের ধারায় 'রজনী' (১৮৭৭ খ্রি.) উপন্যাসের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন ধরনের আঙ্গিকে কাহিনি পরিবেশন করেছেন। তিনি নিজে অখ্যান বর্ণনা না করে উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রকে বক্তার ভূমিকা ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমেই উপন্যাসের কাহিনি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। 'রজনী'-র পূর্বে 'ইন্দিরা' (১৮৭৩ খ্রি.) উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রেও অবশ্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে 'ইন্দিরা' উপন্যাসে বক্তার ভূমিকায় ছিল শুধুমাত্র একটি চরিত্র-ইন্দিরা। ফলে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের আবেগ-অনুভূতির, বিচিত্র জটিল মানসক্রিয়ার অভিব্যক্তি 'ইন্দিরা'-র তুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় ফুটে উঠেছে 'রজনী' উপন্যাসটিতে। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রজনী' উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও গঠন কৌশলের অভিনবত্বের প্রশংসা করেছেন — "পীড়িতাবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের মধ্যে রজনীর প্রতিপ্রেম কিরূপে বদ্ধমূল হইল তাহার একটি সুন্দর উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা বঙ্কিম শচীন্দ্রের মুখে দিয়াছেন; এবং এই পরিবর্তনের যতটুকু মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তাহা দুই এক পরিচ্ছেদ পরেই সন্ন্যাসীর নিকট পাওয়া যাইতেছে। ... গঠন কৌশলের দিক দিয়া 'রজনী'তে বঙ্কিমের কৃতিত্ব সামান্য নহে।"[৫]

রজনী অন্ধ। দৃষ্টিহীনতার জন্য তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা অনেক বেশি। শব্দজ্ঞান ও স্পর্শসুখকে কেন্দ্র করে রজনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়বৃত্তির উন্মোচন উপন্যাসটিকে বিশেষ তাৎপর্য মন্ডিত করে তুলেছে। উপন্যাসের প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শচীন্দ্র চিবুক ধরে রজনীর দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষার চেষ্টা করলে তার হাতের সামান্য স্পর্শে রজনীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় — "সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি — সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতরে ফুলের রাশি। আ

মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল ! বলিয়াছি ত কাণার সুখ দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। আ মরি মরি — সে নবনীত — সুকুমার — পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ-দুঃখ আমাতেই থাকুক। যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম, তাহা তুমি, বিলোলকটাক্ষকুশলিনি! কি বুঝিবে?''[৬]

পুরুষের হাতের স্পর্শে রজনীর অন্তর্জগৎ আলোড়িত হয়। রূপ দর্শনের কামনায় সে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ব্যাকুল উক্তিতে চেতনোর্ধ্ব বা অবচেতন মনের অস্তিত্বের দিকটিই আভাসিত হয়েছে—'' বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্তনীয় শক্তি ধর, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থসকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষ জাতি দেখিতে কেমন? দেখাওমা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তজন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে —আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীট-পতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা — কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে — কি দোষে আমি কখনও দেখিব না?''[৭]

মানুষের সব আচার আচরণ যে তার চেতন মনের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না তা আমরা জানি। তার সচেতন ক্রিয়া-কর্মের পশ্চাতে অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের ব্যাপক প্রভাব থাকে। তাই দেখা যায়, রজনী শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনার মানসে কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বার বার তাদের বাড়িতে ছুটে যায় — যেন কে চুল ধরে নিয়ে যায়। যে অদৃশ্য শক্তি তাকে শচীন্দ্রের বাড়িতে যেতে অনুপ্রাণিত করে তার উৎসমূল যে

মনের চেতন স্তরে নয়, অন্যকোনো স্তরে রয়েছে — বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রজনী' উপন্যাসে সেই দিকটিই ইঙ্গিত করেছেন। শচীন্দ্রের বাড়িতে রজনীর বার বার যাওয়ার বিষয়টি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'-র 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ নং শ্লোকটিকে — 'অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।''

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রথম খন্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বলেছেন— '' মনুষ্য বড়ই পরাধীন।''[৮] অর্থাৎ সচেতন মনের ইচ্ছায় মানুষ কোনো কর্ম তথা পাপকর্ম করতে না চাইলেও কখনো কখনো তা করতে বাধ্য হয় — চেতন মনের নিয়ন্ত্রক অন্য কোনো মনের প্রবল শক্তির প্রভাবে। রজনীও বাধ্য হয়েছে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ক্রিয়া করতে। এক্ষেত্রে রজনীর আচরণে চেতনোর্ধ্ব মন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়-ই আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের প্রথম খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রজনী সুখ-কে মনের ক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছে —'' আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র — শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে — নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান্ দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র,শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপ-সুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্বময় না হইবে?''[৯]

— সুখ ও রূপ সম্পর্কে রজনীর এই বক্তব্যে মানস জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকটিই আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের মূলে আদিম প্রবৃত্তির (ইদ্ বা অদসের) দুর্বার শক্তি ক্রিয়া করে। অনিয়ন্ত্রিত অন্ধ প্রবৃত্তিই-মানুষের সকল দুঃখের মূল। রজনীর মনোবেদনার-কারণ ও তার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি— যার জন্য শচীন্দ্রের প্রতি আকর্ষণকে সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না।

উপন্যাসটির প্রথম খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে রজনীর উক্তিতে তার দুঃখ-বেদনার স্বরূপ ও মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটি ফুটে উঠেছে —

" দুঃখ ভোগ করি — কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্বদা দেখিতে পাইব যে, তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময় দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া, শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে — কিন্তু কি দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না — পরে বুঝিবে কি? ইহা কি সামান্য দুঃখ?"[১০]

চতুর্থ খন্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতা সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "শচীন্দ্র সর্বদা রজনীর নাম করে কেন? এর উত্তরে সন্ন্যাসী বলেছেন বায়ু রোগে "হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে।" সন্ন্যাসী স্বপ্নের কথাও বলেছিলেন— "যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন।"[১১]

সন্ন্যাসীর উক্তির মধ্য দিয়ে মনের চেতন স্তর বহির্ভূত অন্য স্তর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

আমরা জানি, মানুষের অচেতন বা নির্জ্ঞান মনের গোপন ইচ্ছা স্বপ্নরূপে চেতন স্তরে উঠে এসে তৃপ্তিলাভ করতে চায়। স্বপ্ন হল অপূর্ণ বাসনার পরিপূরণ। তবে নির্জ্ঞানের কোনো বাসনাই অবিকৃত ভাবে স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে না। চেতনে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলি ছদ্মরূপের আশ্রয় নেয় — আত্মপ্রকাশ করে বিকৃত রূপে। নির্জ্ঞান মনের কামনা-বাসনা অবদমিত হলে ঐ অবদমিত এষনাগুলি স্বপ্ন, মুদ্রাদোষ, দৈহিক ব্যাধি, বিভিন্ন ধরণের বাতিক, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ভুল-ভ্রান্তির মাধ্যমে তা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্রের অবদমিত বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তার মানসিক ব্যাধি ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। অন্ধ রজনীর চিবুক স্পর্শ করার পর শচীন্দ্রের মনে প্রেমাবেগ জেগেছিল। কিন্তু সে পরিবার ও সমাজের কথা ভেবে তার প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে দমন করে পাঠিয়ে দিয়েছিল মনের নির্জ্ঞান গুহায়। ফ্রয়েড এর মতে মানুষের চেতন মনের অবদমিত কামনা-বাসনা অবদমিত হলেও বিলুপ্ত হয় না। তারা নির্জ্ঞানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এর পর তারা

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশে চেতন স্তরে উঠে আসে; আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। শচীন্দ্রের নির্জ্ঞান মনের গোপন প্রেম-বাসনাও তাই তার পীড়িত অবস্থায় প্রলাপের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে — "ওহে ধীরে রজনী ধীরে! ধীরে ধীরে, আমার এই হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ কর ! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে রজনি ধীরে! ক্ষুদ্রা এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর;— দীপ শলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে, যে, শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে— তোমায় ত পাষাণগঠিতা পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে জানে, পাষাণেও লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্নুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরসিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়।"[১২]

উপন্যাসটির চতুর্থ খন্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে শচীন্দ্র স্বপ্নে দেখেছে —" কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম — আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম— ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে।"[১৩]

শচীন্দ্রের মনোবিকার ও স্বপ্ন আধুনিক মনস্তত্ত্বের মানসিক ব্যাধি ও স্বপ্নতত্ত্বের দিকটিকেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বপ্নে রজনীর জলে ওঠানামার বিষয়টি এবং নদী বা গঙ্গার মতো আধারের চিন্তা — ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী পুরুষের নির্জ্ঞান মনের কামজ-চিন্তার প্রতিফলন। একে বঙ্কিমচন্দ্র অপদেবতার প্রভাব বলে ব্যাখ্যা না করে মানসিক বিকার, কামনার প্রভাব বলেই বর্ণনা করেছেন। শচীন্দ্রের স্পর্শলাভের পর অন্ধরজনীর মনে প্রেমোন্মেষ ও তার মানস জগতের দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ যেভাবে 'রজনী' উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে তার মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাও প্রশংসনীয়।

'রজনী' উপন্যাসে সেই অর্থে কোনো দাম্পত্য-সঙ্কট নেই। লেখক যখন সংযত নৈপুণ্যে প্রৌঢ় স্বামীর সঙ্গে তরুণী লবঙ্গলতার দাম্পত্য জীবন বর্ণনা করেন, তখন অন্তরালে লবঙ্গলতার করুণ দীর্ঘশ্বাসটি গোপন থাকে না। তবে দম্পতির বয়সের এই গুরুতর পার্থক্য উপন্যাসে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু, অত্যন্ত যত্নে নির্মিত দাম্পত্যের মধ্যে কোথাও যে একটু ফাঁকফোকর ছিল তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় অমরনাথের সঙ্গে পুনঃসাক্ষাতের ঘটনায়। তবে অমরনাথের সঙ্গে পুনঃসাক্ষাতের পরেও লবঙ্গলতার দাম্পত্য জীবনে কোনো সঙ্কট ঘনিয়ে ওঠেনি, বরং স্বামী-দেওরের মাথার ওপর ছাদটুকুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে লবঙ্গলতার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ওদিকে, ঘটনার জটিলতা অবসানের পর অন্ধ রজনী সঙ্গে শচীন্দ্রের মিলন যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ওদিকে, ঘটনার জটিলতা অবসানের পর অন্ধ রজনী সঙ্গে শচীন্দ্রের মিলন যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রত্যাশিত পরিণতি। সুখী ও তৃপ্ত দাম্পত্যই শুধু নয়, এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য প্রেমের মধুর প্রাপ্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন রজনীর অন্ধত্বমোচন ও চক্ষুষ্মান পুত্রসন্তানলাভের ঘটনাও।

কপালকুণ্ডলা ঃ

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্টিক অবেষ্টন-রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।"[১৪] উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কপালকুণ্ডলা বাল্যকাল থেকেই মুক্ত অরণ্য প্রকৃতি কাপালিক ও অধিকারীর সাহচর্যে বেড়ে ওঠে। তাই দৈবের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল তার চরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা। নবকুমারকে বিবাহ করে সপ্তগ্রামে পতিগৃহে যাবার প্রাক্‌কালে সে দেবীর অভিপ্রায় জানতে চেয়েছিল। দেবীর তার বিল্বপত্র গ্রহণ না করায় তার মনে হয় অরণ্য প্রকৃতি ত্যাগ করে নবকুমার তথা স্বামীর সঙ্গে পতিগৃহে যাত্রা দেবীর অনুমোদন পায় নি। নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ ও দৈব বিশ্বাস কপালকুণ্ডলাকে সংসার ও

দাম্পত্য জীবনের প্রতি বিমুখ করে তুলেছিল। 'কপালকুণ্ডলা' সামাজিক উপন্যাস নয়। তবে একটি জটিল সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই যে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে তা আমাদের জানা— লোকালয় থেকে দূরবর্তী নির্জন-প্রকৃতির কোলে কাপালিকের সংসর্গে লালিতা রমণী সমাজ সংসারে আসলে স্বাভাবিকভাবে ঘরকন্না করতে পারবে কিনা? বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরটি অনুসন্ধানের জন্য সামাজিক সমস্যার রূপরেখায় জটিল মনস্তত্ত্বের জাল রচনা করেন নি। 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যোপন্যাসে তাই সামাজিক উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রন রীতি অনুসারে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি অঙ্কিত হয় নি। কপালকুণ্ডলার-নবকুমারের দাম্পত্যে যে সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে প্রধানত কপালকুণ্ডলার সংসার-বিবাগী সংস্কার ও অলৌকিক দৈবের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। ননদ শ্যামাসুন্দরীর স্বামীর বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহে রাত্রে বনে যাওয়ার প্রসঙ্গে সে বলে — "যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না"[১৫]

বাল্যকাল হতে সমুদ্রতীরে, অরণ্যে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় তার অবচেতন মনে অরণ্য-প্রকৃতির প্রতি একটা সুতীব্র আকর্ষণ ছিল। আবার কাপালিকের আশ্রয়ে মানুষ হওয়ায়-ধর্মমূলক অলৌকিতার প্রতিও তার মোহ প্রবল ছিল। তাই লুৎফ-উন্নিসা অর্থাৎ নবকুমারের পূর্বপত্নী পদ্মাবতীর কাছে সে যখন জানতে পেরেছে, দেবী ভবানী স্বপ্নে কাপালিককে দেখা দিয়ে কপালকুণ্ডলাকে বধ করার জন্য তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, তখন ভক্তিমতী কপালকুণ্ডলার মনে আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। নিজের মনেই সে বলে —"কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চ ভূত লইয়া কি হইবে?"[১৬] কপালকুণ্ডলার চেতন মনের ধর্মসংস্কার ও নির্জ্ঞান মনের মনের সংসার-বিবাগী সংস্কার তাদের দাম্পত্য সংঘাতের জন্য অনেকটাই দায়ী। সমাজ প্রতিবেশের মধ্যে বড় হওয়া একজন নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-চেতনা যেভাবে বিকশিত হয়, কপালকুণ্ডলার তেমন হয় নি। তার জৈবিক সত্তা তথা যৌবনধর্মের বিকাশও ঠিকভাবে হয় নি বলে মনে হয়। শুধু বিবাহ-বিষয়ে-তার ধারণা ছিল না এমন নয়, নারী-পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যও

তার অজানা। তাই-নবকুমারের প্রতি তার কোনো অনুরাগ বা ভালোবাসা গড়ে ওঠে নি।

কপালকুণ্ডলার এই কামশীতলতা-ই নবকুমারকে তীব্র মর্মযন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বৃষবৃক্ষ' অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়কের ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য যেমন তাদের রূপজ মোহকে দায়ী করা হয়, কপালকুণ্ডলার রূপের প্রতি তীব্র আসক্তিকেও তেমন নবকুমারের মর্মযন্ত্রণা বা ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য দায়ী করা হয়। রূপের মোহে অন্ধ হয়ে সে স্ত্রীকে অবিশ্বাসিনী ভেবেছিল। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ চতুর্থ খন্ডের 'প্রেতভূমে' নামক নবম পরিচ্ছেদে আদিম প্রবৃত্তির তীব্র দহনে নবকুমারের দগ্ধ হবার চিত্র ফুটে উঠেছে তার উক্তিতে —''তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই—''[১৭]। ''... তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিন্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিত আইস নাই।... ''মৃন্ময়ি! কপালকুণ্ডলে আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি— একবার বল যে, তুমি তুমি অবিশ্বাসিনী নও — একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।''[১৮] নবকুমার কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যে সমস্যার বীজ তাদের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার মনের চেতন-অচেতন স্তরের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই পাঠকের সামনে সেই দিকটিই তুলে ধরেছেন।

নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী, তা সুখের ও ছিল না। বরং দ্বাদশবর্ষীয়া স্ত্রীর গৃহত্যাগে নবকুমারের প্রেমিক-চিত্তে অতৃপ্তি স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছিল। সমুদ্রতীরে 'অপূর্ব নারীমূর্তি, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সেই দীর্ঘসঞ্চিত যৌন অচরিতার্থতা বাঞ্ছিত তৃপ্তির স্বপ্ন দেখেছিল। অরণ্যের পরিবেশ, অধিকারী কর্তৃক প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা ছিলেন রোমান্সের জগতের পাত্রী, বাস্তব সমাজের জটিল জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল না। দেহসৌষ্ঠবে পরিপূর্ণা নারী, অথচ যৌন চেতনা বিকশিত হয়নি। নারীর জীবনে পুরুষের প্রয়োজন সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন অসচেতন। এক বছরের দাম্পত্যজীবনে তাঁদের মধ্যে কোনো যৌন সম্পর্ক হয়েছিল, এমন কোনো ইঙ্গিতও উপন্যাসে নেই। শুধুমাত্র

শ্যামাসুন্দরীর জন্য গভীর রাত্রে অরণ্যমধ্যে অলৌকিক বনৌষধির সন্ধানে যখন গিয়েছেন, তখন নবকুমারের স্নেহপরিপূর্ণ নিষেধ-বাণীর উত্তরে তিনি বলেছিলেন- ''আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা দেখিয়া যাও।''[১৯] এরপর ''নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ''[২০] এক বছরের দাম্পত্য তথা সামাজিক জীবনে কপালকুণ্ডলা শুধুমাত্র 'অবিশ্বাসিনী' শব্দটুকু শিখেছিলেন। যাই হোক, কাপালিক ও মতিবিবির যুগ্ম চক্রান্তে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলেও বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে সচেতনভাবে নবকুমারকে পত্নীনিষ্ঠ প্রেমিক হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। একথা ঠিক যে, বধ্যভূমিতে নবকুমারই উত্তেজিত মস্তিস্কে কপালকুণ্ডলাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু এজাতীয় নিষ্ঠুরতার পিছনে কার্য-কারণ সূত্রগুলিও ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রথমত, কাপালিক নবকুমারকে উত্তেজক মদিরা পান করিয়েছিলেন, ফলে তাঁর স্বাভাবি বিচার-বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, নানাকারণে স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় জাগ্রত হয়েছিল, অরণ্যমধ্যে বনৌষধি সন্ধানরতা কপালকুণ্ডলাকে অনুসরন করে নবকুমার একটি সংশয় উদ্রেককারী দৃশ্য দেখেছিলেন-- পুরুষবেশধারী মতিবিবির সঙ্গে কপালকুন্ডলাকে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপচারিতায় মগ্ন দেখেছিলেন। তারপরেই তাঁর হস্তগত হয় দুর্বোধ্য সঙ্কেতপূর্ণ এক চিঠি যা কপালকুণ্ডলার কবরী থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। এই চিঠি নবকুমারের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এই অংশে মনোবিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র অসামন্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। অন্তিম দৃশ্যে, নদীবক্ষে তলিয়ে যাবার আগে স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়ার দৃশ্যটিও বেশ সংবেদী। অকস্মাৎ গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিতা স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য নবকুমারও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি সন্তরণে অক্ষম ছিলেন না, অনেকক্ষণ কপালকুণ্ডলাকে খুঁজলেন, পেলেন না! শেষে নিজেও আর উঠলেন না অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে না পেয়ে নবকুমারও স্বেচ্ছা-নিমজ্জন বরণ করে নিলেন। তাঁর প্রথম দাম্পত্য সুখের হয়নি, কপালকুণ্ডলাকে ঘিরে দ্বিতীয় দাম্পত্যের সুখ-স্বপ্নও অচরিতার্থ থেকে গেল। প্রথমটির ক্ষেত্রে মনোবিশ্লষণের বিশেষ সুযোগ ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় দাম্পত্যের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কাহিনীর জটিলতা নির্মাণের এক নতুন সম্ভবনার দ্বার উন্মোচন করলেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, দ্বিতীয়বারের বিবাহিত জীবনের মধ্যে যখন শনিগ্রহের মতো মতিবিবি প্রবেশ করতে চাইছেন, তখন

অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তায় নবকুমার সেই সম্ভবনাকে প্রতিহত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও বলা প্রয়োজনযে, ইতিহাসের পটে স্থাপিত হলেও, স্বল্পে পরিসরে বঙ্কিমচন্দ্র শেরখাঁ ও মেহেরউন্নিসার দাম্পত্য জীবনের আপতিক সুখ এবং অন্তরালে মেহেরের গভীর অতৃপ্তির চিত্র চমৎকার এঁকেছেন। মতিবিবির সঙ্গে মেহেরউন্নিসার ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের দৃশ্যে মেহেরউন্নিসার দাম্পত্য অতৃপ্তি ও অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চমৎকার সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে।

বিধবা বিবাহ কেন্দ্রিক সমস্যার বাইরেও যে নারীর অন্য সমস্যা থাকতে পারে; বিশেষত প্রেম-সম্পর্কের টানাপোড়েনেও যে নারীর মন উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তার পরিচয় মেলে। ইতিপূর্বে 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে কিংবা 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে নারীর চাওয়া-পাওয়া দাম্পত্য সমস্যাকে ঘনীভূত করে তোলে নি। 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসে অতীত ইতিহাসের পরিসরে বঙ্কিমচন্দ্র নারীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটের অভিমুখ খুঁজে পেলেন। 'বিষবৃক্ষ'-র তুমুল জনপ্রিয়তার পর, তিনি সামাজিক উপন্যাসের পথ থেকে পুনরায় ইতিহাসের চেনা ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, অথচ ইতিহাস সেখানে গৌণ হয়ে গেল। আর মীরকাশীম-ইংরেজ বিরোধের পরিবর্তে অনৈতিহাসিক চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী প্রধান হয়ে উঠছে ঐ নষ্ট-দাম্পত্যের কল্যাণেই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক দাম্পত্যের অতৃপ্ত নারীর অন্তর্জগতের পরিচয় দিলেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মীরকাশীম ব্রিটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। কিন্তু মীরকাশীম কিংবা ইতিহাস যে মূলকাহিনির সহযোগী চরিত্র হিসেবে এই উপন্যাসে উপস্থিত হচ্ছে, শৈবলিনী অনুসরণ করলে, এই তথ্যই সত্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের প্রবেশরূপে লিখিত 'উপক্রমনিকা' অংশের শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখরই উপন্যাসের গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ করেছে। শৈবলিনী প্রতাপের বাল্য সহচর। ''শৈবালিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে।''[২১] কিন্তু 'বাল্য প্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।'[২২] ফলে প্রতাপ ও শৈবলিণীর বাল্যপ্রেম

কোনো বৈবাহিক পরিণতি পেল না। বরং তাদের দুজনের মধ্যে প্রবেশ করলেন চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর স্বামী। মূল আখ্যায়িকার সূচনা ঘটেছে শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের বিয়ের আটবছর পর।

শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের আট বছরের দাম্পত্য-সম্পর্কে যে যথেষ্ট শীতলতা ছিল, তার প্রমাণ মেলে চন্দ্রশেখরের ভাবনার মধ্যে। শৈবলিনীর 'সুষুপ্তিসুস্থির' মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রশেখর এই অসুখী দাম্পত্যের উত্তাপহীনতা উপলব্ধি করেছেন—"চন্দ্রশেখর ভাবলেন, হায় কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। একুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত— শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণপন্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাকে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব— অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভবনা নাই।"[২৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন স্বামীর এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে চন্দ্রশেখরের চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও ঔদার্যের পরিচায়ক। কিন্তু এটুকু বাদ দিলে চন্দ্রশেখরও সমকালীন যুগপ্রতিবেশ থেকে ব্যতিক্রমী হতে পারেন নি। তিনি জানেন যে তার স্ত্রী অসুখী। শুধুমাত্র বয়সজনিত ব্যবধান নয়, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে রুচি ও প্রবৃত্তিগত ব্যবধানও বিস্তর ছিল। অথচ এই ব্যবধান ঘুচিয়ে তিনি স্ত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে উদ্যোগী হলেন না। গ্রন্থকীট চন্দ্রশেখর তাই অনায়াসে ভাবতে পারেন —

"আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্তে আত্মসুখ পরায়ণ— সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?"[২৪]

স্বামী হিসেবে চন্দ্রশেখর দায়িত্বপরায়ণ। নাপিতানী বেশী সুন্দরীর বক্তব্য থেকে কিংবা উপন্যাসের উপান্তে শৈবলিনীর মস্তিষ্ক বিকৃতির সময় শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরের

অতুল প্রেমরাশির সন্ধান আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু নারীর মন সবসময় ভালো মানুষকে প্রত্যাশা করে না। বরং সে খোঁজ রক্তমাংশের প্রেমিককে, স্বামী চন্দ্রশেখর ঈশ্বরতুল্য জেনেও, শুধুমাত্র প্রেমের কোনো আকর্ষণ স্বামীর প্রতি সে অনুভব করেনি বলেই শৈবালিনী চন্দ্রশেখরের ঘরে ফিরতে চায়নি। শৈবালিনী জানিয়েছে —

''মরিতে হয়, না হয় মরিব।— মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না।''[২৫]

স্বামীর ও কর্তব্যধর্মের মধ্যে বাল্যপ্রেমিকের ছায়াও কি শৈবলিনীকে উত্তেজিত করে তোলে নি? সুন্দরীর কথা মতো শুধুমাত্র স্বামীর চরণ সেবা করে প্রেমহীন জীবন কাটাতে চায়নি শৈবলিনী। অষ্টাদশ শতকের রমণী হয়েও বিশ শতকের জাগ্রত নারী স্বাধীনতার মননে সে যেন ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে তার প্রেমাষ্পদকে। প্রতাপ শৈবলিনীকে যবনের হাত থেকে উদ্ধার করার পর শৈবালিনী প্রতাপকে মনে প্রাণে তার ইষ্টদেবতা রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। বলেছে —''আমার এ দুর্দশা কোথা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য''[২৬]

শুধুমাত্র স্বামীর শৈথিল্য যে শৈবলিনীর দাম্পত্য-ক্ষত তৈরি করেনি, শৈবলিনীর সংলাপে তার প্রমাণ মেলে। নারী মনস্তত্ত্বের প্রথম সোপানে তার প্রথম প্রেমই চিরজাগ্রত থাকে। শৈবলিনী ভুলে যায় যে, এই প্রতাপকেই একদিন সে আত্মহত্যার প্ররোচনায় প্রতারিত করেছিল। আট বছরের দাম্পত্য জীবনে পূর্বপ্রেমিক প্রতাপই শৈবলিনীর সমস্ত হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছ —'' তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি। নহিলে ফষ্টর আমার কে?''[২৭]

প্রতাপের প্রতি এই দুর্নিবার আকর্ষণ যে ইদ্ বা অদসের প্রভাবে বা রূপজ মোহ থেকে জন্ম নিয়েছে, তারও চিহ্ন উপন্যাসে থেকে গেছে। শৈবলিনীর 'স্ফুটনোন্মুখ

যৌবনকালে' প্রতাপ অনন্ত রূপের জ্যোতি জ্বালিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিল বলেই শৈবলিনী তার স্বামীর সঙ্গে অন্তরের প্রেমিক পুরুষের লাবণ্যকে মেলাতে পারে না। প্রতাপের রূপের আগুন দগ্ধ করেছে শৈবলিনীকে। মানসিক বিকারের সময় শৈবালিনীর অচেতন মনে এই ঘটনার প্রতিফলন পাওয়া যায়। শৈবলিনী বলে —

"শৈবলিনী কে? রসো রসো একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল। মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"[২৮]

উনিশ শতকীয় বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মন সমাজ বর্হিভূত নারীর এই রূপতৃষ্ণা অনুমোদন করেনি। গৃহবধূ শৈবালিনীর পর পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ ও গৃহত্যাগ সমাজের চোখে গর্হিত অপরাধ। সমাজ এই ভ্রষ্টা নারীকে কখনও সমাজে ফিরিয়ে নেবে না। সুতরাং প্রয়োজন ছিল নারীর শুদ্ধিকরণ। উপন্যাসে শৈবলিনীর তীব্র মানসিক কষ্ট এই শুদ্ধিকরণেরই নামান্তর মাত্র। অন্ধকার পার্বত্যগুহায় শৈবলিনী অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্নে নরক দর্শন করে —

" শৈবালিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই — দুকূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোত বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুন্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে।... শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।"[২৯]

শৈবলিনীর এই নরক যন্ত্রণাভোগ প্রকৃতপক্ষে তার মনের গহনে লুকিয়ে থাকা অপরাধ ও পাপবোধ থেকেই জন্মেছে। সে জানে, স্বামীকে পরিত্যাগ করে সে সনাতন স্ত্রী ধর্মকে লঙ্ঘন করেছে। সমাজের চোখে সে সতী রমণী নয়। অসতীত্বের ঘৃণাবোধ তাকে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করেছে। পাশাপাশি তার স্বামীর স্মৃতি এক গৌরবোজ্জ্বল দ্যুতিতে তার মনে জাগরূক হয়েছে। ফলে স্বামীর স্মৃতি তার মনে এক প্রবল অন্যায় বোধের জন্ম দিয়েছে। শৈবলিনীর-অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা বা নির্জ্ঞান মনের দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিই তাকে

গৃহচ্যুত করেছে। এই প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব-সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। শৈবলিনী চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফষ্টরের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রের যে পরিণতি হইয়াছে তাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে; যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহাতেই উভয়ের ইন্ধন যোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফষ্টরের পাপ ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না; আবার ফস্টারের দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না। সুতরাং শৈবলিনীর কাহিনিটি সাধারণ অত্যাচারের কাহিনি অপেক্ষা অনেক এবং ইহার মানসিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক অধিক সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে আলোচিত হইয়াছে।''[৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৭৯) থেকেই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ। এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব প্রকাশিত উপন্যাস তিনটি থেকে স্বতন্ত্র। বহুগুণের অধিকারিণী সূর্যমুখীর প্রেমে নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য-জীবন বেশ সুখেই চলছিল। স্বামীর প্রতি সূর্যমুখীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল অচলা। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা প্রবল থাকায় সে তাই কুন্দনন্দিনীকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দানের ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি করে নি। কুন্দনন্দিনী বিধবা। তার বিয়ে হয়েছিল তারাচরণের সঙ্গে। সূর্যমুখীর সঙ্গে তারাচরণের সম্পর্ক ছিল অনেকটা ভ্রাতা-ভগ্নীর। তারাচরণের মৃত্যুর পর ঘটনাচক্রে উদ্ভিন্ন-যৌবনা বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর দাম্পত্যের মধ্যে এসে পড়ে। কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব সূর্যমুখীর দাম্পত্য-জীবনকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কুন্দনন্দিনীর রূপ নগেন্দ্রের মনে উত্তেজক হিসেবে ক্রিয়া করতে থাকে। তার আচার-

আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নগেন্দ্রের মানসিক পরিবর্তনের দিকটি সূর্যমুখীর চোখেই প্রথম ধরা পড়ে। একাদশ পরিচ্ছেদে ননদ কমলমণির কাছে লেখা তার প্রথম পত্রে স্বামীর পরিবর্তনের জন্য সূর্যমুখীর আক্ষেপ ও আত্মসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে —"আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। পৃথিবীতে যদি আমার কোনো সুখ থাকে, তবে সে স্বামী। পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী, পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে।... তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপনে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তার নাম মুখে আনেন না।... তুমি মেয়ে মানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকদের মত তাহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন ?"[৩১]

সূর্যমুখীগত প্রাণ নগেন্দ্রের চিত্তপরিবর্তনের কারণ সূর্যমুখীই একপ্রকার ব্যাখ্যা করেছে। উদ্ধৃত পত্রে, স্বামীকে কেন্দ্র করে তার আবেগ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাদের দাম্পত্য-সংকটের ইঙ্গিতও প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর দেখা যায়, নগেন্দ্র কুন্দের রূপ-সৌন্দর্যের মোহে উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা হয়ে পড়ে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের গোপন দুর্বলতা তার নিজের কাছে প্রথমে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। কারণ, সূর্যমুখীর চারিত্রিক কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য যে তার মনে স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে এমনটি নয়। তাই চিত্ত-চাঞ্চল্যের জন্য একটা অপরাধপ্রবণতা তার মনে দেখা যায়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমন্দ্রের যেটুকু মনস্তত্ত্ব-সচেতনতার পরিচয় ধরা পড়েছে তা নগেন্দ্রনাথ চরিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে ঘিরেই। সূর্যমুখীর বা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে যুগধর্ম ও সমাজধর্ম এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায়-নীতি বোধের আদর্শ। উনিশ শতকীয় দাম্পত্য-জীবনে নারী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকৃত হয় নি। পুরুষের বহুবিবাহ ছিল একপ্রকার সমাজ-স্বীকৃত। নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে যখন অগ্রসর হতে পারে নি তখন

পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তার অন্য কোনো পথ ছিল না। স্বামীর সঙ্গে পারস্পরিক বোঝা-পড়ার সম্পর্কও তার তৈরি হয় নি। পুরুষ-সুলভ অহংবোধের (ego) দ্বারা স্বামী আধিপত্য বজায় রাখত স্ত্রীর উপর। স্বামীর সংসারে স্ত্রীকেই সব সময়ে সমঝোতা করে নিতে হত।

স্বামীর অবহেলা সূর্যমুখী তাই নীরবে মেনে নেয়। নগেন্দ্র কুন্দের রূপ বহ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলে সূর্যমুখী কোনো প্রতিবাদ করে নি— সময় তাকে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার দেয় নি। সে স্বামীকে সুখী করার জন্য স্বামীর আত্মসুখ পরায়ণতা চরিতার্থ করার জন্য নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দেয় এবং স্বামীর উপেক্ষার বেদনায় মর্মাহত হয়ে অভিমানে গৃহত্যাগ করে।

সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে নগেন্দ্রের মোহমুক্তি ঘটে। সূর্যমুখীর সঙ্গে তার পূর্ব প্রেমের স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার মনে ভয়ংকর বিরূপতার সৃষ্টি হয়। নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে সূর্যমুখী ফিরে আসে। নগেন্দ্রের উপেক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করে। কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা উপন্যাসের 'কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন — ''কুন্দনদিনী প্রসঙ্গে আমরা অনেক চোখের জল ফেলে থাকি। 'কুন্দকুসুম অকালে ঝরিয়া গেল' বলে সমবেদনায় পূর্ণ হই। কিন্তু কুন্দের সমস্যারই বা স্বরূপ কী। কুন্দর জীবনাকাঙ্ক্ষার তাৎপর্য কী? সে প্রথম থেকেই বঙ্কিমের অতিপ্রাকৃত বোধের কাছে বলিপ্রদত্ত। যে-স্বপ্ন সে দেখেছে, তার জীবনের ঘটনাবর্ত শুধু সেই স্বপ্নের ইঙ্গিতকে সফল করার ট্রাজেডি-চক্র। তাকে বলা হল দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে সাবধান হতে। সেই দুই ব্যক্তি তার জীবনে কেমন অনিবার্যভাবে জড়িয়ে গেল, তার দিক থেকে কাহিনীর তাৎপর্য এইটুকু। যদি ঘটনাচক্রের এত বড়ো চাপ তাকে সহ্য করতে না হত, তবে সে হতে পারত আর একটু বাঙ্ময়। তার জীবনের শুধু শেষ দৃশ্যের কাব্যময় ব্যঞ্জনার ওপরে নির্ভর করে তাকে অমরত্ব অর্জন করার পথে যেতে হত না। অপরাধবোধকে শুধুই কুন্দের সংস্কারের উপর নির্ভরশীল রেখে দেবার ফলে, কুন্দের জীবন হয়ে পড়েছে স্ব-গত-জীবন। সে শৈশবে মা হারিয়েছে, কৈশোরে স্বামী। দু-দু বার তার সংসারের মূল ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সে

চরিত্রের কী বিবর্তন ঘটেছে, সে-কথা কিছুই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। শুধু আমরা অনুমানে বুঝি, যে এই দুই আঘাতের ফলে বাইরের দিক থেকে সে একেবারে বোবা হয়ে গেল। কিন্তু এর ত্রুটিটিও অনুধাবনীয়। এর ফলে সে-ই হয়ে উঠেছে একমাত্র বঙ্কিমী নায়িকা যার মধ্যে গতিশীলতা নেই। সে যেন শুধু সেই স্বপ্নবাণীর বিপরীত ঘটনাকর্ষণে কেমন করে চলে গেল, এই ব্যাপারটিকে রূপায়িত করার শৈল্পিক উপায়ক্রম। তার জন্ম যেন শুধু অদৃষ্টের ক্রীড়নক হবার জন্য। ফলে সে যে পরিমাণে কেঁদেছে, সে পরিমাণেই কাঁদিয়েছে।

মৃত্যুর ভিতর দিয়েই কুন্দ পূর্ণ হয়ে উঠল, জীবনের ভিতর দিয়ে নয়।''[৩২]

বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতির অভাবেই বিধবা কুন্দনন্দিনীকে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে কুন্দনন্দিনী চরিত্রটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে। কিন্তু তার হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে কীভাবে তার কোনো বিবরণ উপন্যাসে নেই। 'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্রের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান মনের কামজ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর স্বপ্নের মধ্যে তার গহন মনের জটিল চিন্তা-ভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু কুন্দনন্দিনীর সে স্বপ্নে কোনো ব্যঞ্জনার গভীরত্ব নেই। তবে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীকে কেন্দ্র করে নগেন্দ্রের চেতন-অচেতন মনের দ্বন্দ্বের মধ্যে মনের বিভিন্ন স্তর ও মানুষের দুর্জ্ঞেয় প্রবৃত্তি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ফুটে উঠেছে। অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব, আত্মগত সংলাপ, লেখকের নিজস্ব প্রতিবেদন প্রভৃতি আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছদে নগেন্দ্রের চারিত্রিক পরিবর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—''দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্তিত হইতে লাগিল। নির্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল — নিদাঘকালের প্রদোষাকের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।''[৩৩]

এই পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের যে মানসিক পরিবর্তনের ছবি চিত্রিত হয়েছে তা মনস্তত্ত্ব সম্মত — ''ইতিপূর্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ। শুধু রাগ নয়। একদিন, রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র

অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন, সূর্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রর মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত, নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিতা হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। একদিন সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটি চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন, বলিলেন, ''কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।'' নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি দোষ ?''

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্যমুখী উত্তর করিলেন, ''দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।''

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, ''সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।''[৩৪]

বয়ঃসন্ধিকালে কুন্দনন্দিনীর নারী-রূপের মাধুর্যই নগেন্দ্রকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। ফলে তার মানস-বিকৃতি দেখা যায়, আচার-আচরণ হয়ে ওঠে অসঙ্গতিপূর্ণ। নগেন্দ্রের মানস-বিকৃতি মনস্তত্ত্বের বহুবল্লভতার কামনার (Polymorphous Perverse) সঙ্গে তুলনীয়। কোনো উত্তেজক (Seduction) আদিম প্রবৃত্তি বা অদস (Id)-কে উত্তেজিত করলে প্রেম-প্রবৃত্তি বিকৃতি লাভ করে।

নগেন্দ্র আত্মসুখ পরায়ণতা বা (Pleasure Principle) নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কুন্দকে অধিগত করতে চেয়েছে। তার আত্মসুখ-পরায়ণ প্রবৃত্তি এমন দুর্বার হয়ে উঠেছিল যে, সে সূর্যমুখীর প্রেম-মাধুর্যও স্বল্পকালের জন্য বিস্মৃত হয়েছিল। নির্জ্ঞান মনের অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি বা অদসের প্রভাব তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। কুন্দর রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা বা বংশ রক্ষার তাগিদ তার প্রবৃত্তির প্রাবল্যকে তীব্র করে তুলেছে বলে মনে হয়। পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে দেখা যায়, ভগ্নীপতি শ্রীশচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে সে জানিয়েছে —'' আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া

গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা-ইহা কি অযুক্তি?''[৩৫]

নগেন্দ্র প্রবৃত্তির প্রভাবকে অবদমন করতে চেষ্টা করে। যেদিন থেকে সে বুঝতে পারে কুন্দের রূপ-সৌন্দর্যে তার চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে, সেদিন থেকেই সে তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, তাকে দৃষ্টির বাইরে রাখতে চেয়েছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কমলমণির উদ্দেশ্যে লেখা সূর্যমুখীর পত্রেই তার প্রমাণ রয়েছে। ফ্রয়েড বলেছেন যে, মানুষ তার মনের কারখানা ঘরেরও মালিক নয়। নগেন্দ্রের মনও তার বিবেক-বুদ্ধি বা অধিশাস্তার (Super ego) নির্দেশ মানতে চায় নি। নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেক সময় মানুষের সচেতন আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। বন্ধু হরদেব ঘোষালকে একটি পত্রে নগেন্দ্রনাথ লিখেছে—'' আমার উপর রাগ করিও না — আমি অধঃপাতে যাইতেছি।''[৩৬] নগেন্দ্রের চেতন-অচেতনের দ্বন্দ্বে ঠিক পথে থাকা ও অধঃপাতে যাওয়ার সংঘাত ফুটে উঠেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এই দ্বন্দ্ব সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। নগেন্দ্রের চেতন সত্তা সূর্যমুখীর প্রেমের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু নির্জ্ঞান সত্তা তাকে কুন্দনন্দিনীর দিকেই ঠেলে দিয়েছে। ফলে তার মনে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়। কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে তাকে বিবাহ করা পর্যন্ত নগেন্দ্র অপরাধবোধের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে সূর্যমুখীর কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলেছে যে, তার নিজের অপরাধের জন্য সে মর্ম-যন্ত্রণা ভোগ করছে — সূর্যমুখীর কোনো অপরাধ নেই।

স্ত্রীর কাছে অপরাধ স্বীকারের পরও নগেন্দ্রনাথ অপরাধ-বোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় নি। এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার নির্মম ব্যবহারের মধ্যে। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলে তাকে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গে কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্রের কথোপকথনে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের বিরূপতাই প্রকাশিত হয়েছে —'' কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?''

নগেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, যেমন ছিল, তেমনি হয় তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?''

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, ''তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ — তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না — আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?''

নগেন্দ্র বলিলেন, ''ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়--তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।''

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন — কিন্তু নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, ''এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ — কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।'' কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যঞ্জনে রত হইলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, ''কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?'' কুন্দ কহিলেন, ''না।''

না কেবল একটি ছোট্ট ''না'' বলিয়া আবার চুপ করিলেন। তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?

কু। বাসি বই কি

ন। ''বাসি বই কি?'' এ যে বালক-ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভালবাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না — তাহা নহে — কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন না, আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, ''আমাকে সূর্য্যমুখি বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন? লোহার শিকলই ভাল।''[৩৭]

বিবাহের এক পক্ষকাল যেতে না যেতেই দেখা যায় কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের মোহভঙ্গ হয়। আসলে অসংযত চিত্তবৃত্তি নগেন্দ্র চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার

অস্থিরমতি স্বভাবও কুন্দের ভয়ংকর পরিণতির জন্য দায়ী করা যায়। বন্ধু হরদেব ঘোষালকে লেখা একটি পত্রে এক সময় নগেন্দ্র কুন্দের রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। বিবাহের কিছু দিন পরেই আবার একটি পত্রে তাকে লিখেছে — ''আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি।...সূর্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ।...আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বই কি — তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম — প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি — এখনই বলিব কেন, ''আমি তাহাকে ভালোবাসিতাম?'' ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি — কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে।''[৩৮]

কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের ভালবাসা যে প্রবৃত্তির দাহ ভিন্ন কিছু নয়, তা তার কথাতেই জানতে পারা যায়। নগেন্দ্রনাথ মোহমুক্ত হয়ে কুন্দের প্রতি তার আকর্ষণকে বলেছে 'চোখের ভালাবাসা'। তা সত্ত্বেও বলা যায় সূর্যমুখীও কুন্দনন্দিনীর আকর্ষণ-বিকর্ষণকে ঘিরেই তার চরিত্রের যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকাশিত হয়েছে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের অন্যকোনো চরিত্রে তেমন প্রকাশিত হয় নি। বিধবা কুন্দের বিবাহ-ঘটনার পর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সমাজ-হিতের আকাঙ্ক্ষা (গৃহে গৃহে অমৃত' ফলানোর উদ্দেশ্য) ও ন্যায়-নীতিবোধের আদর্শ বড় হয়ে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়। প্রবৃত্তির অসংযম ও রূপজ মোহ তাঁর কাছে গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়েছে —''নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল!''[৩৯]

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই সনাতন নৈতিক আদর্শ মেনে চলা উচিত। নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করাই পাপ। সমাজ-হিতের জন্যই পাপীর দন্ডবিধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অসংযত চিত্তবৃত্তির জন্য তাই নগেন্দ্রের প্রায়শ্চিত অনিবার্য হয়ে ওঠে। নগেন্দ্রের অসংযত প্রবৃত্তির পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র

দেবেন্দ্রের ভোগলিপ্সা তথা দুর্বার প্রবৃত্তির দিকটিও উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। 'দেবেন্দ্র-হীরা'র উপ কাহিনির মাধ্যমে বিষবৃক্ষের বিষময় ফলের নৈতিক তত্ত্বকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রেমের নামে দেবেন্দ্র সামাজিক নীতিধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভোগলিপ্সার উন্মত্ততায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। দেবেন্দ্রের অধঃগতির মূলে আছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক কারণ। দেবেন্দ্র-হৈমবতীর দাম্পত্যের প্রত্যক্ষ কোন বর্ণনা উপন্যাসটিতে নেই। তবে পরোক্ষ বিবৃতিতে যেটুকু ধরা পড়েছে তাতে দেখা যায়, অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীর রূপ দেবেন্দ্রের রূপতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর কটু বাক্যের জন্য দেবেন্দ্র গৃহবিমুখ হয়ে ওঠে। হৈমবতীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে দেবেন্দ্রের কোনো চরিত্র দোষ ছিল না। অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষায় দেবেন্দ্রের আদিম প্রবৃত্তি বিবাহ পরবর্তীকালে দুর্বার হয়ে ওঠে। আত্মসুখপরায়ণতা বা সুখসূত্র (Pleasure Principle) নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তার মধ্যে বহুগামী মানসিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণের মূলেও ছিল তার রূপজমোহ। গৃহিণী ও গৃহ ত্যাগ করে প্রবৃত্তির তাড়নায় পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হওয়ায় দেবেন্দ্রকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে জীবনের মূল্যে। বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্র-হৈমবতীর অসুখী দাম্পত্যের পরোক্ষ বিবৃতি উপস্থাপন করায় দেবেন্দ্রের প্রেমপ্রবৃত্তির বিকৃতি অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে।

হীরার ঈর্ষা-পরায়ণতা ও অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষার জন্যই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকাশিত হয়েছে। হীরা বাল্য বিধবা। তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাই অতৃপ্তই থেকে গেছে। দত্তবাড়ির পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে সে সূর্যমুখীর দাম্পত্য সুখের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছে। সূর্যমুখীর সুখ-ঐশ্বর্যই তাকে ঈর্ষাপরায়ণ করে তুলেছে। যে সুখ তার পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে যে সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই সুখ কেন সূর্যমুখী ভোগ করবে? 'হীরার দেষ' নামক বিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় হীরার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা দেবেন্দ্রর রূপসৌন্দর্যে জাগ্রত হয়েছে; সূর্যমুখীর প্রতি তার ঈর্ষার মনস্তাত্ত্বিক কারণ ও ধরা পড়েছে—" আচ্ছা দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খায়; আমরা যদি ভালো খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন্‌মিনে

ঘ্যান্‌ঘেনে, প্যান্‌পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্মফুল ফুটে না, আর কুন্দ না নইলে দেবেন্দ্র বাবুর মনোহরণ হয় না! তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল! আর মনকে চোখ ঠার্‌য়ে কি হবে? ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করিয়াছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধরতে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বলতে লোক পেলেন না! মারি মিন্সের নাকে এক কিল। আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক্ ও সব কথা যাক্। ও পথেও ধর্ম্মের কাটা। এ জন্মের সুখ-দুখ অনেক কাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে; বরং কুন্দ যাহাতে কখনও তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়? কুন্দ যেখানে ছিল, সেইখানে থাকিলেই তার হাতছাড়া। সেই বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না। তবে সেইখানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া আসায় মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না — আর সে বাড়ীমুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি 'বাপু বাছা' বলে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি করবেন? সূর্য্যমুখীর থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে? দেবতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন, বলবো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ।"[৪০]

হীরা প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে অর্থাৎ ইদ্ বা অদসের দ্বারা চালিত হয়ে দেবেন্দ্রের রূপ বহ্নিতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রের আকর্ষণের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে কুন্দ তার ক্রোধের শিকার হয়। কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে সমর্পণ না করে লুকিয়ে রাখে। দেবেন্দ্রের প্রতি তার ভালবাসার কথা

কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে দেবেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করে। দেবেন্দ্রের আকর্ষণ কুন্দের প্রতি। সে হীরার মনের ভাব বুঝতে পেরে-ভালোবাসার ছলনা দ্বারা হীরাকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা ভাবে। হীরা দেবেন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝতে পারে। দেবেন্দ্র দত্তবাড়ির দারোয়ানদের হাতে প্রহৃত হয়। দেবেন্দ্রের সমস্ত রাগ হীরার উপর গিয়ে পড়ে —"দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দন্ডবিধানের মনস্কামসিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতী দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা, দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আসিল। দেবেন্দ্র কিছু মাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না — ভূতপূর্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন ঊর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা-মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল।"[৪১]

রূপমুগ্ধ হীরা দেবেন্দ্রের ছলনায় ভুলে প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। হীরার চরিত্রের দুর্বার প্রবৃত্তির দিকটি বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে একদিকে যেমন তাঁর মনস্তত্ত্ব-সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি ন্যায় নীতি বোধের আদর্শের দিকটিও প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় — "হীরা চিত্ত সংযম জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। —"দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যত দূর অভিলাষ করিয়াছিল, তত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।"[৪২] কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর বঙ্কিম-মানস গ্রন্থে বলেছেন—"কুন্দর ট্রাজেডি এবং কুন্দ-নগেন্দ্র সম্পর্কের অনিবার্য ব্যর্থতা এই জন্যই যে, তাহা সনাতন নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধাচার করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে, পাপাচারে

নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্যর্থতা এইজন্য নয় যে; সামাজিক সম্পর্ক তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে, ব্যর্থতা এই জন্য যে, তাহারাই বিধিবদ্ধ নৈতিক আচরণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। যে মানস-বিপ্লব ও ভাব-তরঙ্গ নগেন্দ্রের সমস্ত নীতিবোধকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার প্রথম বাস্তব অভিব্যক্তির অব্যবহিত পরক্ষণেই নগেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল; তাহার নীতিবোধ তাহাকে আঘাত করিতে থাকে, আর কুন্দনন্দিনীর অগোচর পাপচেতনা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, সমস্ত সুখেরই সীমা আছে। কিন্তু কি ভাবে এই উদ্দাম ভাব-তরঙ্গ নিমেষে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়া গেল, তাহার সঙ্গত কোন মীমাংসা বঙ্কিমচন্দ্র করেন নাই। অবশ্য তাহা প্রত্যাশিতও নয়। কারণ, তাঁহার শিল্পসৃষ্টি নৈতিক তত্ত্ব প্রমাণের বাহনমাত্র ;... নগেন্দ্র কুন্দকে ভালবাসিয়া অধর্মাচরণ করিয়াছিল; সুতরাং ফলভোগ মারাত্মক। ইহা শুধুমাত্র অনুভূতির বিক্ষেপ অথবা পাত্র পরিবর্তনের সমস্যা নয়, অথবা পরিবেশকে নূতনভাবে সৃষ্টি করার সমস্যাও নয়। নগেন্দ্রকে কয়েকটি নৈতিক অনুশাসন দ্বারা তাহার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহার ভাঙ্গা ঘর পুনরায় পরিপূর্ণ মাধুর্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। নীতিপ্রবণতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং অথবা নগেন্দ্র কেহই কখনো একথা উপলব্ধি করেন নাই যে, সূর্যমুখী হইতে কুন্দনন্দিনীতে নগেন্দ্রের অনুভূতির বিক্ষেপ তাহার একক আত্মগত মানস-প্রকরণের ফল নয়। সূর্যমুখী-নগেন্দ্র সম্পর্ক উত্তরোত্তর শিথিল হইতেছিল; তাহার সজীবতা অন্তর্হিত হইয়া অনুষ্ঠানপূত গতানুগতিক ধর্মাচরণে পর্যবসিত হইতেছিল; তাহা স্পন্দনহীন হইয়া আসিতেছিল। তাই চরম সংকট মুহূর্তেও এই সম্পর্ককে অম্লান সৌষ্ঠবে বাঁধিয়া রাখার কোন প্রচেষ্টা সূর্যমুখী করে নাই। সেজন্যই, নগেন্দ্রের পক্ষে প্রতিসংবেদী পরিবেশ সৃষ্টি করা অথবা তাহার আকর্ষণে সাড়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল। কিন্তু অনুভূতির সঞ্চার, ক্রমবিকাশ অর্থাৎ অনুভূতির নিয়মে ইহা যত বাস্তব বা সত্য হউক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নগেন্দ্রের এই মানসিক বিক্ষেপ পাপ। কুন্দর ভালবাসাও পাপ। কেননা, মানবিক সম্পর্ক ধর্ম-সম্পর্কে রূপান্তরিত হইলেই তাহা সার্থক, অন্যথায় নয়। এই সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।''[৪৩]

নগেন্দ্রের অসংযত প্রবৃত্তির তুলনায় কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার অবহেলাকে আধুনিক পাঠক গুরুতর অপরাধ হিসাবে মনে করে। তার উপেক্ষা অবহেলাই যে কুন্দকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে সে কথা কুন্দের মুখ থেকেই জানা যায়। মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্তে সে অনুতপ্ত নগেন্দ্রের সমস্ত অনুতাপকে উপহাস করে তার মৃত্যুর জন্য নগেন্দ্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায় — " কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে — কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি বসিতে — তবে আমি মরিতাম না।"[৪৪]

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করলে গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে দেখা যায়। মৃত্যুর পূর্বে নগেন্দ্রের কাছে কুন্দনন্দিনী মুক্ত কণ্ঠে জানতে চায় — "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"[৪৫] এই প্রশ্নে স্বামী তথা পুরুষতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধরা পড়েছে। কুন্দের প্রশ্নের উত্তর নগেন্দ্র দিতে পারে নি। উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক অবহাওয়ায় নগেন্দ্রের পক্ষে উত্তর দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ, তখন নারীর প্রতি অবহেলা বা উপেক্ষার কৈফিয়ৎ দেওয়া পুরুষের কাছে ছিল অসম্মানজনক। নারীর ব্যক্তিত্ব বা তার স্বাতন্ত্র্যের অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় ঐ সময়ে দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রীকে পরিচারিকা বা দাসীর ভূমিকা পালন করতে হত। স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ বা আনুগত্যের মূল্যেই স্ত্রীর ভাগ্যে জুটত স্বামীর ভালবাসা। বিশ শতকীয় মূল্যবোধের আলোকে লেখা গল্প উপন্যাসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই 'নষ্টনীড়' গল্প, 'চোখের বালি' বা 'গৃহদাহ' উপন্যাসের দাম্পত্যের সমস্যা-সংকটের সঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দাম্পত্যের সমস্যা-সংকটের একটা আশমান-জমিন ব্যবধান হওয়ায় স্বাভাবিক। 'নষ্টনীড়' গল্পের চারুলতার জীবনে অমলের আবির্ভাবে যে হৃদয়-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার হাত থেকে চারুর পরিত্রাণের কোনো উপায় ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর আত্মিক-সংকট যেন তাদের নিয়তি নির্ধারিত। আধুনিক দাম্পত্য-জীবনের জটিল ক্ষেত্রে সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর-এদের অশ্রুজল মূল্যহীন। তাই দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হলে ভূপতি-চারুলতার তীব্র মর্মযন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। দাম্পত্যে ফাঁকির দিকটি ভূপতির

চোখে যখন স্পষ্ট ধরা পড়েছে তখন তার মানসিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় — " অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল — সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক হইয়া গেল। মাঝে যে কয়দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয়দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল।"[৪৬]

চারুলতার আত্মিক সংকটও তীব্রতর। স্বামী ভূপতি তার অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারে নি। তার অতৃপ্ত প্রেমের ছিদ্রপথ ধরেই তার জীবনে অমলের প্রবেশ। তাই তার হৃদয়ে গভীরে অমলের অবস্থান, আর বাইরে ভূপতির আসন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নারীর আত্মিক সংকটের চিত্র প্রত্যাশা করা চলে না। কিন্তু পাত্র-পাত্রীর হৃদয়-দ্বন্দ্বের শৈল্পিক প্রকাশের সম্ভবনা তৈরী করে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে শেষ পর্যন্ত নৈতিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা হতাশাজনক।

' কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খ্রি.) বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। 'বিষবৃক্ষ' রচনার পাঁচবছর ব্যবধানে উপন্যাসটি রচিত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম রোমান্সের জগৎ থেকে নেমে আসেন বাস্তব জীবনে, সমাজক্ষেত্রে। 'কপালকুন্ডলার' স্বপ্নলোক, 'মৃণালিনীর'র অতীতলোক পেরিয়ে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেই যে কাহিনি আখ্যানে এসে পৌঁছায় তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — দুটি রচনাই সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। বিষয়গত কাঠামোর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিষবৃক্ষের অনুসারী। তবে 'বিষবৃক্ষ'-এর তুলনায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর অন্তর্জগতের আবেগ-অনুভূতি, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, চেতন-অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— "মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেণধর্মী উপন্যাসের আদর্শ বিষবৃক্ষের পরে কৃষ্ণকান্তে আর এক ধাপ এগিয়েছে। লেখক সরাসরি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর মানুষগুলির মনের প্রকাশ্য ও

গোপন নানা প্রবাহ —তাদের সংঘাত, তাদের আত্মীয়তা। তারই সঙ্গে ওতপ্রোত কাহিনি। নাট্যমুহূর্ত পরিহার করা হয়েছে, অথবা প্রশমিত। মন যখন বিদীর্ণ, নেহাত আকস্মিক নয় তা — বাড়ন্ত ফাটলগুলো আগে থেকেই অনুসরণ করা হয়েছে। বিষবৃক্ষের থেকেও লেখক অর্ন্তগূঢ় হতে চলেছেন — এ গল্পের মানুষেরা নিজের গভীরে অনেক তলিয়ে। নগেন্দ্রর ছিল হরদেব ঘোষাল, সূর্যমুখীর কমলমণি। গোবিন্দলাল-ভ্রমর নিজের মধ্যে একা। নিঃসঙ্গ রোহিণীও।''[৪৭]

'কৃষ্ণকান্তের উইল' যখন রচিত হয়, তখন ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আবিষ্কৃতই হয় নি। তাই মনস্তত্ত্বের কোনো পরিভাষার ব্যবহার অথবা তাত্ত্বিক ধারণার প্রকাশ উপন্যাসটিতে আশা করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পাত্র-পাত্রীর মানসিক অবস্থার দিকটি লক্ষ্য করে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তাদের চেতন-উর্দ্ধ মনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ। ভ্রমরের সঙ্গে তার দাম্পত্য-সম্পর্কও স্নিগ্ধ-মাধুর্যে ভরপুর। কিন্তু রোহিণীর প্রেম তথা রূপের আকর্ষণ তাকে দুর্বার গতিতে টানছে। ভ্রমর ও রোহিণীর প্রতি আকর্ষণকে কেন্দ্র করে গোবিন্দলালের মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র তা 'সুমতি-কুমতির'-র দ্বন্দ্বের রূপকে প্রকাশ করেছেন —

''সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের কথা নহে— আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে — তাই আর কালো ভোমরা ভালো লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সুমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই — আরও আছে!

কুমতি। আর কি

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে — বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে , ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি । আরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না — তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি । স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি । তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি । সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি । রোহিণী — সঙ্গে যাবে কি?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।''[৪৮]

— এই দ্বন্দ্ব-ই হল মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় চেতন ও অচেতন মনের চিন্তার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে গোবিন্দলালের অবদমিত বাসনা ও অহংবোধের দিকটি। কালো ভ্রমর গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণাকে নিবারণ করতে পারে নি। তাই রূপের প্রতি তার অবচেতন মনে একটা আসক্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। রোহিণীর রূপ-সৌন্দর্য গোবিন্দলালের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে যার ফলে ঘটে তার মানস-বিকৃতি। যাকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বহুবল্লভতার কামনার (Polymorphous perverse) সঙ্গে তুলনা করা যায়। রোহিণীর প্রতি প্রেমাসক্তিই তাকে নিরপরাধা স্ত্রী ভ্রমরের চারিত্রিক

ত্রুটি ধরতে প্ররোচিত করে। এটি অপরাধ-প্রবণ মনের আত্মপক্ষ সমর্থনের এক ধরণের ব্যর্থ প্রয়াস। ''স্ত্রীর দানে দিনাতিপাত করিব?'— এই জাতীয় কথায় গোবিন্দলালের অহংবোধের পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্যের দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনাকালে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিয়ে সমাজে ঔচিত্য- অনৌচিত্যের তর্ক প্রবল হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের পরিণাম নিয়ে প্রশ্নাতুর ছিলেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাস দুটিতে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টাও দেখা যায়।

উপন্যাসে নৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ হিসেবে সাহিত্য জগতে পরিচিত। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শবাদী লেখক বলেছেন। ভবতোষ দত্ত তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন —'' প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে গঠিত ছিল বঙ্কিমের মন। সাহিত্যের নীতিকেও এই নিয়মতত্ত্বই অনেকখানি অনুরঞ্জিত করেছিল। জগতের প্রত্যক্ষ রূপ — তার কার্য-কারণশৃঙ্খলা সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমি নির্মাণ করে। সেই জীবনকাহিনী, সেই আবেগ, সেই প্রেম, সেই দুঃখ, সেই মিলনই যেমন সাহিত্যের বিষয়, তেমনি তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়াও সাহিত্যের প্রদর্শনীয় অঙ্কনযোগ্য বিষয়। এদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাস্তববাদী লেখক বলা যেতে পারত। কিন্তু বঙ্কিম যে আদর্শবাদী লেখক সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের উপন্যাসে আদর্শবাদিতার দুটি দিক। একদিকে বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র বিশেষ ঘটনার সাহায্যেই নির্বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছে। বঙ্কিমের নিজের সৃষ্টি একটি উপলক্ষে মাত্র সমগ্র পাঠকচেতনাকে লগ্ন করে রাখে না, সে-চেতনা ছড়িয়ে যায় মানব-ভাগ্য ও মানব চরিত্রের সামগ্রিক অনুভূতিতে। এই অর্থে নিশ্চয়ই তিনি আদর্শবাদী। আর একদিকে, বঙ্কিম জীবনজ্বালা থেকে উদ্ধারের জন্য মেলে দিয়েছেন এক অপ্রাপ্য নৈতিক সত্যের স্বপ্নকে। সে-স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় নি, কিন্তু সে-স্বপ্ন দুঃখহত নায়ক ও বেদনাবিদ্ধ নায়িকাকে উতলা করে তুলে রসকে ঘনীভূত করে তোলে।

বঙ্কিমের নিজের রসশিল্প এই বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি হলেও তত্ত্বের আলোচনায় তিনি এর কোনো ব্যাখ্যা বা সাহিত্যনীতি নির্ধারিত করেন নি। সেক্ষেত্রে বরং তিনি

প্রত্যক্ষবাদীদের মতোই সাহিত্যসৃষ্টিতে একটি সাধারণ নিয়মকেই স্বীকার ও ব্যাখ্যা করেছেন।''[৪৯]

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-মনস্কতার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর আর কোনো উপন্যাসে তেমনটি দেখা যায় না। এখানে সমস্যার ব্যাপ্তি পরিবারের গন্ডিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে স্পর্শ করেছে। হারী, পারী, তারির মা জাতীয় পরিবার-বহির্ভূত লোকেরা উপন্যাসটিতে পারিবারিক বিরোধকে জটিল করে তুলেছে। এর ফলে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের সুখের দাম্পত্যে অবিশ্বাসের মেঘ ঘনীভূত হয়ে তাদের সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে। এখানে ঔপন্যাসিক অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটনের পথে বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে গল্পের রাশ ছেড়ে না দিয়ে গল্পকে তার স্বভাব-ধর্মের পথেই এগিয়ে চলার সুযোগ দিয়েছেন। গল্পের প্লটগ্রন্থি অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এখানে যথেষ্ট সুনিবিড়। শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '' কৃষ্ণকান্তের উইল'— এ বিশেষ বর্ণনা-বাহুল্য নাই ; লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলিতেই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, যেন গ্রন্থের বিষাদময় পরিণতি তাঁহার কল্পনা বিলাসের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের সর্বত্রই একটা সংযত ভাব-প্রকাশ, একটা পরিমিতি সামঞ্জস্যবোধ, একটা নির্দোষ ঘটনা-বিন্যাস শক্তি, ও একটা বিদ্যুৎরেখার ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান।''[৫০] পূর্বাপর ঘটনার পারম্পর্যই শুধু এখানে রক্ষিত রয়েছে — এমন নয়। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটিতে পাত্র-পাত্রীর গোপন মনের চিন্তাভাবনার পরিচয়ও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

উপন্যাসে দেখা যায়, কাহিনি যত পরিণতির দিকে এগিয়েছে ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থি ততই শিথিল হয়ে পড়েছে। প্রথম খন্ডে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান তিনটি চরিত্র অর্থাৎ গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর মন ও আচার-আচরণের বিশ্লেষণে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় খন্ডে অবশ্য তিনি মনোব্যাখ্যানের দায় এড়িয়ে গিয়েছেন। উপন্যাসটির দুটি খন্ডে মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছেচল্লিশটি। প্রথম খন্ডে — একত্রিশটি ও দ্বিতীয় খন্ডে — পরিশিষ্টসহ পনেরোটি

পরিচ্ছেদ। মূল আখ্যানের বিস্তার ঘটেছে কৃষ্ণকান্তের উইলকে কেন্দ্র করে। হরিদ্রা গ্রামের অভিজাত রায়পরিবারের প্রধান কৃষ্ণকান্ত রায়। তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র হরলাল, ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল। বিষয় বণ্টনকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে হরলালের বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিরোধ এমন তিক্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে পিতা তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্রকে বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। পুত্র হরলাল পিতা কৃষ্ণকান্তকে বিধবাবিবাহ করার ভীতি প্রদর্শন করেও কার্য-সিদ্ধি করতে পারে না। তখন হরলাল রোহিণীর মাধ্যমে আসল উইল সরিয়ে সেই জায়গায় জাল উইল রেখে আসার ষড়যন্ত্র করে। এই উইল স্থানান্তরের বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়— গোবিন্দলাল ও রোহিণী পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে— ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখের দাম্পত্যে অবিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয় — সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হয়ে দাম্পত্য-সম্পর্ককে বিপর্যস্ত করে তোলে। উইল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম খন্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের কাছে গোপন জবানবন্দী দিতে রোহিণীকে ভ্রমরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এখানে রোহিণী প্রসঙ্গে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা তাদের স্নিগ্ধ-মধুর দাম্পত্যের চিত্রকে তুলে ধরে। রোহিণী অন্তঃপুরে কেন? — ভ্রমর চুপি চুপি একথা গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করলে গোবিন্দলাল বলে —" আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে, হবে।"

" ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে? উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও। ভ্রমর বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল।"[৫১]

তবে ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের ভালোবাসা যে শর্তাধীন ছিল লেখক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন দশম পরিচ্ছেদে। গোবিন্দলাল রোহিণীর উইল চুরির ঘটনাকে বিশ্বাস করতে চায় না বলে ভ্রমরও তা বিশ্বাস করতে চায় না। এই বিশ্বাসের কার্যকারণ হল স্বামীর বিশ্বাসের সঙ্গে স্ত্রীর অবোধসাম্য। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য — "গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।"[৫২]

আসলে ভ্রমরের কালো রূপকে গোবিন্দলাল যতটা না ভালোবাসত তার চেয়ে অধিক পছন্দ করত তার নিঃশর্ত আনুগত্যের গুণকে। ভ্রমরের এই অনুগত্য তথা অত্যধিক গোবিন্দলাল-নির্ভরতা তাদের দাম্পত্য-সংকটের উপক্রমণিকা মাত্র। কোমল হৃদয়ের অধিকারী সুদর্শন পুরুষ গোবিন্দলাল বিবাহিত জীবনে ভ্রমরকে নিয়ে সুখেই ছিল বলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়। তবে তার অবচেতন মনে রূপ-সৌন্দর্য উপভোগের একটা বাসনা যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে রোহিণীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায়। স্ত্রী সপ্তদশী ভ্রমরের পাশে লাস্যময়ী বিধবা রোহিণীর উপস্থিতি তার সংযমের বাঁধকে টলিয়ে দেয়। উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সুন্দরী রোহিণীর হৃদয়-মনের পরিচয় অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন— "রোহিণী এক। জল আনিতে যায় — দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চাল-চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুন্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। ...যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি — কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথাই গেল — সুখের মাত্রা যেন পুরিল না — যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না। ... দেখিল সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে — ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ, — কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর — সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে— ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া — গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে— কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা

লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে — কি সুর মিলিল; এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কু উ।" তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।"[৫৩]

রূপসী রোহিণীর পিতলের কলসী কাঁখে জল আনতে যাওয়ার ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বকুলের ডালে বসা কোকিলের কুহু রবে। রোহিণীর যৌবনের অবদমিত কামনা-বাসনা যা অবচেতন মনের গহ্বরে সুপ্ত ছিল তা জাগ্রত হয়; তার মন হয়ে পড়ে বাসনা-চঞ্চল — এই চিত্রে রোহিণীর চেতন-উর্ধ্ব মনের স্পষ্ট পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাসে মায়ের ঈর্ষা মহেন্দ্রের দাম্পত্য-জীবনকে অনিবার্য সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়, রোহিণীর অন্তর্নিহিত ঈর্ষার ফলেই গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্য সম্পর্কে প্রথম ফাটল ধরে। সপ্তম পরিচ্ছেদে ক্রন্দনরতা রোহিণীর প্রতি সহানুভূতিশীল গোবিন্দলাল তার দুঃখ নিবারণে এগিয়ে যায়। এই পরিচ্ছেদে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের গোপন অনুরাগের কোনো পরিচয় নেই। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর ঈর্ষাকাতর মনের পরিচয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরে ভ্রমরের দাম্পত্য-ভাঙনের পটভূমি রচনা করেছেন— " কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল। যাহারা এ জীবনে সকল সুখে সুখী — মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী — তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী — কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ — আমার কপালে শূন্য?"[৫৪]

নবম পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর অনুরাগ গাঢ়তর হয়। তার হৃদয়পটে সে গোবিন্দলালের রূপকে মুদ্রিত করে নেয়। হরলালের কথায় কৃষ্ণকান্তের দেরাজে জাল উইল রেখে আসার জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে দেখা যায়। জাল উইলে গোবিন্দলালের ভাগে বিষয়-সম্পত্তি তার প্রাপ্য আট আনার পরিবর্তে ছিল মাত্র এক পাই। রোহিণীর মন ছটফট করতে থাকে এর একটা সন্তোষজনক সমাধানের জন্য।

কারণ গোবিন্দলালের প্রতি তার গোপন প্রেমই তাকে গোবিন্দলালের মঙ্গল-কামনায় তাড়িত করে। এরপর দেখা যায় 'সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বে অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের চেতন মন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্বে সে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকে। চেতন মনের পরাজয়ে রোহিণীর নির্জ্ঞান ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। সে রাতের অন্ধকারে কৃষ্ণকান্তর ঘরে যায় উইল বদল করতে, গিয়ে ধরা পড়ে হাতে নাতে। উইল চুরির জন্য দোষী রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে গোপন জবানবন্দী দেওয়ার সময় তার প্রতি তার ভালোবাসার-কথা জানিয়ে দেয়। গোবিন্দলাল নিজেও রোহিণীর দুর্বলতা ধরতে পারে —

" গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন; যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।"[৫৫] রোহিণী তার ভালবাসার কথা গোবিন্দলালকে বোঝাতে পারায় মনে মনে বেশ খুশি হয়। প্রশমিত হয় তার বৈধব্যের যন্ত্রণা— বেড়ে যায় তার জীবন-তৃষ্ণা। গোবিন্দলাল রোহিণীদের কলকাতায় থাকার নতুন বন্দোবস্ত করে দিতে চায়। উইল চুরির জন্য রোহিণীর প্রাপ্য শাস্তি যাতে লাঘব হয় তার জন্য গোবিন্দলাল ভ্রমরকে কৃষ্ণকান্তের কাছে দরবার করতে পাঠাবে বলে জানায়। ভ্রমর তার স্বভাবসুলভ লাজুকতার জন্য কৃষ্ণকান্তের কাছে গিয়ে রোহিণীর শাস্তি মুকুবের জন্য কোনো অনুরোধ করতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্তের কাছে যায়, রোহিণীর শাস্তি লাঘব হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দাম্পত্য-দ্বন্দ্বের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। গোবিন্দলাল এখানে তার রোহিণী-ভাবনার কথা দাম্পত্যের আপাত হালকা চালে ভ্রমরকে জানায়। আরও জানায় সে রোহিণীকে ভালবাসে। ভ্রমর গোবিন্দলালের কথা বিশ্বাস করতে চাইলে সে তার কোমল হৃদয়ে আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয় নি— "গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ যা করতে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।"

— বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — 'মনুষ্য বড়ই পরাধীন।'[৫৬] মানুষ পরাধীন-ই বটে। তার নির্জ্ঞান মনে যে সব বিচিত্র জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে — যার সম্পর্কে সে নিজেও

সচেতন নয়, তার প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় তার বাইরের আচার-আচরণ। গোবিন্দলালের ঐ উক্তির মধ্যে তার নির্জ্ঞান আকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ভ্রমরের ভালোবাসায় ভাগ বসানোর জন্য ভ্রমর রোহিণীকে বারুণী পুকুরে ডুবে মরার পরামর্শ দিলে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ভৎ´সনা করে। প্রতিক্রিয়ায় ভ্রমর গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণকে কটাক্ষ করে বলে —

— ' ভাবিও না। সে মরিবেনা। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে — সে কি মরিতে পারে ? ''[৫৭]

ষোড়শ পরিচ্ছেদে রোহিণীর বারুণী পুকুরে ভ্রমরের কথা মতো আত্মহত্যার চেষ্টায় কলসী ভাসিয়ে ডুবে মরার চেষ্টা গোবন্দলালের নজরে পড়ে। গোবিন্দলাল মালীর সাহায্যে তাকে তুলে নিয়ে উদ্যানের প্রমোদগৃহে শুশ্রূষার জন্য নিয়ে যায় — রোহিণীর রূপ-সৌন্দর্যে মোহিত হয়। এই উদ্যানগৃহে ইতিপূর্বে ভ্রমর ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করেনি। দাম্পত্যজীবন ক্রমশ জটিল হওয়ার আশঙ্কায় গোবিন্দলাল উদ্বিগ্ন হয়। গোবিন্দলালকে এই প্রথম দাম্পত্য সংকটের কথা ভেবে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতে দেখা যায়—''হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর ! — তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব, — আমি মরিব — ভ্রমর মরিবে । তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও — আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।''[৫৮]

এই সময়ে ভ্রমর বুঝতে পারে তার কপাল ভেঙেছে। চারিদিক তার মনের অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে। সে হাঁপুস নয়নে কেঁদে পা ছড়িয়ে অন্নদামঙ্গল পড়তে বসে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলাল ভ্রমরের প্রতি বিশ্বাসী থাকতে বন্দরখালির বিষয়-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে; রোহিণীকে ভুলতে চায়। অথচ আত্মজয়ের কোনো চেষ্টা করেনি। মনে মনে রূপের ধ্যান অব্যাহত রেখেছে। গোবিন্দলাল বন্দরখালিতে যাত্রা করে। ভ্রমরের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে গোবিন্দলাল দশদিনের পথ

বন্দরখালির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। ভ্রমর নিজেও যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়েছিল। কিন্তু শাশুড়ীর বাধায় তার ইচ্ছা পূরণ হয় না। ফলে গোবিন্দলালের বিরহে ভ্রমরের সুখের দাম্পত্য বিষন্নতায় ভরে যায়। বিংশতিতম পরিচ্ছেদে পরিচারিকারা আহার-নিদ্রা ত্যাগী ভ্রমরকে জানিয়ে দেয় গোবিন্দলালের দ্বিচারিতার কথা। অর্থাৎ ভ্রমর যতই তার চিন্তামগ্ন হয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করুক না কেন, সে তো মশগুল ঐ রোহিণীর ধ্যানে। কিন্তু পতিব্রতা রমণী কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না তাদের কানাঘুষো। তাই রাগে দুঃখে সে কেঁদে বলে — ''আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়িলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব ? এবার সে বুঝিতে পারে তার স্বামীর গোপন প্রণয়ের রহস্য। আর মনে মনে গোবিন্দলালকে স্মরণ করে বলে 'হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ !

তুমি কি সেদিন এইকথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে'' তবে এই পরিচ্ছেদের শেষেই সে স্বামীর প্রতি অটল বিশ্বাসে স্থির থেকেও নিজের জন্য বিকল্প ভাবনাও ভেবে রাখে — '' তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি ? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।''[৫৯]

এরপর একবিংশতিতম পরিচ্ছেদে মিথ্যা প্রচারে দাম্পত্য-জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রচার হয়ে পড়ে রোহিনী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। এই পরিচ্ছেদেই সুরধুনী চাকরাণী এসে তার কানে বিষ ঢেলে দেয় — '' বলি মেজোবৌ, বলি বলেছিলুম মেজোবাবুকে ঔষুধ করো। তুমি হাজার হোক গৌরবর্ণ নও। পুরুষ মানুষের মন তো কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপগুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল কে জানে ?''[৬০] মেজোবাবু অর্থাৎ গোবিন্দলাল তার আশ্রিতা বিধবা রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়েছে এই রূপ প্রচার হয়। এই পরিচ্ছেদেই ভ্রমরের মনবেদনা গভীর হয়েছে। গোবিন্দলালের প্রতি তার সন্দেহকে কাটিয়ে উঠতে না পেরে মনে মনে মৃত্যু কামনা করেছে।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদে দেখা যায় —''এখন ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। '' অর্থাৎ এই মিথ্যা রটনাতে রোহিণীও জড়িয়ে পড়েছে। তার কাছে ঐ সাত হাজার টাকার গয়নার খবর শুনে মনে হয়েছে যে এ রটনা নিশ্চয় ভ্রমরের। তাই

তার মনে এই সংকল্প বদ্ধমূল হয়েছে ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে যাবার। সেই মত সে প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে বেনারসী শাড়ি একসেট গিল্টির গয়না এনে রায় বাড়ির অন্তঃপুরে এসেছে এবং ভ্রমরকে দেখিয়েছে। এতে গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ভ্রমর তার মনের কথা এক দীর্ঘপত্রে স্বামীকে লিখেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় সেই চিঠিতেই দাম্পত্য-সমস্যার দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছে — "সেদিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরী হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙিয়া বলিলে না, দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালংকার দিয়াছ তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে। তুমি মনে জান বোধহয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা — তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি ; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ি আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও — আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"[৬১]

পতিব্রতা রমণী ভ্রমরের অচলা বিশ্বাসে ফাটল ধরে। এখন আর সে এক তরফা স্বামীতে আস্থা রাখে না। অর্থাৎ দাম্পত্যের যৌথ বা পারস্পরিক সম্পর্কের গুমোরটা ভ্রমর চায়, উভয়ত ব্যবহারের নিরিখে যাচাই করে নিতে। এই চিঠি হাতে পাওয়া মাত্র গোবিন্দলাল হতবাক হয়ে যায় — "গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেক বার সন্দেহ করিলেন — ভ্রমর তাহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনোও বিশ্বাস করেন নাই।"[৬২]

রোহিণীর কাকা ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একটি পত্রও গোবিন্দলালের হাতে পড়ে। তার বিষয় অবশ্য রোহিণীকে দেওয়া সাতহাজার টাকার অলংকার নিয়ে নালিশ। বন্দরখালির জলবায়ু আর তার সহ্য হচ্ছে না এই আছিলায় গোবিন্দলাল বাড়িতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। ভ্রমর তার স্বামীর আগমনের কথা শুনে পূর্বঘোষণা মতো তার পিত্রালয়ে চিঠি লিখলেন, গোবিন্দলাল পৌঁছবার চার পাঁচদিন আগে নিজের অসুখের কথা উল্লেখ করে পিত্রালয়ে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়ে। ভ্রমর ঐ চিঠিতেই উল্লেখ করে দেয় তার শ্বশুর বাড়িতে যেন অসুখের কথা না বলা হয়।

গোবিন্দলাল বাড়িতে ফেরে। তার প্রতি অভিমানে অবজ্ঞায় ভ্রমরের পিত্রালয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারে, পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি তাদের দাম্পত্যের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয় — "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না! যাহার ভ্রমর নাই, সেকি প্রাণধারণ করিতে পারেনা ?"[৬৩] যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। গোবিন্দলাল তার মাকে ভ্রমরকে আনার বিষয়ে নিষেধ করলেন। সেইমত কৃষ্ণকান্ত আর কোন উদ্যোগ নিলেন না। দাম্পত্যে জট পাকাতে শুরু করল। পরিবারের লোকেরা একপ্রকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে দেখা যায় ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের অনীহা, অভিমান আরও প্রকটিত হয়েছে। এরপর আরও দুচারদিন কেটে গেলেও ভ্রমরকে যেমন কেউ আনল না, তেমনি ভ্রমরও নিজের উদ্যোগে শ্বশুর বাড়িতে আসে না। ভ্রমরের গৃহত্যাগকে কেন্দ্র করে গোবিন্দলালের মানস-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক যেভাবে গোবিন্দলালের নির্জ্ঞান মনের চিন্তাকে উন্মোচিত করেছেন তাতে চেতন-উর্ধ্ব মন সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

" গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, একথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের

জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি ? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভালো হয়, দাগ ভালো হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে। শেষে দুর্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা।''[৬৪] গোবিন্দলালের মানসিক পরিবর্তনটি খুব সহজেই বোঝা যায়। কেন না সে এতদিনের স্ত্রীকে সামান্য ভুলবোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে বাড়ি আনতে তৎপর হয়নি। বরং ঠিক তার উল্টোটাই করেছে, স্ত্রীর অভিমানের বশে বাপের বাড়ি যাওয়াতে তাকে জব্দ করতে রোহিণীকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। দুর্বল চিত্তের গোবিন্দলাল এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল। নইলে সে ভ্রমরকে ভুলতে রোহিণীর চিন্তা করবে কেন? আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে — গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্যের গভীরতা নিয়ে। তাদের সম্পর্কের বাঁধুনি যে আলগা ছিল তা বোঝা যায় গোবিন্দলালের ভ্রমর-ভোলার প্রয়াসে — ''রোহিণী কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল।'' দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। এভাবেই চলল গোবিন্দলালের ভ্রমর ভোলার প্রক্রিয়া রোহিণীর মাদকতায় আবিষ্ট হয়ে।

ষড়বিংশতি পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক আমাদের জানিয়েছেন গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণার্ত জীবন-পিপাসার কথা। উপন্যাসে আছে '' গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল — কেননা রূপতৃষ্ণা অনেকদিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে।''[৬৫] রূপ-বহ্নিতে পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়াই যে দুর্বল চিত্তের পুরুষের যেন নিয়তি, সংযমের বাঁধ শিথিল হলে জীবন যে যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে তা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাবেই এখানে ঘোষণা করেছেন।

এই পরিচ্ছেদেই দাম্পত্য-জটিলতা অন্য মাত্রা পায় — কৃষ্ণকান্তের কানে ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল ও বিধবা রোহিণীর অবৈধ-প্রণয়ের বাড়াবাড়ির বার্তা পৌঁছে যাওয়াতে। তিনি গোবিন্দলালের চারিত্রিক কলঙ্কে ব্যথিত হন। আমরা দেখেছি এই পরিচ্ছেদেই চতুর্থ তথা শেষ বারের জন্য কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্তন ঘটেছে। উইলের সবটা অপরিবর্তিত রেখে কৃষ্ণকান্ত কেবল গোবিন্দলালের অংশেই পরিবর্তন এনেছেন—''কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার স্থানে ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে

লেখ।''[৬৬] এই উইল পরিবর্তনের পরেই কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ঘটে। সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে ভ্রমরকে আনার উদ্যোগ নেওয়া হল। ভ্রমর এসে গোবিন্দলালের সঙ্গে কোনরকম বাগ্‌বিতন্ডায় যাওয়ার অবকাশ পেল না। ঔপন্যাসিক বলেছেন — ''গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল।''[৬৭] তারা দুজনেই এই পরিচ্ছেদে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং সময় চেয়ে নিলেন উভয়ের মনে ঘনিয়ে ওঠা বিস্তর জটিল ভাবনার কথা বলে নেওয়ার জন্য। দাম্পত্যের ঠান্ডা লড়াই, দ্বন্দ্বের প্রকাশ এই পরিচ্ছেদে গোপন থাকে নি। ঔপন্যাসিক চমৎকার বর্ণনায় উভয়ের মানসিক দূরত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ''দিন যেমন কাটিত তেমনি কাটিতে লাগিল, — দেখিতে তেমনই দিন কাটিতে লাগিল, দাস দাসী, গৃহিণী , প্রৌঢ় স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেম প্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। ... যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই।''[৬৮]

দাম্পত্য সম্পর্কের শীতলতার দিকটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গভীর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। '' আগে কথা কুলাইত না — এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। অর্ধেক ভাষায়, অর্ধেক নয়নে নয়নে অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে।''[৬৯]

অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের পর গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ে ভ্রমরকে তা শোনায়। এই প্রথম ভ্রমর জানতে পারে উইলে জ্যেষ্ঠ শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত তাকে অর্ধাংশ লিখে দিয়ে গেছেন। গোবিন্দলালের এই কথা শুনে ভ্রমর তাকে দানপত্র লিখে দিতে চেয়েছে, চেয়েছে তার স্বামীকে সব সম্পদের অধিকারী করে দাসানুদাসী হয়ে থাকতে। কিন্তু গোবিন্দলাল তার অহংবোধের জন্য ভ্রমরের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে নি।

এই উইল পরিবর্তন দাম্পত্যে জটিলতা সৃষ্টির একটা বড় কারণ হয়ে উঠেছে। ঘটনাগুলি এমন পর পর এসে গেছে যে দাম্পত্য সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে।

সমালোচক মোহিত লাল মজুমদার ইগো (ego) সম্পর্কে বলেছেন — "মোটের উপর নারীর ধর্মে ও পুরুষের ধর্মে একটা বিরোধ অনিবার্য — যদি দুঃখেরই আত্মাভিমান প্রবল হয়, পুরুষের পৌরুষ বলিতে যাহা বোঝায় তাহা ঐ আত্মাভিমান ভিন্ন আর কিছুই নয়, নারীর আত্মাভিমান একটা রিপু, কিন্তু পুরুষের তাহাই শক্তি।"[৭০]

গোবিন্দলাল সেই জন্যই তার স্ত্রীর নামে উইল করা সম্পত্তি নিতে অস্বীকার করে বলেছে — "তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে?"

ভ্রমর তার অজ্ঞতা ও শত অপরাধের মার্জনা চেয়েছে — "অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে — আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।" কিন্তু গোবিন্দলাল এসব আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনায় কান না দিয়ে রোহিণীর ভাবনায় বিভোর হয়ে ভেবেছে — "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী ; এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব। — আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজন শূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যেদিন ইচ্ছা সেইদিন ভাঙিয়া ফেলিব।"[৭১] এই ভাবে গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকার সংকল্পকে দৃঢ় করেছে। দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ দিনের ভালবাসার সম্পর্ককে উপেক্ষা করে অসহায় ভ্রমরকে কাঁদিয়ে মায়ের সঙ্গে কাশী যাওয়ার সংকল্প করেছে। ভ্রমরকে তার আত্মসংশোধনের সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। বরং সে মনে মনে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার কথা ভেবে চরম সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেছে।

ত্রিংশতি পরিচ্ছেদের শেষে গোবিন্দলাল রোহিণীর সিদ্ধান্তে অবিচল। ভ্রমর আলোচ্য পরিচ্ছেদের শেষে অনোন্যপায় হয়ে উচ্চারণ করেছে তার সর্বশেষ প্রত্যয়, বলেছে—

" তবে যাও — পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। — কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও — একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও — একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায় ? — দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে

তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমার আমার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি — ... তুমি যাও আমার দুঃখ নাই ! তুমি আমারই — রোহিণীর নও।''[৭২]

প্রথম খন্ডে কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্তন দাম্পত্য-সম্পর্ককে জটিল সমস্যার সামনে ঠেলে দিয়েছে। উইল পরিবর্তনের ফলেই ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় খন্ডে রোহিণী-গোবিন্দলালের সম্পর্কের পরিণতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দেখা যায় মাধবীনাথকে। মাধবীনাথের লক্ষ্য ছিল ভ্রমরের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনা। এইজন্য রোহিণী ও গোবিন্দলালের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যুক্ত করা হয় নিশাকরকে। নিশাকরের উপস্থিতির ফলে গোবিন্দলাল ক্রোধান্ধ হয়ে রোহিণীকে হত্যা করে। মাধবীনাথের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিনী-গোবিন্দলালের যে দুর্বার ভোগাকাঙ্ক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল, প্রসাদপুরের বিলাসকুঞ্জে তার ট্রাজিক পরিসমাপ্তি ঘটে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মাঘ, ফাল্গুন সংখ্যায় কিছু অংশ প্রকাশিত হবার পর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে উপন্যাসটির প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা আবার প্রকাশিত হলে — বৈশাখ থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত উপন্যাসটি আবার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এবং প্রথম সংস্করণে রোহিণীকে দুশ্চরিত্রা, লোভী, কামাতুরা, হীনচেতারূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। পরবর্তী সংস্করণে রোহিণী চরিত্র বদলে যায়। গোবিন্দলালের চরিত্র 'বঙ্গদর্শন' এবং প্রথম তিন সংস্করণে প্রায় একই ছিল। চতুর্থ সংস্করণে চরিত্রটি পূর্বাপর বদলে গেছে — ''আগেকার গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে

চাহিয়াছিল, শেষের দিকটায় গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎ সাধনার দ্বারা শান্তিলাভ করে।'' (উপন্যাস প্রসঙ্গ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯)।

ভ্রমরের মৃত্যুর পর দেখা যায় গোবিন্দলাল একদিন মধ্যাহ্নকালে বারুণীর তীরে ভগ্ন প্রস্তরমূর্তির পদতলে গিয়ে বসে। তখন বেশ কিছুক্ষণ তার মনের চেতন-অচেতন ভেদরেখা লুপ্ত হয়েছিল। চেতন-স্তর ছেড়ে অবচেতনের মধ্যে তার মন ডুব দিয়েছিল। সে সময়ে অবচেতন স্তর থেকে অবিরল চিন্তাধারা তার মনে উঠে আসতে দেখা যায় — ''রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ-ভ্রমর রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল — প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল — আর নাই— এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন।... বেলা দুই প্রহর — আড়াই প্রহর হইল — গোবিন্দলাল সেইখানে —সেই ভগ্নপুত্তলপদতলে সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে।...রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে,

'' এইখানে!''

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, '' এইখানে — কি?''

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে —

'' এমনি সময়ে !''

...আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, ''হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।''[৭৩]

— গোবিন্দলালের এই অসংলগ্ন চিন্তাপ্রবাহ আমাদের মনে করিয়ে দেয় আধুনিক উপন্যাসের চেতনাপ্রবাহমূলক (Stream of consciousness) পদ্ধতির কথা। বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ঐ বিশৃঙ্খল, অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা রচনার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ আমরা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু অবচেতন মনের চিন্তাপ্রবাহ উপন্যাসটিতে যতটুকু যেভাবে ফুটে উঠেছে তাতে চেতন-উর্ধ্ব মনসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ভ্রমর-গোবিন্দলালের সমস্যা-কণ্টকিত দাম্পত্যে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছদই সত্য হয়ে থাকে। গোবিন্দলাল আদিম প্রবৃত্তির (ইদ্ বা অদসের) অপ্রতিরোধ্য তাড়নায় রোহিণীর রূপ-বহ্নিতে আত্মোৎসর্গ করার জন্য ঝাঁপ দেয়। সুখের দাম্পত্যের এই পরিণতির জন্য গোবিন্দলালের প্রবৃত্তির অসংযম প্রধানত দায়ী। তবে রোহিণীর যৌবন-তৃষ্ণা তথা অবদমিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাসনা, ভ্রমরের ভুল সিদ্ধান্ত দাম্পত্য-সম্পর্ককে বিপর্যস্ত করার জন্য কম দায়ী নয়। গোবিন্দলাল বিদেশ ভ্রমণে যেতে চাইলে ভ্রমর একপ্রকার নিষ্ক্রিয় থেকেছে। স্বামীর ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ তাকে করতে দেখা যায়নি। গোবিন্দলালের প্রত্যাবর্তন ও গৃহে ভ্রমরের অনুপস্থিতিজনিত ক্ষোভ তাকে রোহিণীমুখী করে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড়াল করিও না, যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে তবে সূতা ছোটো করিও।" এই তত্ত্বের বাস্তবতা খুব কম। বিশ্বাসের ভিত্তি দুর্বল হলে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার গভীরতা না থাকলে কেবল চোখে চোখে পাহারায় রেখে দাম্পত্য-বন্ধন অটুট রাখা যায় না। দাম্পত্যে সমস্যা বা দাম্পত্য-কলহ তো দাম্পত্য-বিচ্ছেদ নয়। বরং দাম্পত্য কলহ বা ভুল বোঝাবুঝির অম্ল-মধুর সম্পর্কই দাম্পত্য জীবনে বৈচিত্র্য আনে। সাময়িক বিচ্ছদের পর স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলে মিলনের আনন্দ মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভ্রমরের আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বরূপের উন্মোচন তাদের দাম্পত্য-সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে বলা যায়। কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠার জন্য ভ্রমরকে কখনোই প্রধান আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না জয়ন্ত বন্দ্যোঃ

বলেছেন — ''দাম্পত্য ও অসঙ্গত ভোগলিপ্সার সঙ্গে তীব্র সংঘাতে কৃষ্ণকান্তের উইলের সমস্যাসূত্র জটিলতর হয়েছে। বিবাহ নামক সমাজ গ্রন্থিই দাম্পত্যের স্থিতি রক্ষায় সক্ষম কিনা, নারী-পুরুষের যৌথ দায়িত্ব পালনের প্রশ্নটি ঠিক কতটা সক্রিয় হওয়া দরকার, পরিবর্তমান মূল্যচেতনায় অভ্যস্ত সাংসারিকতা কতটা সঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ইত্যাদি প্রশ্নে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্য। এই সমস্যাকণ্টকিত দাম্পত্য থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে গোবিন্দলাল, সেও অতৃপ্তিজনিত ভোগাকাঙ্ক্ষার তাড়নায়। গোবিন্দলাল-রোহিণী সংসর্গে কাজেই ঔচিত্যের প্রশ্ন ঘিরে রয়েছে গোবিন্দলালকে।''[৭৪]

প্রবৃত্তির অসংযম জীবনে কত ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর চারিত্রিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মোহগ্রস্ত হয়ে তাকে ভালোবেসেছে। অন্যদিকে বিধবা রোহিণীও সামাজিক সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিবাহিত গোবিন্দলালকে ভালবেসেছে। রোহিণীর অবদমিত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল হরলালের বিবাহ-প্রস্তাবে। হরলাল আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য রোহিণীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। এরফলে রোহিণীর যৌবন-ধর্মে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তার জীবনে উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত হরলাল বিধবা-বিবাহে অসম্মত হয় বংশাভিজাত্যের কারণে। কিন্তু যে রোহিণী যৌবনধর্মের টানে-বিড়ালকে কটাক্ষ হানত ; বিধবার অনৌচিত্য দোষের কলঙ্ককেও অবনত মস্তকে গ্রহণ করত সে তার হৃদয়ে জেগে-ওঠা আকাঙ্ক্ষাকে আর সংযমের শাসনে বাঁধতে পারে নি। তার মধ্যে একজন নারীর সমস্তরকম গুণ ছিল। ভ্রমরের তুলনায় রূপে-গুণে তার অসাধারণত্ব সম্পর্কে সে সচেতন ছিল। এজন্য তার মনে নিজের সম্পর্কে একটা উচ্চধারণা গড়ে উঠেছিল। যাকে মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় Superiority complex বলে। তাই বিধবার অসুখী জীবন-যাপনের জন্য তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি রোহিণীর চলন-বলন, আচার-আচরণ সমাজের আর দশজন বিধবাদের মতো ছিল না। স্বতন্ত্র জীবনবোধই তাকে অন্যান্য বিধবাদের থেকে আলাদা আসনে বসিয়েছে। তার ব্যর্থ নারীত্বের জীবনে পুনবিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাশা ভাসিয়ে দেয় তার বিবেচনাশক্তি ও মূল্যবোধকে। যৌবনের অতৃপ্ত ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই সে গোবিন্দলালকে

সম্মোহনশরে বিদ্ধ করে। গোবিন্দলালের ভালবাসায় সে তার উত্তপ্ত-যৌবনজ্বালা মেটাতে চায়। তার এই চাওয়া সংগত কি অসংগত তার বিচার সমাজতাত্ত্বিকেরা করবেন। কিন্তু মনস্তত্ত্বের ক্ষুরধার গতিস্রোত যে তার ভোগাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ক্রিয়া করে তাকে গোবিন্দলালের সঙ্গে অসামাজিক জীবন-যাপনে লিপ্ত করেছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দুটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র নায়কের রূপমোহকে তাদের পতনের মূলীভূত কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে রূপমোহ হল অপ্রতিরোধ্য সহজাত প্রবৃত্তি। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, রোহিণী — এদের রূপমোহ প্রকৃতপক্ষে যৌন প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেউ কেউ মনে করেন, প্রবৃত্তির অসংযমের জন্য সূর্যমুখীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ; আর গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের সংঘাত হয়ে উঠেছিল তীব্রতর। উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে ভ্রমর গোবিন্দলালকে জানায় বিবাহিত পুরুষকে পত্নী ভিন্ন অন্য নারীকে ভালোবাসতে নেই— " তুমি আমাকে ভালবাস — আর কাকেও তোমার ভালবাসতে নাই—"[৭৫]

বিবাহিত পুরুষের পরনারীর প্রতি আসক্তি, বিধবা নারীর প্রবৃত্তির অসংযম সমাজ-সংসারে কী তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে, তার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের এই সামাজিক উপন্যাস দুটিতে রয়েছে। তবে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর হত্যার ঘটনাটি অনেকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র রোহিণী হত্যায় আর্টের প্রশ্ন ও নীতির প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর চরিত্রের প্রতি অবিচার করেছেন। তার নিশাকর-আসক্তি উপন্যাসের ন্যায়কে (logic) ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমাদেরও মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমদিকে রোহিণীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই দেখা যায় উইল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোহিণী হরলালের সঙ্গে তার ব্যবহার ও সংলাপে শালীনতা ও শোভনতার সীমাকে লঙ্ঘন করে নি। হরলালের দেওয়া ঘুষ প্রত্যাখান করায় তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। হরলালের কৃতজ্ঞতার ঋণ চিরতরে পরিশোধ করার জন্য সে কৃতঘ্নতার পথে হাঁটে নি।

প্রলোভন জয়ের শক্তির মধ্যেই তার নৈতিক মূল্যবোধের সদর্থক বীজ লুকিয়ে থাকতে দেখা গেছে। গোবিন্দলালকে রোহিণী ভালোবেসেছিল কিনা এ প্রসঙ্গে রোহিণীর বারুণীর জলে ডুবে মরার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যায়। সে গোবিন্দলালের পৌরুষের কাছে তার মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিল। তাই তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা তার হৃদয়-বেদনাকে বাড়িয়ে তোলে। গোবিন্দলাল বিবাহিত, রোহিণী বিধবা। তাই স্বামী হিসেবে গোবিন্দলালকে পাওয়ার কোনো সম্ভবনাই যে তার জীবনে নেই, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল — ''রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে — সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহ জন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।''[৭৬] এই জন্য সামাজিক সংস্কারকে মেনে নিয়ে সে আত্মহননের মাধ্যমে হৃদয়-যন্ত্রণা উপশমের পথ খোঁজে। সে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিল ভ্রমর আনুগত্য এবং ভ্রমরের নির্দেশেই — এমনটি ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়। গোবিন্দলাল তার মৃত্যু-পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালে সে প্রিয়তমের কাছে প্রশ্ন করেছিল—''মরণেও আপনি প্রতিবাদী?''— রোহিণীর মুখের এই সংলাপ বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের ভিত্তিমূল থেকে তুলে এনে বসিয়েছিলেন বলে আমাদের মনে হয়।

বাল্যবিবাহ কিভাবে যৌবনে বা প্রাক্-যৌবনের সন্ধিলগ্নেই বৈধব্যে নারী-জীবনের সমস্ত সুষমাকে ঝরিয়ে ফেলে — সমাজ জীবনের এই সমস্যাগর্ভ দিকটি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তবে সমাজের ঐ জটিল সমস্যার ইতিবাচক কোনো পথের সন্ধান তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠেনি তাঁর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক শুচিতা রক্ষার বিষয়টিও এক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল। তাই রোহিণীর ব্যর্থ নারী জীবনের যন্ত্রণাময় দিকটি তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে, কিন্তু প্রতিবাদী ভূমিকায় বলিষ্ঠতা আসে নি। অবশ্য যে বলিষ্ঠতা 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের বিনোদিনীর মধ্যে দেখা যায়, যুগধর্ম ও সমাজ-প্রতিবেশ অনুযায়ী সেই ধরনের বলিষ্ঠতা রোহিণী চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিতও নয়। তবে একথা আমরা বলতেই পারি, রোহিণী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ উপন্যাসটিতে ছিল। রোহিণী চরিত্রের পরিণতি প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন,''... রোহিণীর চরিত্রও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নি, তাহাকে অর্ধ-পথেই হত্যা করা হইয়াছে।''[৭৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য রোহিণী চরিত্রের বিকাশ যথাযথ হয়নি, একথা ঠিক। তবে কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে চরিত্রের আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে মনস্তাত্ত্ব-সচেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য করেছেন — "নগেন্দ্রের দুঃখের কারণটা ছিল সূর্যমুখীর দুঃখ এবং গৃহত্যাগ। শেষোক্ত ঘটনা দুটি যদি না ঘটত তাহলে নগেন্দ্রের দুঃখের কারণ কিছু থাকত না। কেননা বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত এবং বহুবিবাহ ধর্মসম্মত। সূর্যমুখীর দুঃখও এ অবস্থায় অভিমানের বেশি ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। গোবিন্দলাল সেক্ষেত্রে যথার্থ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পতিত। সে রোহিণীকে বিবাহ কোনো অবস্থাতে করতে পারে না। ভ্রমর সূর্যমুখীর মতো বৃথা অভিমানিনী নয়। বিবেকের দিক থেকে গোবিন্দলাল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রমরের প্রতি অনুগত — কামনার আকর্ষণে রোহিণীই তাকে টানে। যথার্থ আত্মা এবং দেহের বিরোধ। বিরংসাজাত পাপ-চেতনায় গোবিন্দলালের বহ্নিমান সত্তাকে এ উপন্যাসে যথার্থ শক্তির সঙ্গে রূপময় করে তোলা হয়েছে।"[৭৮]

উৎস সূত্র

১। উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, পৃ. ২৮-২৯।

২। 'বঙ্কিমচন্দ্রের নারী শিক্ষা ভাবনায় টোল', শ্যামলী চক্রবর্তী, 'পশ্চিমবঙ্গ', রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০২; সম্পা. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা-০১, পৃ. ৯৯।

৩। উপন্যাসে সমাজ দৃষ্টিঃ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ.১৪।

৪। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা-০৯, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৬৯।

৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩, অষ্টম পুণমুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১১৪-১৫।

৬। রজনী, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ.৪৪২।

৭। তদেব; পৃ. ৪৪২।

৮। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৫০৭।

৯। রজনী, বঙ্কিম রচণাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৪৪৩।

১০। তদেব; পৃ. ৪৫১।

১১। তদেব; পৃ. ৪৮০।

১২। তদেব; পৃ. ৪৭৮।

১৩। তদেব; পৃ. ৪৭৮।

১৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩, অষ্টম পুণমুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৭১।

১৫। কপালকুণ্ডলা, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ১২৩।

১৬। তদেব; পৃ. ১৩৪।

১৭। তদেব; পৃ. ১৩৫।

১৮। তদেব; পৃ. ১৩৫।

১৯। তদেব; পৃ. ১২৩।

২০। তদেব; পৃ. ১২৩।

২১। চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৩৪৭।

২২। তদেব; পৃ. ৩৪৭।

২৩। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

২৪। তদেব; পৃ. ৩৫৪।

২৫। তদেব; পৃ. ৩৫৯।

২৬। তদেব; পৃ. ৩৭২।

২৭। তদেব; পৃ. ৩৭২।

২৮। তদেব; পৃ. ৩৯৮।

২৯। তদেব; পৃ. ৩৯২।

৩০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩, অষ্টম পুণমুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৭৯।

৩১। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ২২৬।

৩২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮০, পৃ.১১০।

৩৩। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ২২৭।

৩৪। তদেব; পৃ. ২২৮।

৩৫। তদেব; পৃ. ২৫৪।

৩৬। তদেব; পৃ. ২২৮।

৩৭। তদেব; পৃ. ২৬০।

৩৮। তদেব; পৃ. ২৬১।

৩৯। তদেব; পৃ. ২৫৮।

৪০। তদেব; পৃ. ২৪৪।

৪১। তদেব; পৃ. ২৬৮।

৪২। তদেব; পৃ. ২৬৯।

৪৩। বঙ্কিম-মানস, অরবিন্দ পোদ্দার, পুস্তক বিপনি, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ,১৩৫৮, নবম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ৬১-৬২।

৪৪। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ২৮৮।

৪৫। তদেব; পৃ. ২৮৮।

৪৬। নষ্টনীড়, রবীন্দ্র রচনাবলী, (সপ্তম খন্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৪৭২।

৪৭। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ৫৯ /১ বি পটুয়াটোলা লেন,কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর,২০০৮, পৃ. ২০৩।

৪৮। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৫২৭।

৪৯। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ভবতোষ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, প্রথম দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণঃ এপ্রিল ২০০৮, বৈশাখ ১৪১৫, পৃ. ১১৭-১৮।

৫০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩, অষ্টম পুণমুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৩১।

৫১। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৫০৫-০৬।

৫২। তদেব; পৃ. ৫০৪।

৫৩। তদেব; পৃ. ৪৯৬।

৫৪। তদেব; পৃ. ৪৯৭।

৫৫। তদেব; পৃ. ৫০৭।

৫৬। তদেব; পৃ. ৫০৭।

৫৭। তদেব; পৃ. ৫১১।

৫৮। তদেব; পৃ. ৫১৪।

৫৯। তদেব; পৃ. ৫১৬।

৬০। তদেব; পৃ. ৫১৭।

৬১। তদেব; পৃ. ৫২০।

৬২। তদেব; পৃ. ৫২০।

৬৩। তদেব; পৃ. ৫২১।

৬৪। তদেব; পৃ. ৫২১।

৬৫। তদেব; পৃ. ৫২২।

৬৬। তদেব; পৃ. ৫২৩।

৬৭। তদেব; পৃ. ৫২৪।

৬৮। তদেব; পৃ. ৫২৪।

৬৯। তদেব; পৃ. ৫২৪।

৭০। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিমবরণ, মোহিতলাল মজুমদার, করুণাপ্রকাশণী, ১৮এ, টেমারলেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-২০০৫, পৃ.৩৫।

৭১। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৫২৬।

৭২। তদেব; পৃ. ৫২৯।

৭৩। তদেব; পৃ. ৫৫২-৫৩।

৭৪। উপন্যাসে সমাজদৃষ্টিঃ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রকাশ কালঃ নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৬৫।

৭৫। বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬০, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৫১০।

৭৬। তদেব; পৃ. ৫১৪।

৭৭। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিমবরণ, মোহিতলাল মজুমদার, করুণাপ্রকাশণী, ১৮এ, টেমারলেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-২০০৫, পৃ.৩৬।

৭৮। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮০, পৃ.১১৩।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ ধরেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বউঠাকুরাণীর হাট'। এটিই তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। উপন্যাসটি কার্তিক ১২৮৮ থেকে আশ্বিন ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ কাল ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার হাতে খড়ি অবশ্য 'করুণা' রচনার মধ্য দিয়ে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে ১২৮৫ সালের ভাদ্র পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এই উপন্যাসের সাতাশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি পরে আর সম্পূর্ণ করেন নি। পত্রিকার প্রকাশের সময় সমাপ্তি সূচক কোনো ঘোষণাও 'করুণা'-তে ছিল না। উপন্যাস রচনায় অপরিহার্য অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় অপরিণত এই রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। তাই এটি রবীন্দ্র উপন্যাসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে। ১৬ বছর বয়সে কাঁচা হাতের লেখা রচনাটি উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি। কাহিনী গ্রন্থনে, একাধিক চরিত্র চিত্রনের বঙ্কিম উপন্যাসের ছায়া সহজেই চোখে পড়ে। তবে কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ করুণার চরিত্র চিত্রণে গভীরতার অভাব থাকলেও জীবন-ভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা অনস্বীকার্য।

'করুণা' প্রকাশের চার বছর পর 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৮৮৭ সালে 'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস দুটিতেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী গল্প খুঁজতে ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি 'করুণা'-র থেকে অনেক বেশী পরিণত রচনা। উপন্যাসটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক-প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট, সমালোচক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা পত্র (অযাচিত ভাবে পাঠানো একটি চিঠি) যুবক রবীন্দ্রনাথকে উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত করেছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ''বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে

ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে — এ বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ...দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তার কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল।''[১]

'রাজর্ষি ' (১৮৮৭ খ্রিঃ) প্রকাশের পর এক যুগেরও বেশি সময় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি লিখেছেন অর্ধশতাধিক ছোটো গল্প। ছোটগল্পের চরিত্র চিত্রণে ও জীবন রহস্যের উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি উপন্যাসের প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নবযুগকে — নবযুগের মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য ঐ সময় কালের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ বৈশাখ (১৩০৮) সংখ্যা থেকে ১৩০৯ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৩০৯ বঙ্গাব্দ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হলে পালাবদল ঘটে বাংলা উপন্যাস জগতে। সূচনা হয় বাংলা উপন্যাসের আধুনিক যুগের। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''চোখের বালি' কে উপন্যাস সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার সূত্রপাত।''[২] উপন্যাসটি প্রকাশের পর পাঠক সমালোচক মহলে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে 'নবযুগের প্রবর্তক' হিসাবে খ্যাত হন।

উপন্যাস জগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা খ্যাতির মধ্যগগন অতিক্রম করে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১), রমেশচন্দ্র দত্ত(১৮৪৮-১৯০৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) প্রমুখ ঔপন্যাসিক তখন সাহিত্যাকাশে ভাস্বর ছিলেন। উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে তখন আবির্ভাব ঘটে শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮)। আধুনিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিম পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের কোনো উপন্যাসই শৈল্পিক বিচারে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা পায় নি।

সাহিত্য সমালোচকগণ বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নিরপেক্ষ শিল্পগত মূল্যমান যাই ঠিক করুন না কেন, পাঠকের হৃদয়াসনে তাঁদের প্রতিষ্ঠা 'সাহিত্য সম্রাট' এবং 'অপরাজেয়' বা 'জনপ্রিয়' কথাশিল্পী হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঐ জাতীয় কোনো খেতাব জোটে নি। বরং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ — রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাস্তবতার ভিত্তিভূমি থেকে উঠে আসে নি, তাঁর-কবি স্বভাব উপন্যাস রচনার অন্তরায় স্বরূপ, রবীন্দ্র-প্রতিভা উপন্যাস রচনার উপযোগী ছিল না। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য —" কিন্তু কবিতায় আর উপন্যাসে যে-ব্যবধান তাতে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। সুদূর সেই ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যখন কাব্য আর উপন্যাস অঙ্গাঙ্গী মিশে ছিলো মহাকাব্যে, আধুনিক কালের গদ্য উপন্যাস এমনভাবে পৃথকৃত যে তা কবিতার সহবাসী হলে উভয়তই অস্বস্তির আশঙ্কা থাকে। তার কারণ শুধু রূপের — form -এর ভিন্নতা নয়, কথাটা এই যে কবিতা লিখতে, এবং আধুনিক অর্থে উপন্যাস লিখতে, দুই আলাদা জাতের মনের প্রয়োজন। পার্থক্যটা খুব সহজ করে বলা যায় এই ভাবে যে কবির মন অন্তর্মুখী আর ঔপন্যাসিকের মন বহির্মুখী, ঔপন্যাসিক মিশুক মানুষ, আর কবি লাজুক প্রকৃতির ; ঔপন্যাসিক নিজেকে ছড়িয়ে দেন বিশ্বময়, আর কবি আনেন বিশ্বকে সংহত করে তাঁর অন্তরে। অবশ্য কোনো মানুষই শুধু অন্তর্মুখী বা শুধুই বহির্মুখী হতে পারে না, সকলের মধ্যেই দুয়েরই অংশ মিশ্রিত থাকে, সেই মিশ্রণের মাত্রাভেদেই কেউ পান কবিস্বভাব, কেউ বা কথকের, আর স্বল্প-সংখ্যক কেউ-কেউ উভয় বিভাগেই আনাগোনা করেন। এই শেষোক্তদেরও কোনো-এক দিকে পাল্লা ভারি থাকে, কেউ লেখেন কবির প্রকৃতি নিয়ে গল্প, কেউ বা বৈঠকী মেজাজ নিয়ে কবিতা। প্রথম শ্রেণীতে উদাহরণ পাই ইংরেজি সাহিত্যে ডি. এইচ. লরেন্স, দ্বিতীয় শ্রেণীতে রুডিয়ার্ড কিপলিং। এঁদের বিষয়ে টি. এস. এলিয়টের মন্তব্যটি চিন্তনীয় ; তাঁর মতে যেখানে একই ব্যক্তি কবি এবং কথাশিল্পী, সেখানে একটা দিক বেড়ে ওঠে অন্য দিকটাকে জখম করে।... কবিতায় আর কথাসাহিত্যে সমান মর্যাদা কারো ভাগ্যেই জুটেছে বলে শোনা যায় না ; ও-দুয়ের পরস্পরে সখ্যভাব নেই, আছে প্রতিযোগিতা, পরস্পরকে দমিত অথবা বিক্ষত করাই এদের স্বভাব।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ নবযুগের প্রবর্তক — আলোচক, সমালোচক সকলেই এবিষয়ে একমত। কিন্তু প্রখ্যাত সমালোচকগণ যখন রবীন্দ্র উপন্যাসে বাস্তবতা, কবি-স্বভাব প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান তখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন চিহ্ন উঁকি দেয়। রবীন্দ্র উপন্যাস যদি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যথার্থ অর্থে আধুনিকতার সূত্রপাত করে, তিনি যদি যুগস্রষ্টা হন তা হলে তার প্রতিভা উপন্যাস রচনার অনুকূল ছিল না — একথা বলার কারণ কী ? তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত নরনারী, দাম্পত্য-জীবনের সমস্যা-সংকটের দিক, জীবনাদর্শ — সবই কী তাঁর তত্ত্বের প্রতিফলন। এই বহুচর্চিত বিতর্ককে এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বরূপ জানা এবং আমাদের আলোচনার অভিমুখে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

অন্যের মধ্যে, বহুর মধ্যে বিবর্তিত আমিকে দেখার প্রয়াস মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্বমুখী। জীবন শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে জগৎ-জীবনকে সমগ্রভাবে, সত্যভাবে, নানাভাবে দেখে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে নানারূপে প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজতে চেয়েছিলেন — " আমার বীণায় অনেক বেশী তার — সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো কঠিন। আমার জীবনে সব চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবি প্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হল — কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না। ... কিন্তু আমার স্বধর্ম কী তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয় — রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি — সব হিসাবকে একই চরম অঙ্কে মেলাব কী করে।"[৪]

সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্বেই 'অস্তিত্বের নানা বিভাগে' কবির 'জবাবদিহি'র পরিচয় প্রমাণিত হয়েছে। 'ক্ষণিকা'-র কিছু কবিতা,' নৈবেদ্য 'কাব্য এবং 'চোখের বালি' উপন্যাস প্রায় একই সময়ে লেখা হয়। 'চোখের বালি' উপন্যাসটি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল থেকে নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও উপন্যাসটি লেখা শুরু হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে। খসড়ায় বইটির নাম

ছিল 'বিনোদিনী'। প্রিয়নাথ সেনকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা চারটি চিঠিতে 'বিনোদিনীর' প্রসঙ্গ আছে। 'চিঠিপত্র' সংকলনের ৮ম খন্ডে ঐ পত্রগুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯, ৮৫, ৮৭ ও ৯০। 'চোখের বালি'-র ''খসড়ায় ইহার নাম ছিল 'বিনোদিনী' ইংরেজী অনুবাদও 'Binodini' নামে পরিচিত, পূর্ববর্তী অনুবাদের নাম ছিল 'Eye-sore'।'' (১৪৪) একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মানস প্রকৃতির অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে ঐ রচনাগুলিতে। 'ক্ষণিকা' (১৯০০ খ্রি.) তাঁর অসামান্য রোমান্টিক চেতনার ফসল। 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে তিনি আধুনিক বাস্তবতার পথিকৃৎ। 'নৈবেদ্য' (১৯০১ খ্রি.) কাব্য গ্রন্থে কবির মিষ্টিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 'নৈবেদ্য' কাব্যে ঈশ্বর চিন্তার পাশাপাশি তাঁর মানবমুখিনতা এবং স্বদেশ ভাবনার পরিচয়ও ধরা পড়েছে।

মানুষের উন্নতি ও তার মনুষ্যত্ব বিকাশের লক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সাধনা করেছেন। মানবোত্তর কোনো কিছুতে নয়, মানুষ এবং সমাজ-সংসারের মধ্যে থেকেই তিনি জীবনের পরম মূল্য উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিল্প-সাহিত্য ও কর্মপ্রেরণার মূল চালিকা শক্তি হল মানব জীবনের নানা সমস্যা-সংকট ; মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা।

রবীন্দ্রনাথের কবিমন যখন আধ্যাত্মিক ভাবনায় বিভোর, সেই সময়ে তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে 'চোখের বালি ' উপন্যাসটি। 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'বাংলা শব্দ দ্বৈত', ও 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ '— প্রবন্ধ তিনটি ঐ সময় কালেই রচিত। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল, অতিথি, একরাত্রি, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, বিচারক, নিশীথে, মণিহারা, মানভঞ্জন, ক্ষুধিত পাষাণ, নষ্টনীড়, প্রভৃতি সেরা গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই আবার 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬) প্রকাশিত। ১৯০৩ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ 'চোখের বালি 'থেকে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রকাশ কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক জীবনের স্বর্ণযুগ। এই সময়কালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম কবিকৃতির ফসল 'খেয়া' (১৯১০), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), ' গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'গীতালি'

(১৯১৫), 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫), 'মহুয়া' (১৯২৯) প্রভৃতি বাংলা কাব্য সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। দেখা যায়, ভালো কবিতা এবং ভালো উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে রচনা করেছেন। তার কবি সত্তা ঔপন্যাসিক সত্তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কবিকে বিশ্ববিখ্যাতি এনে দিয়েছিল। তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বিশ্বকবির আসনে। আর এই কবি খ্যাতিই আড়াল করেছে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে এবং আরো অনেক রবীন্দ্রনাথকে। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ছোটোগল্পকার — বাংলা সাহিত্যের দশদিগন্তের নাবিক বললেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে সবটা বলা হয় না। সাহিত্যিক পরিচয় ছাড়াও তাঁর রয়েছে অন্য পরিচয়। সমাজগঠনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এক দিকে রচনা করে চলেছেন একের পর এক সাহিত্য, অন্যদিকে পালন করছেন পারিবারিক দায়িত্ব, নিজেকে যুক্ত রেখেছেন সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে। পল্লী সংগঠন, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতনকে কবির রোমান্টিক স্বপ্ন-বিলাস ভাবলে ভুল হবে, এসব তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের প্রমাণ; মানুষের প্রতি, মানব জীবনের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসার অভিজ্ঞান। তাঁর চেতনার ক্ষেত্রে এসে দেশে- কালে সীমাবদ্ধ জীবন ও বিশ্বজীবন, ব্যক্তিমানুষ ও বিশ্বমানব, বর্তমান ও চিরন্তন সমগ্রতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'বনফুল'। ১২৮২-৮৩ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় এই কাহিনী কাব্যটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কাব্য 'কবি কাহিনী'-র প্রকাশ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। এই সালেই আবার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস 'করুণা'-র আত্মপ্রকাশ ঘটে 'ভারতী' পত্রিকায়। অর্থাৎ একথা আমরা বলতেই পারি যে, সাহিত্য রচনার প্রথম পর্ব থেকেই কবি ও কাহিনীকার কবি এবং ঔপন্যাসিক সহযাত্রী। 'ভারতী'- তে প্রকাশিত প্রথম পর্বের অপরিণত রচনাগুলি সম্পর্কে অবশ্য কবির কুণ্ঠিত মনোভাবের পরিচয় জীবনস্মৃতির পাতায় মুদ্রিত আছে। তবে অতিশয্য ও কৃত্রিমতার লজ্জাকে ছাপিয়ে তাঁর পরিণত বয়সের উপলব্ধিতে আভাসিত হয়েছে তার ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার ইতিহাস। জীবন স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন — "... ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্য লীলার অনেক

লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে — উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত অতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা। ... সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনই ব্যর্থ হইবে না।''[৫] — প্রতিভার আগুন সত্যিই জ্বলে উঠেছিল, কোনো বিরূপ সমালোচনা-ই তাকে নির্বাপিত করতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী শিল্পীসত্তা তাঁকে শুধুমাত্র কাব্য রচনার সীমায় আবদ্ধ থাকতে দেয়নি — একথা সত্য। বহুমুখী প্রতিভার তাগিদ বা পত্র-পত্রিকার গল্পের দাবী মেটানো অথবা টাকার প্রয়োজন কিংবা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের খ্যাতির প্রতি আকর্ষণ — এগুলি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাহ্য প্রেরণা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা অন্তরের গভীর প্রেরণা ছাড়া কোনো সৃজনশীল সাহিত্য লেখা হতে পারে না। আমরা জানি অন্তরের গভীর প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথকে উপন্যাস রচনার জগতে টেনে এনেছিল। কবি কাহিনীর কবিকে নর-নারীর জীবনের জটিল সমস্যা ভীষণভাবে ভাবিত করেছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি দেখেছিলেন সমাজে নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব নেই। নারীকে দাম্পত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ করে রাখার অজস্র ফাঁস সমাজ শাস্ত্রে রয়েছে। শিক্ষার অভাবে নারীর চেতনার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে ছিল। চেতনার জাগরণ না ঘটায় নারীরা সামাজিক শৃঙ্খলাকেই সত্য বলে মনে করে। চেতনা-স্তরের অসাম্য স্বামী-স্ত্রীকে ঠেলে দেয় প্রভু ও দাসীর সম্পর্কের দিকে। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে যে চেতনার ব্যবধান এবং তার ফলে সৃষ্ট যে সমস্যা-সংকট তারই প্রকাশ 'করুণা'-তে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার প্রথম পদক্ষেপেই বেছে নিয়েছিলেন সামাজিক সমস্যার দিকটিকে। 'করুণা' প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) , চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭) প্রভৃতি উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসামান্য সৃজনী প্রতিভার সাহায্যে ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রোমান্স ও কল্পনার অতিশয্য সৃষ্টির মাধ্যমে রচনা করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি।

' করুণা' রচনার পর উপন্যাসের আঙ্গিক এবং রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে আরো অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ হয়ত চার বছর উপন্যাস রচনার জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তারপর ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' রচনা করেন। এই উপন্যাস দুটিতেও শৈল্পিক চেতনার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল ব্যক্তি চেতনার বিকাশ ও হৃদয় বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ। উক্ত দুটি উপন্যাসেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গার্হস্থ জীবন চিত্র ও ব্যক্তির হৃদয়-দ্বন্দ্বের দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জগৎ তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তাই তিনি জীবনের জটিল সমস্যার মননশীল আলোচনার জন্য দেশ-কালের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে বেছে নিয়েছিলেন। কবির কাব্য-কবিতায় হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। নিসর্গ প্রকৃতির অপরূপ রূপ ধরা পড়েছে। ছোটোগল্পে তিনি বিশ্ব প্রকৃতির অচ্ছেদ্য পটভূমিতে মানব-জীবনের ছোটো ছোট সুখ-দুঃখ, সমস্যা-সংকট ফুটিয়ে তুলেছেন ; আর উপন্যাসে সামাজিক পটভূমিতে মানব-হৃদয়ের রহস্য উন্মোচন করেছেন। মানব মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ঘাটনিক বা তথ্যগত বাস্তবতার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনোলোক উদ্‌ঘাটনের জন্য সাহায্য নিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেত যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে ব্যারিস্টার করার পারিবারিক উদ্যোগ সফল হয় নি। কবি আইন শাস্ত্রের ডিগ্রি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেখান থেকে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সফল হয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি — বিশ্বের শাশ্বত সাহিত্য (Classical literature) পড়ার আগ্রহে তিনি জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষার চর্চা শুরু করেছিলেন। পাশ্চাত্যের বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর গহন মনের গভীরে আলোক ফেলে তাদের আবেগ-অনুভূতির চিত্র স্পষ্টতর করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ধারণা প্রসার লাভের পূর্বে অর্থাৎ 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রি.) ও 'Psycho-Pathology of Everyday Life' (১৯০৪ খ্রি.) প্রকাশিত হবার পূর্বেও মানবমনের গোপন স্তর সম্পর্কে সাধারণ ধারণা যে সাহিত্যিকদের ছিল সে প্রসঙ্গ প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্রয়েডের সাক্ষাৎও ঘটেছিল। মনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে সচেতন ধারণা ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'অচৈতন্য' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন — ''আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের মধ্যে কোন্ যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কিছুই আমরা জানি না। শরীরের সম্বন্ধে যাহা ঘটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটে। আমাদের মনে যে কি আছে তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র, যাহা জানি না, তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানি না, তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না।''[৬] 'পঞ্চভূত ' গ্রন্থে সমীরের বক্তব্যেও চেতন ও নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞানের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সমীর বলেছে — ''মানুষের অন্তঃকরণে দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল। যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চলভাবে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেছে, ত্যাগ করিতেছে, গোপন তলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া উঠেতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তর পর্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারে না। উপর হইতে যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পের বেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত, তাহাই আমরা দেখিতে পাই।''[৭]

'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর থেকে 'চোখের বালি' রচনার কাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় রবীন্দ্রনাথ আর কোনো উপন্যাস রচনা করেন নি। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হবার পর দেখা যায়, বাংলা উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনামূলক

পদ্ধতির পরিবর্তে তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক নতুন পদ্ধতির সূত্রপাত করলেন সচেতন ভাবেই। দুটি উপন্যাস রচনার মধ্যবর্তী ঐ বিরতি কালকে আমরা উপন্যাসে বহির্বাস্তবতা (Formal realism) - এর পরিবর্তে অন্তর্বাস্তবতা (Inner realism) প্রকাশের অন্তর্প্রেরণার ফলেই রবীন্দ্র-মানসের সচেতন শিল্প প্রস্তুতির কাল বলেই মনে করি।

বিংশ শতাব্দীতে মনস্তত্ত্বের ধারণা প্রসারের ফলে আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, নর-নারীর বাহ্য ক্রিয়াকলাপেই তাদের সমগ্র পরিচয় ব্যক্ত হয় না। তাদের ঐ সব ক্রিয়াকলাপ বা আচার আচরণের পশ্চাতে যে সব প্রবৃত্তি, অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতি সক্রিয় থাকে চরিত্রের সম্পূর্ণায়নের জন্য তাদের পরিচয়ও প্রকাশিত হওয়া উচিত।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ঘটনা বিস্তারে বৃহত্তর পরিধিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা ক্ষেত্রের মধ্যেই উপন্যাস আর সীমাবদ্ধ থাকে না। পাত্র-পাত্রীর 'আঁতের কথা' প্রকাশের তাগিদে তাদের নির্জ্ঞান মনের গোপন ক্রিয়াকলাপ বর্ণনার পাশাপাশি তাদের বিশ্লেষণও প্রাধান্য পায়। এই বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রথম সচেতন প্রকাশ 'চোখের বালি'(১৯০৩) উপন্যাসে।

" কেউ চেনা নয়
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপন রহস্যে
আপনি একাকী।"[৮]

— ' আপন রহস্যে আপনি একাকী' যে মানুষ, যার গহন মনের গভীরে ঘটে চলা বিচিত্র জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সে নিজেই সচেতন নয় ; অথচ তার দ্বারাই তার প্রতিটি বাহ্য আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত — মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। রবীন্দ্র উপন্যাস সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ অবশ্যই তার ঐ বাস্তবতা নিয়ে ; তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত নর-নারীর বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্র উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর

বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সাধারণ পাঠকের অভিযোগের একটি বড় কারণ হল, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের না দেখে শুধুমাত্র তথ্যগত বাস্তবতা বা ঘটনাগত বাস্তবতার ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা আচার-আচরণের মূল্যায়ন করার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্র উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র অসাধারণ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যারা ধুলো কাঁদায় মানুষ, যারা মাটিতে হেঁটে বেড়ায়, হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খায় — তাদের উপস্থিতি রবীন্দ্র উপন্যাসে খুবই কম। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা শুধুমাত্র শরীরী সত্তা নয়; ভাবসত্তাও। তাই বিনোদিনী, গোরা, ললিতা, দামিনী, নিখিলেশ, বিমলা, কুমুদিনী, লাবণ্য এদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, ব্যক্তিত্ব সাধারণ আটপৌরে বাঙালির সঙ্গে মেলে না। পাঠক সমালোচকদের বাস্তবতার অভিযোগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সচেতন ছিলেন না, তা নয়। বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হল — " ... যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ত। ... এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদা সর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তি সঙ্গত। যে-কোন রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।"[৯] অথবা, "একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্তা এবং খুচরো হাসি কান্নার চেয়ে আমরা শেক্সপীয়রের মধ্যে বেশী সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি, আজকেরসোসাইটি নভেল কাল মিথ্যে হয়ে যাবে, শেক্সপীয়র কখনো মিথ্যা হবে না।"[১০] বাস্তবতা সম্পর্কে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঐ একই কথা ঘুরিয়ে বলেছেন, " ইংরাজীতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা।"[১১]

বাস্তবের অবিকল নকল সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে ঠাঁই পেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের পাতায় তার কোন স্থান নেই। সাহিত্যের বাস্তব তাই ঘটমান বাস্তব থেকে একটু অন্য ধরনের। রবীন্দ্রনাথের মতো আমরাও মনে করি, যা আমাদের চেতনাকে স্পষ্ট ভাবে স্পর্শ করতে পারে তার মধ্যে অবশ্যই বাস্তবতা থাকে। কোনো একটা বিশেষ কালের বিশেষ সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল মানুষ তাকে স্বীকার করুন

আর নাই বা করুন। আজ একবিংশ শতাব্দীতেও মনের তুলনায় শারীরিক চাহিদাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়, উপেক্ষিত হয় মানসিক চাহিদার দিকগুলি। শরীর ও মন নিয়েই যে স্বাস্থ্য — সাধারণ মানুষের অবচেতনে সে ভাবনা থাকলেও চেতনে তা সব সময় স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না। তাই বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ব্যক্তির মানসিক চাহিদা, তার স্বাতন্ত্র্যবোধ, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্কার ও শোষণ-বঞ্চনা থেকে উত্তরণের প্রয়াসকে সর্বতোভাবে বাস্তব ভাবা হতো না। দেখা যায়, সামাজিক সংস্কার ও নিয়ম-রীতির বিরুদ্ধে যাঁরা সরব হন, সত্য ও কল্যাণবোধকে যাঁরা সত্য বলে স্বীকার করেন , তাঁরা সমকালে জন্মগ্রহণ করেও কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রমুখের সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী শিক্ষা, নারীর মনুষ্যত্ব ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা ভাবনা সমকালে সেই ভাবে সমাদর পায়নি। কিন্তু তা বলে তাদের ভাবনা-চিন্তা বা সামাজিক নিয়ম রীতির পরিবর্তনের প্রয়াস অবাস্তব ছিল — এমনটি আমাদের মনে হয় না। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি — 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্রটিকে যতটা খাপছাড়া বলে মনে হয় ততটা অবাস্তব সে নয়। তার ব্যক্তিত্ব তথা স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধ সমকালে অভিনন্দিত না হলেও কাল পরিবর্তনের ইতিহাসকে সত্য হিসেবে মেনে নিলে বিনোদিনী চরিত্র সমান সত্য হিসেবে গ্রহণীয়। তাই আজকের শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে রোমান্টিক কবির উপন্যাসকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যা ধ্রুব সত্য এবং অভ্রান্ত বাস্তব — তা হল, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে আগাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই সমকালের তুলনায় তিনি প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তায় অনেক এগিয়ে ছিলেন। দৃষ্টির বাইরের অনাগত ভবিষ্যৎকে তিনি দূরদৃষ্টি দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেতেন। তিনি 'বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়ো বাজারের ছাপ মারা'-দের থেকে ছিলেন সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। তাই তাঁর লেখনী থেকে বিশ শতকের সূচনালগ্নেই বেরিয়েছিল 'চোখের বালি', তারপর একে একে 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 'চোখের বালি' থেকেই জীবনবোধ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বঙ্কিম উপন্যাসের সঙ্গে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা

পড়ে। 'চোখের বালি' উপন্যাস রচনায় 'বিষবৃক্ষ '(১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯৭৮) উপন্যাসের প্রভাবের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়, রবীন্দ্র উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসলে জীবনের মতো উপন্যাসও অস্থিরতা তার দেহে ধারণ করে চলে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশের পর থেকে 'চোখের বালি' রচনার মধ্যবর্তী সময়কালে জীবন-ভাবনার বদল ঘটে দ্রুত গতিতে। ঐ বদলে যাওয়া জীবনকে, জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে ধারণ করার জন্য উপন্যাস শিল্পেরও ঘটে নানান পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত পর্যায়ে বহির্বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্তর্বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ঔপন্যাসিকগণ বাহ্য ঘটনার পিছনে মানবমনের যে সব গোপন প্রবৃত্তি ও আবেগ ক্রিয়াশীল থাকে তাদের স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সমাজ চিত্র রূপায়ণের জন্য যাদের পার্শ্বচরিত্র হিসেবে নিয়ে এসেছেন, তারা সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষ। তাদেরকে কেন্দ্র করেই জীবনের ছোটো খাটো সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর জীবন-ভাবনা বা উপলব্ধ সত্যকে রূপায়িত করার জন্য যে চরিত্রগুলিকে বেছে নিয়েছেন তারা কেউই সাধারণ স্তরের মানুষ বা বারোয়ারী সভার সভ্য নয়। এই চরিত্রগুলি রবীন্দ্র স্বভাবের দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিতও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য লেখা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। সব রচনাই গূঢ়ার্থে আত্মজৈবনিক। এই প্রসঙ্গটি তিনি সাহিত্য বোধের নানা লেখায় বিশেষ করে বৈশাখ ১২৯৯ সালে লোকেন পালিতকে লেখা একটি পত্রে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— ''লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানব প্রকৃতি আছে, এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানব প্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয় ; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই-সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বন্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত-সৃষ্টি হতে পারে না। কালিদাসের দুষ্যন্ত-শকুন্তলা এবং মহাভারতকারের দুষ্যন্ত-শকুন্তলা এক নয়, তারপ্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয় ; সেইজন্য তাঁরা আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা

গঠিত করেছেন তাদের আকার প্রকার ভিন্ন ধরনের হয়েছে। তাই বলে বলা যায় না যে, কালিদাসের দুষ্যন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি ; কিন্তু তবু এ কথা বলতেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে, নইলে সে অন্যরূপ হত। তেমনি শেক্‌স্‌পীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারি নে। সেরকম প্রমাণ অবলম্বন করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেকেই পিতৃ-অংশ হতে বিচ্যুত হতে হয়।... অন্তরে বাহিরে এইরকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তি-বলে কেবল রস্‌ফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোক-সংসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নারীর মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল ; নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হত। অতএব এক হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ, কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানবিক জীবনটা কোন্‌খানে ? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে গিয়ে, মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেই খানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খন্ড খন্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খন্ড অংশগুলি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে — পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।"[১২]

রবীন্দ্র উপন্যাসের বিনোদিনী, নিশিলেশ, আনন্দময়ী, বিপ্রদাস, কুমুদিনীর মতো প্রধান চরিত্রগুলি পিতৃ-অংশ থেকে বিচ্যুত হয় নি। ঐ চরিত্রগুলির চিন্তা-চৈতন্য, সংস্কার-বিশ্বাসে পিতার অর্থাৎ উপন্যাস স্রষ্টার চিন্তন-মননের ছায়া পড়েছে। এখন স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন আসে — ঐ চরিত্রগুলি উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট পটভূমিতে

আমাদের চেতনাকে স্পষ্টভাবে স্পর্শ করে কি না ? অথবা তাদের অস্তিত্বকে অব্যবহিত ভাবে আমরা স্বীকার করছি কিনা ?

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতাবোধ দেখা দিয়েছিল। ব্যক্তি মানুষ সমষ্টির শোষণ-পীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। এর কারণ হল, ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ফ্রান্সের গণবিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯১)। ফ্রান্সের বাস্তিল কারাগারের পতনের ফলে শত সহস্র মানুষ নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত হয়। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি লাভ উনবিংশ শতাব্দীতেও অধরা থাকে। সর্বদাই সাধারণ মানুষের আত্মচিন্তা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ সমাজ ও সমাজপতিদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিধির দ্বারা অবদমিত হত। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মণীষীগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে আত্ম মর্যাদার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য সমাজ- সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস ঐ সময় সেই ভাবে ফলপ্রসূ হয় নি। নারী-পুরুষ বিশেষ করে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বাধীন চিন্তাকে উনিশ শতকের শেষার্ধে ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সর্বতোভাবে স্বীকৃতি জানায় নি।

আত্ম মর্যাদাবোধ যখন অবহেলিত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিনষ্টি সমাজের নিয়ম নীতির চাপে যখন ঘটে চলেছে সেই প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচিত। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা অবশ্যই বলা দরকার — বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার সময় সমাজ হিতের বাসনাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। তাঁর রক্ষণশীল দৃষ্টির জন্য ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সমস্যা ও তার হৃদয় রহস্য উপন্যাসে যথাযথ ভাবে চিত্রিত হয় নি। " যাহারা এ জীবনে সকল সুখে সুখী — মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী — তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ —আমার কপালে শূন্য ?"[১৩] বিধবা যবুতী রোহিনীর এই জীবন-প্রশ্নে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন ছিল না, তাঁর সহানুভূতি ও নিরঙ্কুশ নয় ; তাই তাকে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে

বলা যায়, নারী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার চেয়ে তিনি গার্হস্থ্য-জীবনের নৈতিক শুচিতা রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তি সত্তার বিকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বিশ শতকের মানুষের নবলব্ধ মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের সমস্যাকে উদার ও ব্যাপ্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন। এর ফলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছে ; ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই রোহিনী ও বিনোদিনী দুজনেই বিধবা হওয়া সত্ত্বেও জীবনবোধে, ব্যক্তিত্বের গড়নে তাদের ব্যবধান আশমান-জমিন।

এই ব্যবধান বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের চিত্রিত চরিত্রগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য। এর মূল কারণ যে যুগের প্রবৃত্তি ও ঔপন্যাসিকদের জীবন ধর্মগত পার্থক্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে সমাজধর্ম ও মানবধর্মের বিরোধ শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় ও বৌদ্ধিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না; উদ্‌গত হয় তাদের জীবনেও। রবীন্দ্রনাথ ঐ উদ্‌গত জীবনকে অর্থাৎ সমগ্র জীবনের (অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের) ছবি চিত্রিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। সেই চিত্রণে সমাজের কোন্ দিকটি ধোঁয়াশাময় থেকেছে তাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তিনি তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মানবজীবনের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হলেও তা কম সত্য নয়। এই সম্পর্কে 'আত্মপরিচয়ে' তিনি বলেছেন —

''যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে একটা ঘর-গড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। ... তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং

ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকে ভয় করি নে।''[১৪]

রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি চিত্রনের ক্ষেত্রে নবজাগ্রত মূল্যবোধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারী চরিত্র ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে। নারী চরিত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চোখের বালি উপন্যাসে বিনোদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে তারই পথ ধরে ললিতা, দামিনী, বিমলা, কুমুদিনী, লাবণ্য — এদের আবির্ভাব ঘটেছে। 'চোখের বালি' উপন্যাসের আলোচনায় বিনোদিনী প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিশ্লেষণ থাকবে। এখন রবীন্দ্র উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক পরিচয় প্রদান করে দাম্পত্য সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিকে চিহ্নিত করে নিয়েছি এবং মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দাম্পত্যে সমস্যা সৃষ্টির কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছি।

রবীন্দ্র উপন্যাসের কালানুক্রমিক পরিচয়ঃ

দীর্ঘ সাতান্ন বৎসরের ঔপন্যাসিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন মোট চোদ্দটি গ্রন্থ। তার মধ্যে বারোটি উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। উপন্যাসের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে দুটি রচনা — 'করুণা' ও 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। 'করুণা' কাঁচা বয়সের অপরিণত রচনা। এই রচনাটিকে উপন্যাসের তালিকায় রাখার ক্ষেত্রে কবির জোরাল আপত্তির বিষয়টি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। মূলত কবির আপত্তির কারণেই 'করুণা'-র ঠাঁই হয়নি রবীন্দ্র উপন্যাসের তালিকায়। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' স্বরূপ প্রকৃতিতে মূলত ছিল কৌতুক নাট্য। রচনার পর এর নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' নামে সমাদৃত হয়। বাদ পড়ে উপন্যাসের কুলীন সমাজ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের যে বারোটি রচনা উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে তাদের তালিকাঃ-

১। বউ-ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩ খ্রিঃ), ২। রাজর্ষি (১৮৮৭ খ্রিঃ),
৩। চোখের বালি (১৯০৩ খ্রিঃ), ৪। নৌকাডুবি (১৯০৬ খ্রি.),
৫। গোরা (১৯১০ খ্রি.), ৬। চতুরঙ্গ (১৯১৬ খ্রি.),

৭। ঘরে-বাইরে (১৯১৬ খ্রি.), ৮। যোগাযোগ (১৯২৯ খ্রি.),
৯। শেষের কবিতা (১৯২৯ খ্রি.) ১০। দুইবোন (১৯৩৩ খ্রি.),
১১। মালঞ্চ (১৯৩৪ খ্রি.), ১২। চার অধ্যায় (১৯৩৪ খ্রি.)।

'বউ-ঠাকুরাণীর' হাট রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। প্রকাশকাল—কার্তিক ১২৮৮ থেকে আশ্বিন১২৮৯ সাল। 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বনে পরবর্তীকালে রচিত হয় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক। রচনাকাল—১৩১৬ বঙ্গাব্দ। উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস 'করুণা-'য় রবীন্দ্রনাথের সমাজমনস্ক মনের প্রথম ছোঁয়া লেগেছিল। নারী-জীবনের বিচিত্র-সামাজিক সমস্যাকে তিনি তাঁর স্বল্প অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়েই উপন্যাসের আধারে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। 'করুণা' রচনার চার বছর পর অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সম্বল যখন কিছু বেড়েছে তখন তিনি সমকালীন বাস্তবতার আশ্রয় ছেড়ে উপন্যাস রচনার জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইতিহাসের। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, উপন্যাস রচনার দ্বিতীয় পদক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরালেন কেন ? প্রথম উপন্যাস রচনার ব্যর্থতার মধ্যেই কি এর কারণ নিহিত আছে ? না তৎকালের প্রতিপত্তিশালী প্রথার অনুবর্তনের মাধ্যমে খ্যাতিলাভের বাসনা কবি মনে জাগ্রত ছিল ? রবীন্দ্রনাথ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' রচনার ক্ষেত্রে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১ম খন্ড ১৮৬৯, ২য় খন্ড ১৮৮৪) উপন্যাসটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরীদেবীকে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' বইটি পড়ে শোনাতেন, একথা আমরা 'ছেলেবেলা' থেকে জানতে পারি। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবও সুস্পষ্ট। তবে সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে প্রথম উপন্যাস রচনা করে ব্যর্থ হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন—একথা আমাদের মনে হয় না। উপন্যাসটিতে আমরা দেখি, রাজ-রাজড়ার কাহিনীকে ছাপিয়ে গার্হস্থ্য জীবনচিত্রই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, রামচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ইতিহাস চিত্রিত করার ক্ষেত্রে যতটা না আগ্রহ দেখিয়েছেন, তার চেয়ে অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন ঐ সব চরিত্রকে কেন্দ্র করে বাংলার

সামাজিক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে। সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদে রচিত উপন্যাসটিতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকলেও রাজনীতি থেকে উদ্ভূত কোনো সমস্যার বর্ণনা নেই। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের পারিবারিক কাহিনিকেই রবীন্দ্রনাথ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন উপন্যাসটিতে। পুরুষতন্ত্রের নিষ্ঠুর আধিপত্যবাদ ও তার ফলে পুরস্ত্রীদের অসহায়তা, দাদামশায় ও নাতনীর স্নেহপ্রীতি পূর্ণ স্নিগ্ধমধুর সম্পর্ক, ভাই-বোনের নির্মল ভালবাসা, একের দুঃখে অন্যের সহমর্মিতাবোধ ও স্বেচ্ছাবৃত দুঃখবরণ, মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবার ভাবনায় মায়ের উদ্বেগ-ব্যাকুলতা-এসবই আমাদের সামন্ততান্ত্রিক বাংলার একটি পরিবারের অন্তঃপুরের চিত্র।

সুরমা, বিভা, উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়ের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষের প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক প্রতাপাদিত্যের হৃদয়হীন ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে রাজকীয় কাহিনীর মধ্যে পুরুষের যে দুঃশাসন, অত্যাচার ও শক্তিমদমত্ততা প্রকাশিত তাতে বাংলার সামাজিক ইতিহাসই সুপরিস্ফুট। উপন্যাসের ঘটনা সংস্থানের কেন্দ্রে থেকেও রাজা প্রতাপাদিত্য প্রধানতম চরিত্র হয়ে ওঠে নি। কারণ, প্রেম, করুণা ও উদারতা — ঔপন্যাসিকের এই জীবনাদর্শ বসন্ত রায় ও উদায়দিত্যের মধ্যেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র বিপরীত আদর্শের প্রাণহীন প্রতিমূর্তি। তাদের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে বিভার জীবন ট্র্যাজেডির কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সম্ভাবনাময় সুখী দাম্পত্য জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বিভাকে বেঁচে থাকতে হয়। উপন্যাসে সুরমা-উদয়াদিত্যের সুখী-দাম্পত্যের সামান্য বর্ণনা আছে। তাদের দাম্পত্যেও সমস্যার বীজ বপনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বাসে সমস্যা-বীজের অঙ্কুরোদগম হয়নি। তবে তাদের দাম্পত্যের সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি বিবেকহীন প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপের ফলেই দাম্পত্যের মহত্তম সুখ পেয়েও সুরমাকে ঢলে পড়তে হয় মৃত্যুর কোলে। উপন্যাসে ট্র্যাজেডির রূপটা পারিবারিক হলেও তার তাৎপর্যটা অবশ্যই সামাজিক। কারণ, নারীর নিদারুণ অবমাননা ও দুর্ভাগ্যের চিত্রই হল সামন্ত বাংলার করুণ সামাজিক ইতিহাস। নারী-জীবনের এই শোষণ বঞ্চনার চিত্রই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত রচনা 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'রাজর্ষি' উপন্যাসটি 'বউ ঠাকুরানীর হাট' প্রকাশের চার বছর পর প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের মেজ বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর অনুরোধে ঠাকুর বাড়ির বালক-বালিকাদের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল 'বালক' পত্রিকাতে। প্রথম ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে পত্রিকাটিতে ১২৯২ সালের আষাঢ় থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে বাকী পরিচ্ছেদগুলি (উপসংহার সহ ১৯টি পরিচ্ছেদ) সম্পূর্ণ হলে ১২৯৩ সালে (১৮৮৭ খ্রি.) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশের নাট্যরূপ হল 'বিসর্জন '(১৮৯১ খ্রি.)। স্বপ্ন-লব্ধ ঘটনা থেকে যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন তা উপন্যাসের সূচনা অংশ থেকেই আমরা জানতে পারি। স্বপ্নলব্ধ গল্পকণিকার সঙ্গে তিনি আরো অনেক ঘটনা এবং ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস মিশ্রিত করে উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেছেন —''এই স্বপ্ন টির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ-মানিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে 'বালকে' বাহির করিতে লাগিলাম।''[১৫] উপন্যাসটির মূল বিষয় — প্রেমের সঙ্গে প্রতাপের দ্বন্দ্ব। গোবিন্দ মাণিক্যকে কেন্দ্র করেই মূল বিষয়ের বিস্তার ঘটেছে— 'প্রেমের অহিংসা পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ '। গোবিন্দ মাণিক্য হিংসার বিরুদ্ধে অটলভাবে রুখে দাঁড়ান, ত্রিপুরা রাজ্যে পশুবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ছাগশিশুর করুণ ক্রন্দনে দেবী মন্দিরে রক্তপাতের অর্থহীনতা ও অমানুষিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে বিরোধ বাধে প্রথাবদ্ধ আচারসর্বস্ব ধর্মে বিশ্বাসী পুরোহিত রঘুপতির। রঘুপতি তাঁর একান্ত স্নেহভাজন জয়সিংহকে রাজ-রক্ত এনে দিতে বলেন। জয়সিংহ রঘুপতির ধর্মান্ধতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় যত পেয়েছে ততই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে তার সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। জয়সিংহকে হারাবার পর রঘুপতির হৃদয় পরিবর্তনে তাঁর মানবিক সত্তার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ ঘটনা বিন্যাসের চেয়ে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র চিত্রণের প্রতিই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশের জন্য মনোমধ্যস্থ চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতির আবেগময় চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই গোবিন্দমানিক্যের রাজচরিত্রের মহিমার চেয়ে তার অন্তর্জীবনের চিত্রই বেশী প্রকটিত হয়েছে। 'বউ ঠাকুরানীর হাটে'-র ''চরিত্রগুলির

মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি।''[১৬] কিন্তু 'রাজর্ষি' উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেকটাই পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবাদর্শ তথা বক্তব্য বিষয় দুটি উপন্যাসেই ইতিহাসকে অবলম্বন করে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু উপন্যাস দুটির বক্তব্যে পার্থক্য বিস্তর। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষির' বক্তব্য বিষয় থেকে ১৮৮৩ -র রবীন্দ্র-মানসের সঙ্গে ১৮৮৭-র রবীন্দ্র-মানসের সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রথম উপন্যাসটির পরিণামে প্রধান চরিত্র উদয়াদিত্য জন্মভূমি ও সংসার ছেড়ে চিরবিদায় গ্রহণ করে শ্যামল শান্ত প্রকৃতির কোলে মনের শান্তি, প্রাণের আরাম খুঁজে পেতে চায় — '' শোক বিপদ অত্যাচারের বঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল — জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। ...পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের আশ্রয়স্থল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। ... প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, '' জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সকল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।''[১৭] উদয়াদিত্যের চিরজীবন সমাজ-সংসার ছেড়ে থাকার সংকল্পের মধ্যে তার জীবনসংগ্রামে পরাজয়ের বেদনা যেমন প্রকাশিত, তেমনি তার রোমান্টিক প্রকৃতি মুখীনতার পরিচয় ও উদ্ভাসিত। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস রাজর্ষির কেন্দ্রিয় চরিত্র গোবিন্দমানিক্যের জীবন উপলব্ধির মধ্যে সর্বব্যাপী মানবমুখীনতাই প্রকাশিত — ''গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন, নির্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে — যে তাহা গ্রহণ করিতেছে তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোন অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, ''আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব।'' বলিয়া তাঁহার পর্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন। ... গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন। মানবের হাস্যালাপ, ওঠাবসা, চলাফেরার মধ্যে তিনি এক

অপূর্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন ! যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন — যে তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্বত্র দুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেননা আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো বাসনা নাই। সচরাচর যে-সকল দৃশ্য কাহারও চোখে পড়ে না, তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন — দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন — তাহারা ধূলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদূরান্তব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখিতে পাইতেন। ... পৃথিবীর দুঃখশোকদারিদ্র্য বিবাদবিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জমিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত।''[১৮]

গোবিন্দমাণিক্যের এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতেই পারি, রবীন্দ্র উপন্যাস ধারায় মানবমুখীনতা ও সচেতনভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগের পটভূমিকা রূপে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আঁতের কথা বের করে দেখানোর প্রথম সার্থক প্রয়াস দেখা যায় 'চোখের বালি 'উপন্যাসে। উপন্যাসটি ১৩০৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩০৯ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিক ভাবে এবং ১৩০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'চোখের বালি' প্রকাশের পর পালা বদল ঘটে উপন্যাস সাহিত্যে ; উপন্যাস ভাবনা এক নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। উপন্যাসটিতে মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্যকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির অন্তঃশায়ী সুপ্তচেতনাকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে উপন্যাস পাঠকের দৃষ্টির সামনে বেআব্রুভাবে তুলে ধরেন। 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', উপন্যাসেও দাম্পত্য-দ্বন্দ্বের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু ঐ উপন্যাস গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব বা ব্যক্তির গহন মনের গোপন কুঠুরির সংবাদ পরিবেশনের পরিবর্তে প্রাধান্য দিয়েছেন ঘটনার। 'চোখের বালি'তে ঘটনা

প্রাধান্যর হ্রাস পায়, অধিক গুরুত্ব লাভ করে চরিত্রগুলি। চরিত্রের আঁতের কথা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই মহেন্দ্র আশার সুখী দাম্পত্যে সমস্যা সৃষ্টির কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়ে যায়। নবজাগরণের ফলে ব্যক্তির মানসিকতার পরিবর্তন, ব্যক্তি স্বতন্ত্রের অধিকার, নারী শিক্ষা, নারীর প্রেমের স্বাধীনতা, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ, নারী ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি তথা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গও চরিত্র বিশ্লেষণের ধারায় উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। 'চোখের বালি' উপন্যাস থেকেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নব্যবাস্তবতার (New realism) সূচনা হয়েছে।

'নৌকাডুবি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালে, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বৈশাখ ১৩১০ থেকে আষাঢ় ১৩১২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে প্রকাশের সময় উপন্যাসটি ছেষট্টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে (১৯০৬ খ্রি.) বাষট্টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। উপন্যাসটিতে কমলার চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সাইকলজির প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন — ''স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তারমূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালাবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।''[১৯] প্রশ্ন এক না হলেও ঠিক একই রকমের কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাস রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন কমলা ও রমেশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাই তিনি ঐ চরিত্র দু'টির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিশ্লেষণেই প্রয়াসী হয়েছেন। তবে 'চোখের বালি' উপন্যাসের মতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-প্রবণতা 'নৌকাডুবি'-তে দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য — ''উপন্যাসটি আগাগোড়া একটি মৃদু, স্বচ্ছন্দে গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে — ইহার লঘু, চপল প্রবাহ কোথাও গভীর আবর্তের দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। রমেশ, কমলা, অক্ষয়, যোগেন, অন্নদাবাবু, চক্রবর্তী-খুড়ো খুব সরল (বিশ্লেষণের দিক হইতে) ও স্বচ্ছ প্রকৃতির মানুষ ইহাদের মধ্যে কোনো গভীর আলোড়ন বা বিক্ষোভের অবকাশ নাই। কোন বিশেষ দৃশ্যও গভীর ঘাত-প্রতিঘাতের বা রহস্য-গূঢ় উপলব্ধির পরিচয় দেয় না।''[২০] মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত খুবই

তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, " একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনাগ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ।"[২১] — এই বক্তব্য তথা 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের পরবর্তী রচনা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর কাছে পাঠকের যে প্রত্যাশা ছিল তা পূর্ণ হয় নি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "ঐ ঘটনাজটিল অসংগতি বহুল উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের লক্ষণযুক্ত রচনাবলীর মধ্যে পড়ে না, প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।"[২২] এবং " আরো আশ্চর্য লাগে — প্রায় বিশ্বাস হয় না — যখন ভাবি যে 'নৌকাডুবি' লেখা হয়েছিল 'চোখের বালি'র বছর চারেক পরে, — সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে পশ্চাদ্‌পসরণের দৃষ্টান্ত এই একটি ছাড়া দুটি বোধ হয় নেই।"[২৩]

'নৌকাডুবি'- তে আখ্যান ভাগ গল্পরসে ভরে উঠেছে, অনেক চরিত্র আছে যাদের মনোবিশ্লেষণ করে দেখানোর সুযোগ লেখক করে উঠতে পারেন নি। বিশেষ করে হেমনলিনীর প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ ও বিচ্ছেদ পরবর্তীকালে তার গোপন মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে যে সুযোগ ছিল, লেখক তার সদ্‌ব্যবহার করতে পারেন নি। অক্ষয়বাবু, অন্নদাবাবু, যোগেন — এরা সকলেই ঘটনার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প রচনার প্রেরণায় চমকপ্রদ ও আকস্মিকতা নির্ভর গল্প ফাঁদলেও যে-টুকু মনস্তাত্ত্বিকতা লক্ষ্য করা যায় তা শুধুমাত্র কমলা ও রমেশ চরিত্রের মধ্যে। তাবলে 'নৌকাডুবি'-কে প্রক্ষিপ্ত বললে অনেক বেশি বলা হয় বলে আমরা মনে করি। 'কপালকুন্ডলা' রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ' রচনার পর লেখেন 'ইন্দিরা'। আর 'নৌকাডুবিতে' রবীন্দ্রনাথের পশ্চাদ্‌পসরণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। কমলা চরিত্রে লেখক রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, কমলা যে সমাজ পরিবেশে বেড়ে উঠেছে তাতে তার মনে ঐ ধরণের স্বামী-সংস্কার থাকাটাই স্বাভাবিক। বিবাহের পূর্বে কমলা মামার আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে। সেখানে তার ভাগ্যে স্নেহ-ভালবাসার বদলে জুটেছে উপেক্ষা ও লাঞ্ছনা। তার মধ্যে ছিল বয়োসচিত ব্যক্তিত্বের অভাব। এক্ষেত্রে ভারতীয় বালিকাদের মতো সে যে স্বামী নামক একটি ভাব পদার্থের কাছে নিজেকে সমর্পণের জন্য মনকে তৈরী করবে — সময়কালের প্রেক্ষিতে দেখলে তা সত্য বলেই মনে হবে। বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী-সংস্কার সেকালের মেয়েদের মনে গভীর রেখাপাত করতো। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও দেখা যায়,

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কুমুদিনী মন থেকে সনাতন স্বামী-সংস্কারের ধারণাকে মুছে ফেলতে পারে নি। ঔপন্যাসিককে বাস্তবতার কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। বর্তমানে স্ত্রী-শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেখা যায় অধিকাংশ হিন্দু মেয়ে ঐ সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে নি। কমলা যে সমাজ ও যে সময়ের মেয়ে তাতে রমেশের সঙ্গে তার সত্য পরিচয় জানার পর রমেশের বাড়ীতে তার থেকে যাওয়াটাই আমাদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হত।

নলিনাক্ষের দিক থেকে ভেবে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ সমকালের তুলনায় অনেকবেশী প্রগতিশীল ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। একজন অনাত্মীয় পুরুষকে স্বামী জেনে, তার সঙ্গে একত্রে কিছুদিন কাটিয়ে কমলা লনিনাক্ষের কাছে গেলে স্বামী নলিনাক্ষ সাদরে কমলাকে গ্রহণ করেছে। কমলার এই পরিণাম রবীন্দ্রনাথের আধুনিক জীবনবোধেরই পরিচায়ক। রামের দেশের লোক হয়েও স্ত্রীর অগ্নিপরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা এমনকি সামান্য তদন্ত পর্যন্ত নলিনাক্ষ করে নি। একে আমরা রবীন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা না প্রগতিশীলতা বলব ?

বালিকাবধূ কমলা নৌকাডুবির পর রমেশকে তার স্বামী হিসেবে জেনেছে। ভারতীয় নারীর স্বামী-সংস্কার বশত তার কাছে হৃদয়-মন সমর্পণ করতে চেয়েছে। কিন্তু রমেশ পরস্ত্রী বলে বুঝতে পেরে কমলাকে সসঙ্কোচে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছে। ধর্মসাক্ষী করে কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি বলে সে কিছুতেই মন থেকে কমলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারে না। কারণ, তাদের ঐ বিয়েতে সমাজের কোনো স্বীকৃতি নেই। শুরু হয় রমেশের হৃদয়-দ্বন্দ্ব। হেমনলিনীর প্রতি আকর্ষণ তার হৃদয়দ্বন্দ্বকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তাই উপন্যাসে দেখা যায় রমেশ ও কমলার মধ্যে কোনো প্রেমের সম্পর্ক বা দাম্পত্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কমলার একমুখী ভালোবাসা শুধু অন্তরের শূন্যতাকেই বাড়িয়ে তুলেছে।

গাজীপুরে চক্রবর্তীর মেয়ে শৈলজার সাহচর্যে ও স্বামী-প্রেম কমলার নারী ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করে। সেই সময় রমেশের হৃদয়ও কমলার প্রতি অনুকূল হয়ে ওঠে। কিন্তু হেমনলিনীকে লেখা রমেশের চিঠি কমলার হাতে এসে পড়ায় তাদের সম্পর্ক

প্রত্যাশিত কোনো পরিণামে পৌঁছয় না। নলিনাক্ষকে স্বামী হিসেবে জানার পর কমলার হৃদয়ে যে অন্তর্বিপ্লব ঘটেছে তার মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা উপন্যাসটিতে রয়েছে।

ভারতীয় নারীর সনাতন স্বামী-সংস্কার কমলার মনে বদ্ধমূল থাকায় এবং রমেশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় রমেশের প্রেম তার মনে তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। কমলার মনের এই সংস্কার মনোবিজ্ঞানের আসংজ্ঞান মনের সমষ্টিগত সংস্কার (Collective unconscious)- এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। বিংশ শতকের প্রথম দশকের একজন বালিকা বধূর স্বামী-সংস্কারের তীব্রতার নিরিখে বিচার করলে রমেশের গৃহ ছেড়ে কমলার বেরিয়ে পড়াটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কমলার নির্জ্ঞান মনে নিহিত দৃঢ়মূল সংস্কারের যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তা তাঁর মনস্তত্ত্ব সচেতনতারই পরিচয় দেয়।

'গোরা' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের মহত্তম সৃষ্টি। উপন্যাসটি ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল —১৩১৬ সাল (১৯১০ খ্রি.)। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কালপর্বে বিভিন্ন ধরণের সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে এক ভাবসংঘাতের সৃষ্টি করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঐ ভাবসংঘাত তথা সংকট এবং সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ 'গোরা' উপন্যাসের মূল বিষয়। জাতীয়তাবোধ বা মানবিকতার মধ্যে মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের সাধনাই শ্রেয় — এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির মধ্যে বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বহুতথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ থাকলেও ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ভাবকেন্দ্র অসামান্য নৈপুন্যের সঙ্গে ঠিকভাবে বজায় রেখেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র গোরা সহ পরেশবাবু, বিনয়, ললিতা, সুচরিতা, আনন্দময়ী, হারান — প্রত্যেকেই নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে আগ্রহী হলেও রবীন্দ্রনাথ তাদের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে মুখ্যত সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্তকেই উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ঝোঁকে ব্যক্তিহৃদয়ের সমস্যা বা রক্ত মাংসের কামনা-বাসনার দিকটি উপন্যাসে

একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছে এমনটি নয়। তবে বিনয়-ললিতা, গোরা-সুচরিতা-এদের প্রেম-সম্পর্কগুলিও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে স্বাদেশিক চেতনার সঙ্গে। ভারতবর্ষের ভাবজীবন থেকে এদের ব্যক্তিজীবনকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। প্রথম জীবনে গোরাকে আমরা আচার-সর্বস্ব গোঁড়া হিন্দু রূপেই উপন্যাসে দেখতে পাই। সংকীর্ণ জাতীয় চেতনায় ঐ সময়ে তার আচার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিজের জন্ম পরিচয় জানার পর সে পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুতে পরিণত হয়। বিশ্বমানবতাবোধে তার বিশ্বাস জন্মে। গোরা জন্ম পরিচয় জানার পর পরেশবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বলে — "... আমি যা দিন রাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।"[২৪] অথবা, " আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, ... যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না — যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"[২৫] উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, গোরা সমস্ত রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দময়ীকে প্রণাম করে বলে ওঠে —" মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই — শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির আত্মবিরোধ ও আত্ম-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আত্মস্থ করে বিশ্বমানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন 'গোরা' উপন্যাসটিতে। ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর পরেশবাবু গোরার উদ্দেশ্যে বলেন — "গৌর, তোমার মাতৃক্রোড়ে তুমি যে অধিকার পেয়েছ সেই অধিকারের মধ্যে তুমি আমাদের আহ্বান করে নিয়ে যাও।"[২৭]

তত্ত্বসমস্যার ব্যাপকতা থাকলেও বিষয়বস্তু, ভাষা, রূপ-কল্পনা, ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন, মননশীলতা প্রভৃতির বিচারে 'গোরা' বাংলা সাহিত্যে মহৎ উপন্যাস হিসেবেই স্বীকৃত।

১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন — এই চার মাস ধরে 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকায় 'চতুরঙ্গ'-এর চারটি অঙ্গ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটির প্রকাশকাল — ভাদ্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। এটি রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যের একটি বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসটি রচনার পর থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাসের ঋতুবদল শুরু হয়। এখানে ঔপন্যাসিক কাব্যধর্মী সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পাত্র-পাত্রীর অন্তর্জগতের চিত্র উদঘাটনেই বেশী মনোযোগী হয়েছেন। আধ্যাত্মিকতা ও জৈবিকতা — এই দুই ভিন্নমুখী জীবনবোধের সংঘাত উপন্যাসটিতে রূপায়িত হয়েছে। আদর্শবাদী শচীশ সত্যকে জানবার ব্যাকুলতায় একবার রূপের পথে একবার রসের পথে ঘোরাঘুরি করে। তার সত্য অন্বেষণের পথে কখনো এসেছেন জ্যাঠামশায়, কখনো লীলানন্দস্বামী, কখনো দামিনী। জীবনের প্রথম পর্যায়ে গুরুবাদী শচীশ জ্যাঠামশায় জগমোহনের কাছে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের মাধ্যমে মুক্তি লাভের দীক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের রূপাশ্রয়ী বুদ্ধি তাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে নি। তাই সে লীলানন্দস্বামীর অরূপ-পিপাসার মধ্যে সত্যকে আবিষ্কার করতে চাইল। কিন্তু স্বামীজীর বায়বীয় রসের সাধনা তার অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারে নি। সাধনার তৃতীয় পর্যায়ে আদর্শবাদী শচীশের উপর জীবনবাদী শচীশের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পর্যায়ে তার পরীক্ষা শুরু হয় দামিনীকে নিয়ে। দামিনী রূপের পূজারী, রসে তার আগ্রহ নেই। সে চায় শচীশকে বশ করতে, সেবা করতে পুজো করতে। অন্যদিকে শচীশের রূপের প্রতি তীব্র অনীহা। দামিনীর রূপের আকাঙ্ক্ষা মেটানো তার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় শচীশ দামিনীকে কর্তব্যের আহ্বান জানায়। দামিনী শচীশের আহ্বানে সাড়া দিলে শচীশের সমস্যা বেড়ে যায়। তার আত্মিক সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে। দামিনীর সান্নিধ্য তার কাছে বিষবৎ মনে হয়। সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দামিনীকে বিদায় দেয়। এরপর শচীশ পূর্ণতর সাধনার পথে যাত্রা করে ; উপলব্ধিগত সত্যকে সাধনার চরম সত্যরূপে গ্রহণ করে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল শচীশ। তার চারিত্রিক পরিবর্তনের ধারাপথেই উপন্যাসের কাহিনির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে —

গড়ে উঠেছে দামিনী-শ্রীবিলাসের দাম্পত্য সম্পর্ক। যে সম্পর্ক বস্তু-সম্পর্কশূন্য জীবন তত্ত্বের চেয়ে হৃদয় ধর্মকেই বড় বলে মনে করে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি 'চতুরঙ্গ'— এর সমসাময়িক রচনা। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত সময়কালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.)। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটিতে নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্য-সম্পর্কের চিত্র উদ্‌ঘাটনই মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিনজন — নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলা। এই তিনটি চরিত্রের আত্মকথনের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। স্ত্রীর দেহ-মনের প্রতি স্বামীর নিরঙ্কুশ অধিকার সমাজ-প্রদত্ত ও সমাজ সমর্থিত। বিমলার স্বামী নিখিলেশ আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত। সে ভারতীয় দাম্পত্য আদর্শের মধ্যে যে মিথ্যা রয়েছে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। এই জন্য স্ত্রী বিমলাকে সে অন্তঃপুরের বদ্ধ হাওয়া থেকে বাইরের মুক্ত জগতে এনে স্বামীর প্রতি বিমলার আন্তরিক প্রেমের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিল। প্রেমের ক্ষেত্রে স্বাধীন নির্বাচনের কোনো আগ্রহ বিমলার মধ্যে প্রথমে দেখা যায় নি। পরে স্বদেশী উন্মাদনার সময় স্বামীর বন্ধু সন্দীপ ঘটনাচক্রে তার জীবনে আবির্ভূত হলে তার প্রতি মোহান্ধ হয়ে বিমলা নিজেকে তার কাছে আত্মসমর্পনের জন্য এক প্রকার উন্মুখ হয়ে ওঠে। নিখিলেশ ও সন্দীপকে কেন্দ্র করে বিমলা তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। সমস্যা সৃষ্টি হয় নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্য জীবনে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আত্ম-আবিষ্কারের ফলে মোহমুক্তি ঘটে বিমলার।

'যোগাযোগ' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থরূপে প্রকাশের পূর্বে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন থেকে ১৩৩৫ সালের চৈত্র পর্যন্ত আঠারো মাস ধরে এটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দুই কিস্তি প্রকাশের সময় গল্পের নাম ছিল 'তিন পুরুষ'। তৃতীয় কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নাম পরিবর্তন করে দেন,

তখন প্রকাশিত হয় 'যোগাযোগ' নামে। উপন্যাসটি প্রথমে 'তিন পুরুষ' নামে প্রকাশিত হলেও তিন পুরুষের সমস্যা এখানে প্রাধান্য পায় নি, প্রাধান্য পেয়েছে দাম্পত্য-সমস্যা। মধুসূদন ঘোষালের সঙ্গে কুমুর বিবাহ-ঘটনা ও বিবাহ পরবর্তী কালে দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে কুমুর হৃদয়-মনের দ্বন্দ্বই উপন্যাসটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীর স্থূল রুচির সঙ্গে কুমুর সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্বের ফলেই উপন্যাসে সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঐ সমস্যা-সংকটের স্বরূপ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'গৃহদাহ', প্রভৃতি উপন্যাসেও দাম্পত্য-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ঐ উপন্যাসগুলিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির ফলেই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কিন্তু 'যোগাযোগ' উপন্যাসে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কুমুর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ ও তার অবচেতন মনে প্রোথিত স্বামী আদর্শের সঙ্গে মধুসূদনের স্থূল পার্থক্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি দাম্পত্যের অন্দরমহলে অনেক মৌলিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন। যা দেখে ও দ্যাখা হয় না, শুনে ও না শোনার ভান করা হয়। অথচ দাম্পত্য-সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির চেয়েও ভয়ংকর ঐ অসঙ্গতিগুলি। যা দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য নষ্ট করে দাম্পত্যজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঐ অসঙ্গতির চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পাতায়।

'শেষের কবিতা' ১৩৩৫ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ভাদ্র থেকে চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৩৩৬ সালে (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে)। নর-নারীর প্রেম এবং দাম্পত্য-সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস পরিক্রমা শুরু করেছিলেন ষোলো বৎসর বয়সে 'করুণা' রচনার মধ্য দিয়ে। তারই একটি পরিণত সমাধানের পথনির্দেশ বলে মনে হয়, প্রায় সত্তর বছর বয়সে লেখা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসকে। তাঁর এই উপন্যাসটি পড়ে পাঠক সমাজ চমকে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তারুণ্যকে নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের বিষয়-ভাবনায় রয়েছে অমিত-লাবণ্যের আশ্চর্য প্রেম-কাহিনী। যা পড়তে পড়তে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, অথচ গল্পের সম্মোহন ও ভাষার টানে তাকে অবিশ্বাস করে দূরে ঠেলে সরিয়ে রাখা যায় না। উপন্যাসটির ভাষা— বুদ্ধিতে উজ্জ্বল,

কবিত্বে শ্রীময়ী, কৌতুকে উচ্ছল। উপন্যাসের নায়ক অমিত রায়কে দেখা যায়, অক্সফোর্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে বার লাইব্রেরিতে বসে দাবা খেলতে। কারণ, আইন ব্যবসায় তার অনীহা। তেমনি ''মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই'' তবে উৎসাহ আছে। তাই আত্মীয়-স্বজন ওর বিয়ের আশা একপ্রকার ছেড়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে অমিত বলে — '' আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমন্ডল ছুঁতে-না- ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।''[২৮] 'বেহিসেবী উড়নচন্ডী' অমিত এক সময় শিলঙে যায় ছুটি কাটাতে । তার শিলঙে যাওয়ার প্রধান কারণ হল সেখানে তার পরিমন্ডলের কেউ যেত না। সেখানে গিয়ে সে এক নগন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়ে — ঘটে মাটরিক সংঘর্ষ। সামনে দেখতে পায় তার মানসী প্রতিমাকে। নাম তার লাবণ্য। স্বপ্নের রাজকন্যা লাবণ্যর নারী প্রকৃতি ছিল বিদ্যার স্তূপে চাপা পড়ে। চাপা পড়া প্রকৃতি সংঘর্ষের পর ওঠে জেগে। তার মধুর সৌরভ ভ্রমরকে মুগ্ধ করে। শুরু হয় নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের গুঞ্জন, কবিতার দিব্য ভাষায় মন জানাজানির পালা। প্রেমের জীয়ন কাঠিতে হয় উভয়ের নব জন্ম; লাবণ্যের হৃদয়ে অকুণ্ঠ প্রেম, অথচ পরিণয়ে আত্মগত দ্বিধা। অবশেষে বিবাহের প্রস্তাবনা। কিন্তু তাদের পরিণয় প্রস্তাবনা পরিণামে পৌঁছোতে পারে না কেটি মিত্রের আগমনে। কেটি অমিতের পূর্ব প্রণয়িনী। বিবাহ-বিষয়ে লাবণ্যের একপ্রকার দ্বিধা পূর্ব থেকেই ছিল। 'চোখের বালি' উপন্যাসেও ব্যক্তিত্বময়ী বিনোদিনীর মধ্যে আমরা ঐ দ্বিধা দেখতে পেয়েছি। আসলে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিতে দেখাতে চেয়েছেন দাম্পত্য জীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে মুক্ত প্রেমের মৃত্যু ঘটে। প্রেমকে তিনি জীবনের চালিকা শক্তি বলে মনে করতেন। তাই অমিত-লাবণ্য তাদের মুক্ত প্রেমকে দাম্পত্য-জীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রেখে, মুক্ত--প্রেমের আলোকে যাত্রা করেছে কর্মসাধনার পথে। শৈল্পিক মানদণ্ডে 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হিসেবে কতটা সার্থক হয়েছে — সে বিষয়ের আলোচনা সমালোচকদের জন্য তোলা থাক। এই উপন্যাসে দাম্পত্য বা দাম্পত্যের জটিল সমস্যা কিছু নেই। কিন্তু যা আছে তা হল রবীন্দ্রনাথের মধুর স্বপ্নপ্রয়াণের কথা। সেই স্বপ্নরাজ্য থেকে কবির নায়ক-নায়িকা শেষ পর্যন্ত মাটিতে নেমে এলেও আমাদের মন ঐ স্বপ্নের নেশায় বুদ্ হয়ে থাকে।

'দুই বোন' ধারাবাহিক ভাবে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত সময়কালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে)। উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রেমতত্ত্ব ও প্রেম-সমস্যার চিত্রকে রূপায়িত করেছেন। 'শেষের কবিতা'র চার বছর পর রচিত এই উপন্যাসটি আকারে খুবই ছোটো। আকারে ছোটো হলেও উপন্যাসটিতে প্রেম সমস্যাকে কেন্দ্র করে সংঘাত প্রবলতর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের শুরুতেই নারীর দুই রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, ''মেয়েরা দুই জাতের, ... একজাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।''[২৯] শর্মিলার মধ্যে মাতৃ-স্বভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ঊর্মিমালার মধ্যে প্রিয়া স্বভাবের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। একজন পুরুষের কাছে দাম্পত্যে বা প্রেমজীবনে মাতৃস্বভাবের নারীর চেয়ে যে প্রিয়া স্বভাবের নারীই অধিক কাঙ্ক্ষিত সেই দিকটি শশাঙ্ক চরিত্রে ধরা পড়েছে। শশাঙ্কের প্রেমিকসত্তা ও তার অবদমিত কামনা, ঊর্মিমালার প্রিয়াসত্তা ও তার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নীরদের স্বভাবের সংঘাত, শর্মিলার মাতৃস্বভাবের প্রতি শশাঙ্কের অবচেতন মনের বিরূপতা, ঊর্মিমালার প্রিয়া স্বভাবের প্রতি শশাঙ্কের সুতীব্র আকর্ষণ — সব মিলে উপন্যাসটিতে প্রেম-সমস্যা প্রবলতর হয়ে উঠেছে। প্রেমাস্পদের প্রতি অসপত্ন অধিকারের বাসনা প্রেয়সী নারীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে নারীর প্রিয়াস্বভাবের পরিচয় 'দুই বোন' উপন্যাসে ঊর্মির মধ্যে সে ভাবে প্রস্ফুটিত হয় নি। তাই হয়তো এই উপন্যাসটি রচনার কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' রচনা করেন।

'মালঞ্চ' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে, ইংরাজী ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪০ সালের আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সময়কালে। উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে আদিত্য-নীরজার প্রাণ-প্রাচুর্যময় সুখের দাম্পত্যে কীভাবে ভাঙন ধরিয়েছে ঈর্ষার আগুন তা মনস্তাত্ত্বিকতার নিরিখে প্রস্ফুটিত করেছেন।

নারীর প্রিয়া-স্বভাবের পরিচয়ও এখানে নীরজাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। আদিত্য-নীরজার দীর্ঘ দশ বছরের সুখী-দাম্পত্যের এবং নীরজার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সজীব বর্ণনাও উপন্যাসটিতে রয়েছে। কিন্তু এখানে 'চোখের বালি' উপন্যাসের মতো চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায় নি। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিতে অভিনবত্ব এনেছেন পাত্র-পাত্রীর গোপন মনের অবদমিত প্রেম বাসনা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ ইঙ্গিত ও সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্ত করে। বাল্যকালে আদিত্য ও সরলার মনে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকার সময় প্রেমের উন্মেষ হয়েছিল। সামাজিক অনুশাসনের জন্য সেই প্রেম অপ্রকাশিতই রয়ে যায়। কিন্তু তাদের বাল্য প্রেমের বিনাশ ঘটে নি। উভয়ের মনের সংগোপনে তা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। নীরজার ঈর্ষার আগুনে তাদের সেই অবদমিত প্রেম অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে প্রকাশের আলোয় উঠে আসায় রোগাক্রান্ত নীরজার মর্মবেদনা বেড়ে যায়। আর তার হৃদয়-বেদনাই তাকে মনোবিকারগ্রস্ত করে তোলে। পরিণতিতে তার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস। ১৯৪১ সালে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে) উপন্যাসটি একেবারে সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটিই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উপন্যাস যা কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় নি। ''চার অধ্যায়' রচনার পিছনে সাময়িক পত্রে প্রকাশের কোনো তাড়া ছিল না কবির মনে — এ রচনার সবটুকু প্রেরণাই কবির অন্তর সম্ভূত।''[৩০] সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাসটি রচিত হলেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপকে ছাপিয়ে উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে এলা-অন্তুর হৃদয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও তার ফলে উদ্ভূত তাদের মনের প্রবল দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ।

দলীয় দায়িত্ব কর্তব্যের সঙ্গে তার সংঘাত বাধে অপ্রতিরোধ্য প্রেমবাসনার। উপন্যাসটিতে নারী-পুরুষের প্রেমবাসনা আবেগের উত্তাপে ও অনুভবের বর্ণালিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভাবালুতা বর্জিত ও ভাবুকতায় সমুন্নত, দেহাত্মবাদী প্রেমের চিত্র

এখানে যত তীব্র ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারায় আর কোনটিতে তেমনভাবে প্রকাশ পায় নি।

উপন্যাসের নায়িকা এলা — এলালতা; রূপেগুণে অতুলনীয় এলার প্রতিজ্ঞা ছিল সংসারের বন্ধনে কোনো দিন বদ্ধ হবে না। কলকাতার নারায়ণী হাইস্কুলের কর্ত্রী এলা বিপ্লবী দলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের বিপ্লবী দলের নেতা ইন্দ্রনাথ। দলের কাজকর্ম চলে লোকচক্ষুর ও সরকারের সহস্র চক্ষুর আড়ালে। এলার সঙ্গে অতীনের দেখা হয় স্টিমারে গঙ্গা পার হবার সময়। সুদর্শন ও রুচিবান অতীন অর্থাৎ অন্তুকে দেখে এলা মুগ্ধ হয়। অতীন প্রথম পরিচয়েই এলার প্রেমে পড়ে। এলার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণে জমিদারপুত্র অতীন সমাজ, সংস্কার, আদর্শ এমন কি জীবিকা পর্যন্ত ত্যাগ করে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের 'বিভীষিকা পন্থা'-কে গ্রহণ করে। অতীনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি কবিতার জগতে। তাই সন্ত্রাসবাদী কর্মে যুক্ত হওয়ায় সে স্বভাবভ্রষ্টতার যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয়। কিন্তু প্রবল আত্মমর্যাদাবোধের জন্য সে দলত্যাগ করতে পারে না। সে জানে দুরন্ত প্রেম তাকে যেখানে টেনে এনেছে সে এক অন্ধগলি, সেখানে বাসর রচনা অসম্ভব। সর্বনাশই সেখানে ভবিতব্য। অন্তু মাথা উঁচু করে সেই ভবিতব্যের মুখোমুখি হতে এলার বাড়িতে এলার কাছে যায় — দলের স্বার্থে এলাকে হত্যা করার আদেশ পেয়ে। মৃত্যু যখন দুয়ারে দাঁড়িয়ে তখন জীবনধর্ম অস্বীকার করার জন্য আমরা এলাকে দেখি তীব্র অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে — "দয়া করো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মূঢ় — তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনো কালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে দাও শাস্তি।"[৩১]

রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে চার অধ্যায় ত্রুটিপূর্ণ রচনা। তা সত্ত্বেও উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত নাটকীয় শক্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের টেনে রাখে। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের অবরোধের মধ্যে আমরা দেখি অন্তু-এলার প্রেম — প্রতি মুহূর্তে বাঁধ দেওয়া নদীর মতো নিষ্ফল মুমুক্ষায়, তীব্র আক্রোশে ফুলে ফুলে গর্জে উঠছে।

উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ অন্ত-এলার প্রেমের যে ছবি এঁকেছেন তাতে সংযম ও সৌন্দর্যের সমন্বয়ে তীব্রতম জীবন-সংরাগ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্র উপন্যাসের শ্রেণি বিভাজন ঃ

রবীন্দ্র উপন্যাসের পর্ব বিভাগ সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে। কখনো বিষয়বস্তু, কখনো বা গঠন পদ্ধতি, কখনো আবার রচনাশৈলী অনুযায়ী রবীন্দ্র উপন্যাসকে তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করেছিল। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে ঘটনার প্রাধান্য ও ঘটনা প্রাধান্যের পরিবর্তে চরিত্রের প্রাধান্যের দিক থেকে অনেক সমালোচক রবীন্দ্র উপন্যাসগুলিকে দুটি পর্বে ভাগ করেছেন — ১. বঙ্কিম প্রভাবিত পর্ব, ২. রবীন্দ্রিক পর্ব। সত্যব্রত দে প্রমুখ সমালোচকদের মতে গঠন পদ্ধতির দিক থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাসের দুটি পর্যায় চোখে পড়ে— " গঠন পদ্ধতির দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্র-উপন্যাস ধারায় দুটি স্তর পর্যায় সহজেই চোখে পড়ে। গোরা পর্যন্ত উপন্যাসগুলি প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত এবং গোরা পরবর্তী উপন্যাসগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ের।"[৩২] অনেকে আবার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মিতা ও মনস্তাত্ত্বিক ভাষা-বিন্যাসের ভিত্তিতে 'চতুরঙ্গ'থেকে পরবর্তী উপন্যাসগুলিকেই প্রকৃত রাবীন্দ্রিক উপন্যাস বলে মনে করেন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের অনেক গবেষক আবার রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা প্রথম পর্বে রেখেছেন 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসকে। দ্বিতীয় পর্বে আছে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'। আর তৃতীয় পর্বে রেখেছেন — 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটিকে। তাঁদের মতে প্রথম পর্বের উপন্যাসের সামান্য লক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ ও অনুসরণ। আর দ্বিতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য লেখকের স্বনির্ভরতা ও উপন্যাসগুলির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য। তৃতীয় পর্বের উপন্যাসে তাঁরা তত্ত্বের প্রাধান্য ও ঔপন্যাসিকের উপর কবির আধিপত্যকেই দেখতে পেয়েছেন। এই পর্ববিভাজন

কোনো অখন্ডতার বোধে, ঐক্যের উপলব্ধিতে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে কিনা এবং রবীন্দ্রনাথের বিকাশশীল ঔপন্যাসিক সত্তার অন্তঃপ্রেরণা, স্বচ্ছন্দে ক্রমবিকাশ ও পরিণাম এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা — এই সব বিতর্ক আমরা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চাই। কেননা, আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার বিশ্লেষণেই বিশেষভাবে আগ্রহী। তাই আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্র উপন্যাসগুলিকে দাম্পত্যে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ভিত্তিতে দুটি পর্বে বিভক্ত করেছি। যে উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্য সমস্যার চিত্র প্রতিফলিত হয়নি সেগুলিকে রেখেছি ক- পর্বে। আর খ- পর্বে থাকছে দাম্পত্য জীবনের জটিল সমস্যা কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি। ক-পর্ব — 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি',' নৌকাডুবি', 'গোরা', 'শেষের কবিতা' ও 'চার অধ্যায়'। খ-পর্ব — 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ',' দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'। — এই 'খ' পর্বের উপন্যাসগুলির স্বতন্ত্র আলোচনার মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছি।

<u>চোখের বালি</u> ঃ

বিশ শতকের উষালগ্নে নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১৩০৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩০৯ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'চোখের বালি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যেই নয়, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'চোখের বালি' (১৯০৩) রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' -এর প্রভাবকে স্বীকার করে নিলেও বলতে দ্বিধা নেই, এটি বাংলা উপন্যাসের জগতে নতুন পদক্ষেপ। উনিশ-শতকের গল্প-উপন্যাসে-পাত্র-পাত্রীর অন্তর্লোকের ছবি উদ্‌ঘাটনের চেয়ে কাহিনিবৃত্তের নাটকীয়তা কিংবা কল্পিত সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিই বেশি নজর দেওয়া হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাহিনিবৃত্তের খোলস ছিন্ন করে চরিত্রের অন্তরের মানুষটিকে বাইরের আলো বাতাসে মুক্তি দিলেন। নবযুগের আধুনিকতার মূল কথা-

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ। তাই তিনি ব্যক্তিত্বের সূত্রেই আখ্যানে নিয়ে আসেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্কের সাতকাহন; বাঙালির সুখী দাম্পত্য-মিথ-এও ছুঁড়ে দেন একাধিক প্রশ্নবাণ। অসুখী দাম্পত্য-সম্পর্ক যে কলকাতার নাগরিক সমাজের ধনিক শ্রেণির এক ধরণের 'চাপা অসুখ' রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক সম্পর্কের সেতু বলিষ্ঠ না হলে শুধু আত্ম-বিচ্ছেদই ঘটে না মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। দাদা-বৌঠান অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কদম্বরীদেবীর নষ্ট-দাম্পত্যের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। উনিশ শতকের 'বাবু কালচারের' পুরবাসিনী নারীদের অশ্রুজলও রবীন্দ্রনাথের কাছে অজানা নয়। এমনকি নব্যশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত মননও যে স্বামী-স্ত্রীর সহমর্মী-সহযোগী সম্পর্কের জন্য প্রস্তুত ছিল না, উনিশ শতকের একাধিক সাহিত্য-পাঠে রবীন্দ্রনাথ তারও পরিচয় পেয়েছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বাঙালির নষ্ট দাম্পত্যের নাটকীয় কাহিনী পরিবেশন করেছেন। এই নষ্ট দাম্পত্যের কাহিনী-পরম্পরাতেই রবীন্দ্রনাথ পুনরায় এসে উপস্থিত হলেন এক জটিল মানস-বৃত্তান্তের দ্বারপ্রান্তে। তৈরী হলো 'চোখের বালি'। তবে নিছক কাহিনী বর্ণনা নয়, এই ভ্রষ্ট দাম্পত্যের পিছনে সক্রিয় ছিল যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা, 'চোখের বালি'-তে তা-ই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। একারণেই 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের দাবি রাখে।

মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনের সমস্যাই 'চোখের বালি' উপন্যাসের মূল বিষয়। উপন্যাসটিতে প্রথম বাংলা সাহিত্যে ঘটনা পরম্পরার বিবরণের পরিবর্তে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করাই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। মহেন্দ্র, বিনোদিনী, আশালতা, বিহারী, রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার চিত্তজগতের অন্দরমহলের খবর, তাদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের প্রয়াসই 'চোখের বালি' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে 'চোখের বালি'র সূচনা অংশে জানিয়েছেন। — ''সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।''[৩৩]

পূর্বজ বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাসদ্বয়ের কাহিনী-কাঠামোর অনুপ্রেরণা এই আঁতের কথার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের কাছে নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে। উপন্যাসে জীবনের যে টানাপোড়েন অনুভূত হয়, তা যতটা না বাইরের ঘটনা-প্রবাহে উদ্দীপিত, চরিত্রের অভ্যন্তরীণ আন্দোলন সক্রিয় থেকেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। মানব হৃদয়ের জটিল গ্রন্থিগুলো রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত করেছেন 'চোখের বালি'তে।

উপন্যাসের পূর্বসূত্রের সন্ধান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ'-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর দাম্পত্য কাহিনীর বাস্তবতা বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসে বদলে গেছে বহুলাংশে, রবীন্দ্রনাথ তা জানেন বলেই এ যুগের দাম্পত্য সম্পর্ককে বাস্তবের কাছাকাছি রাখবেন বলেই 'চোখের বালি'র গল্পের অনুসন্ধান করলেন 'এযুগের কারখানাঘরে'। চরিত্রের টান অমোঘ বলেই 'নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।' ফলত বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটনা বহুল কথনরীতির পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ মনযোগী হলেন এমন এক উপন্যাসে, যেখানে ঘটনাবস্তু অতি সামান্য। বরং চরিত্ররাই হয়ে উঠেছে উপন্যাসের নিয়ন্ত্রণী শক্তি।

'চোখের বালির' কাহিনি অতি সামান্য। তার মধ্যে নতুনত্ব তেমন কিছু নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের ফলে দাম্পত্য-সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি। রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা ছিল বাল্যসখি হরিমতির কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে ছেলে মহেন্দ্রর বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করবেন। মহেন্দ্র বিবাহে অসম্মত হওয়ায় বিনোদিনীর অন্যত্র বিবাহ হয়। বিয়ের অল্প কিছুদিন পর তার জীবনে বৈধব্য নেমে আসে। এরপর সে রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছায় তাদের বাড়িতে আসে। তার আগমনে মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য-সম্পর্কে ফাটল ধরে। বিনোদিনী তার মোহিনী মায়ায় মহেন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল ঠিকই, কিন্তু হৃদয় সমর্পণ করেছিল মহেন্দ্রর বন্ধু বিহারীকে। বিহারীর সঙ্গে এক সময় আশালতার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। মহেন্দ্রর জন্যই তা হয় নি। তাই আশালতার প্রতি বিহারীর মনে এক ধরনের দুর্বলতা ছিল। মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী-আশালতা— এদের চতুর্মাত্রিক প্রণয়বৃত্তান্ত-ই 'চোখের বালি' উপন্যাসের কাহিনী।

কাহিনী সামান্য অথচ চরিত্র তথা সম্পর্কের মানসলোক উন্মোচনে এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ। মহেন্দ্র-আশালতার নষ্ট দাম্পত্যের থেকে বিনোদিনীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি উপন্যাসে আপাতভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও কাহিনীর মূল কাঠামো কিন্তু আবর্তিত হয়েছে মহেন্দ্র-আশালতার সংসারকে কেন্দ্র করেই। বিনোদিনী, বিহারী, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা এই সংসারবৃত্তেই আবর্তিত হয়েছে।

উপন্যাসের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। বিনোদিনী, মহেন্দ্র, আশালতা ও বিহারী-- এই চারজনের মধ্যেকার সম্পর্কের উত্থান-পতন উপন্যাসের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। অথচ উপন্যাসে 'চোখের বালি' বিশেষণটি শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বকে চিহ্নিত করার জন্যই গ্রহণ করেছিল আশালতা। 'চোখের বালি'র মূল অর্থ যে চক্ষুঃশুল হওয়া, তা উপেক্ষা করেই বিনোদিনীর সঙ্গে সখী-সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করতে আশালতা হয়ে গেলেন বিনোদিনীর 'চোখের বালি'। 'চোখের বালি' নামটি বিনোদিনীর দেওয়া। 'শ্রুতিমধুর নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল।' এই নাম বিনোদিনীর অন্তরের অগ্নিদাহের প্রথম আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু কেন এই অগ্নিদাহ? ঔপন্যাসিক তারও কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। মহেন্দ্র আশালতার সংসারে বিনোদিনীর প্রবেশের পূর্বেই মহেন্দ্র-আশালতার দাম্পত্য যে ঠুনকো, অন্তঃসারশূন্য তার প্রক্ষাপট তৈরি হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানস-যোগাযোগের সেতু বলিষ্ঠ না হলে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়িত্ব লাভ করে না, মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মহেন্দ্র ও আশালতার মধ্যে মানসিক সম্পর্কের বুনিয়াদ তত জোরাল ছিল না। কেননা, সামাজিক মতে বিবাহ হলেই দুটি অসম মনের মিল সুসম্পন্ন হয় না। মানস সান্নিধ্য পেতে হলে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক হতে হয়। আশালতা প্রায়

বালিকা। পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা প্রায় নেই। সে যে সমাজে মানুষ হয়েছে তাতে বাইরের বদলে যাওয়া পৃথিবীর মুক্ত জল-হাওয়ার স্পর্শ যে তার গায়ে লাগেনি, সে কথা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। এদিকে কলেজ ছাত্র মহেন্দ্র উনিশ শতকের শেষার্ধের নগর কলকাতার নব্য যুবক। মা রাজলক্ষ্মীর মুখ চেয়ে যতই সে কামিনীর সংসর্গ থেকে দূরে থাক না কেন, নারী শিক্ষা ও ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণে মেয়েদের সামাজিক পালাবদল সে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছে। সেই জন্যই হয়তো রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দের বিষয়ে মহেন্দ্রকে বলেন,"শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে — তোদের আজকালকার পছন্দের সঙ্গে মিলিবে।"[৩৪] শিক্ষা ও রুচির দিক থেকে তার উপযুক্ত মেয়েই হবে তার যোগ্য ঘরণী, এমন অভীপ্সা তার মধ্যে প্রবলভাবে ছিল বলেই আশালতাকে সে তার যোগ্য করে তুলতে চেয়েছে। অন্যদিকে পিতৃ-মাতৃহীনা আশালতা অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেড়ে উঠেছে। পরান্নে জীবন নির্বাহকারী অন্তঃপুরবাসিনীদের মতোই তার নিজস্ব কোনো সত্ত্বা গড়ে ওঠেনি। রূপ-সৌন্দর্য ও আনুগত্য প্রদর্শন করা ছাড়া মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করার মতো অন্য কোন গুণ আশালতার ছিল না। তাই তার সঙ্গে দাম্পত্যের পুতুল খেলায় খুব সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মহেন্দ্র। পাশাপাশি স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর প্রাথমিক প্রচেষ্টা থাকলেও মহেন্দ্রের আন্তরিক উদ্যোগের অভাবে তা শেষপর্যন্ত পরিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। স্ত্রীর স্বাধীন প্রবৃত্তির জন্ম দেবে বলে সদম্ভে ঘোষণা করলেও, পরোক্ষে মহেন্দ্র স্ত্রী আশালতাকে ব্যক্তিত্বহীন করে তুলেছে। ফলে আশালতা একদিকে পরম বন্ধু বিহারীকে যেমন চিনতে পারেনি, অন্যদিকে খুব সহজেই বিশ্বাস করেছে বিনোদিনীকে। আশালতার সংসার রক্ষায় বিহারীর উদ্যোগ একারণেই খুব সহজে বিনোদিনী নস্যাৎ করতে পেরেছে। দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরার মূলে একদিকে রয়েছে মহেন্দ্রের রূপজ মোহ, অন্যদিকে আশালতার নিষ্প্রভতা।

উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্কের গতিমুখ নির্ধারণে রাজলক্ষ্মী, বিহারী, বিনোদিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মায়ের আধিপত্যকামী মনস্তত্ত্ব সন্তানের দাম্পত্য-সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে রবীন্দ্রনাথ তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষা মহেন্দ্র ও আশালতার সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে

ঔপন্যাসিকের মন্তব্য -'চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে।' মহেন্দ্র রাজলক্ষ্মীর অঞ্চলাশ্রিত। তার চরিত্রগত অধিকারস্পৃহা, আত্মগৌরব, সঞ্চারিত হয়েছিল মহেন্দ্রর মধ্যে। অন্যদিকে পুত্রের মাতৃভক্তির জন্য রাজলক্ষ্মীর মনে প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল। পুত্রের প্রতি প্রবল আধিপত্যবোধের জন্য বিধবা জা অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিরোধ বাধে রাজলক্ষ্মীর। আশালতা ও মহেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনেও আধিপত্য বিস্তারে উদগ্রীব ছিলেন রাজলক্ষ্মী। ফলে পুত্র মহেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছাতেই মহেন্দ্র-আশার সুখের সংসারে বিনোদিনীর প্রবেশের সুযোগ ঘটেছে। আশালতাকে হেয় করার জন্য বিনোদিনীকে সর্বসমক্ষে প্রাধান্য দিতে কুন্ঠাবোধ করেনি রাজলক্ষ্মী। এই বিনোদিনীই পরবর্তী সময়ে মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য অসুখের কারণ হয়ে উঠেছে।

'চোখের বালি'তে রাজলক্ষ্মীর পাশাপাশি বিনোদিনী-মহেন্দ্র-আশালতার মানসিক টানাপোড়েনও উপন্যাসের বাঁক পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শৈশবে পিতৃহীন মহেন্দ্র মায়ের অঞ্চলাশ্রিত । ফলে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি তার। তার উপর 'বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে। এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল।' এই উচ্ছৃঙ্খলতা মহেন্দ্রের মানসিক অস্থিরতার কারণ। উপন্যাসের পরতে পরতে মহেন্দ্র তার আবেগ ও দুর্বলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিনোদিনীকে বিবাহের সম্বন্ধ অস্বীকার করা, বন্ধু বিহারীর জন্য নির্বাচিত পাত্রী আশালতাকে বিবাহ করা, কিংবা বিধবা বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে মহেন্দ্রের মানসিক দৃঢ়তার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। মহেন্দ্র কোনো সম্পর্ককেই যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি। মা রাজলক্ষ্মী, স্ত্রী আশালতা, বন্ধু বিহারীর প্রতি কোনো কর্তব্যই পালন করতে পারেনি মহেন্দ্র। অথচ মহেন্দ্রের নিজের সম্পর্কে ও তার কর্তব্যবোধ সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা রয়েছে। এমন কি স্ত্রীর প্রতি নিবিড় প্রেমের পরিবর্তে যে অনুকম্পা ও কর্তব্যবোধ মহেন্দ্রকে উপন্যাসের প্রথমে চালিত করেছে, তা একই সঙ্গে তার স্বামীসত্ত্বার প্রকৃত স্বরূপ থেকে

তাকে যেমন বিচ্যুত করেছে, অপর দিকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে জন্ম দিয়েছে অন্তরীক্ষ সমান শূন্যতার। মহেন্দ্রের এই চারিত্রিক ছিদ্রপথেই তার ও আশালতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে বিনোদিনী। আশালতা ও বিনোদিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র প্রবল মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। উপন্যাসে মহেন্দ্রের মানসিক টানাপোড়েনই 'চোখের বালি'কে পূর্ববর্তী 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'(১৮৭৮)-এর থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

উপন্যাসে দ্বন্দ্ব জটিল মনের সন্ধান মেলে বিনোদিনীর মধ্যেও। একদিকে বিধবা নারীর অতৃপ্ত যৌবনক্ষুধা ও অন্যদিকে কল্যাণময়ী নারী — এই দ্বিমুখী সত্তা প্রকাশ করার জন্যই যেন বিনোদিনীর সৃষ্টি। বারাসাত থেকে কলকাতায় আশালতার সংসারে প্রবেশ করেই বিনোদিনীর মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে। একদা মহেন্দ্রর সঙ্গে তার বিবাহের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সেই না হওয়া সংসারে তার জায়গা দখল করেছে আশালতা। এই ভাবনায় — 'তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল।' বিনোদিনীর মনে হল, ''এমন সুখের ঘরকন্না — এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ-ঘরের এই দশা, এ-মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।''[৩৫] এই ঈর্ষা বিনোদিনীর মধ্যে জন্ম দিয়েছে আগ্রাসনের আগুন। সেই আগুনে শুধুমাত্র মহেন্দ্র- আশার দাম্পত্য জীবনই দগ্ধ হয় নি। তার উত্তাপে আত্মীয়-বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই ঝলসে গেছে। অথচ এমনটি হোক, তা সচেতনভাবে কেউই চায় নি। তবে কেন ঘটলো ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ডের ঘটনা ?

'চোখের বালি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহেন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহের ফলেই আশার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। আশার সঙ্গে তার মানসিকতার বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দাম্পত্যের প্রথম পর্যায়ে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বাসের কোনো খামতি ছিল না। কিন্তু মহেন্দ্রর জীবনে বিনোদিনীর আগমন ঘটলে দাম্পত্যে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি কেঁপে ওঠে। সৃষ্টি হয় দাম্পত্য সমস্যার। তাই মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য-

সমস্যার ক্ষেত্রে বিনোদিনী দায়মুক্ত নয়। তবে বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী, বিহারী, তাদের দাম্পত্য সমস্যায় সহায়কের ভূমিকা পালন করলেও সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ নিহিত ছিল মহেন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। বিনোদিনীর আগমনের পূর্বে মহেন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তেমন কোন জটিলতা লক্ষ্য করা যায় না। মায়ের প্রতি তার ছিল স্বাভাবিক, বলা যেতে পারে স্বাভাবিকের চেয়েও অধিক আনুগত্য। লেখকের বর্ণনায়, "মা-সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না।... কাঙারু শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।"[৩৬] বন্ধু বিহারীর প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা, আর স্ত্রী আশার প্রতি ছিল একনিষ্ঠ প্রেম। বিনোদিনীর আবির্ভাবে ভাঁটা পড়ে পত্নীনিষ্ঠায়, মায়ের প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্যেও। নবচেতনার আলোকপ্রাপ্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীর সান্নিধ্যে ও তার সেবাযত্নে বুঝতে পারে, বিনোদিনীর মধ্যে-উন্মাদনা জাগিয়ে তোলার যে রসদ আছে, মুগ্ধ করার যে মন্ত্র সে জানে, আশার মধ্যে তার নিতান্তই অভাব আছে। শিক্ষা-রুচিতে বিনোদিনীর সঙ্গে আশার ব্যবধান আশমান জমিন। তাই আশার সান্নিধ্যে থেকে ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে উদ্দাম বেগে বিনোদিনীর দিকে ধাবিত হয়, তাকে পাবার প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আসলে প্রত্যেক পুরুষের গোপন প্রবৃত্তিতে একাধিক নারীর প্রতি আকর্ষণ থাকাটাই স্বাভাবিক। তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষ মানস-কল্পনায় যে তিলোত্তমাকে সৃজন করে বাস্তবের মাটিতে কোনো একজন নারীই সেই মানসী প্রতিমার অভাব পূরণ করতে পারে না। তাই সে এক-এ সন্তুষ্ট না হয়ে আকৃষ্ট হয় অন্যের প্রতি। তার মন হয়ে ওঠে বহুগামী। মনের এই বহুগামী মানসিকতা মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সত্য বলে প্রতিভাত। কিন্তু বহুগামী মানসিকতা বা বহুবল্লভতার কামনাকে সর্বত্র সমাজ-শাস্ত্র অনুমোদন করে না। তাই অসামাজিক কামনা-বাসনাগুলি — যারা মনের অন্ধকার কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে স্নাত হতে চায় তারা অধিশাস্তা বা Super ego-র দ্বারা অবদমিত হয়। যাদের অধিশাস্তা দুর্বল প্রকৃতির তারা অনৈতিক কামনা বাসনাকে অবদমন করতে পারে না। তাদের আচার আচরণে বিকৃতি দেখা যায়। বাল্যকাল থেকেই মায়ের স্নেহাঞ্চলে বেড়ে ওঠায় মহেন্দ্রের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটে নি। শুধু তাই নয়, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, বিহারী সকলের সাদর প্রশ্রয়ে সে সুখসন্ধানী প্রবৃত্তি বা pleasure principle এর পরিতৃপ্তিতে অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছিল। আশা ছিল তার ঐ সুখনীতির পরিতৃপ্তির সহায়ক, সেবাদাসী মানসিকতার দ্বারা সে মহেন্দ্রকে খুশী করতো। আর বিনোদিনী ছিল তার চেতনার পরিতৃপ্তি।

সকলে মহেন্দ্রের সুখের জন্য সদা তৎপর থাকলেও একমাত্র ব্যতিক্রমী ছিল বিনোদিনী। সে-ই মহেন্দ্রের জীবনে প্রথম নারী, যে মহেন্দ্রের ইচ্ছার পুতুল হয়ে থাকে নি। তার আধুনিক শিক্ষা ও রুচিবোধ এক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল। তাই বিনোদিনীকে তার মনে হয় অন্য ধরনের মানুষ। তার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বই মহেন্দ্রকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে। মহেন্দ্রের মনের সংগোপনে বিনোদিনীর প্রতি আসক্তির দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "বিনোদিনী এবং আশা উভয়কেই স্থান দিবার মত প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রর আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রর যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্যনীতির কোন ব্যাঘাত হইবে না। এইরূপ বুঝাইয়া মহেন্দ্র মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুইচন্দ্রসেবিত গ্রহের মতো এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।"[৩৭] রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের বিশ্লষেণ তার মনস্তত্ত্ব বা মন সচেতনতারই পরিচায়ক। বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় বহুবল্লভতার কামনার বিষয়টিকে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের 'Polymorphous perverse' নামক পরিভাষার সঙ্গে যা সামঞ্জস্য পূর্ণ। 'Polymorphous perverse' হল এক ধরণের মানসিক বিকৃতি। এই বিকৃতি ঘটে কোনো উত্তেজক (Seduction)-এর দ্বারা। মহেন্দ্রেরও চারিত্রিক বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। তার-মানস-বিকৃতির মূলে ছিল বিনোদিনীর সেবা-যত্ন ও প্রেমের অভিনয় — "চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না— বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চটপট সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেন্দ্রের প্রস্তুত অন্নে বিড়ালে মুখ দিল — আশা ভাবিয়া অস্থির; বিনোদিনী তখনি রান্নাঘরে গিয়া কোথা হইতে কী সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল; আশা আশ্চর্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র এইরূপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে, সর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত

পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল।''[৩৮]

ব্যক্তিত্বময়ী বিনোদিনীর সেবাযত্ন মহেন্দ্রকে অতি সহজেই আশার প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার প্রতিজ্ঞা থেকে টলিয়ে দেয়। চুক্তিভঙ্গ এবং সেই সঙ্গে ছন্দপতন ঘটে তাদের দাম্পত্য-জীবনে। দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর কাছে সমাজের কিছু সামাজিক প্রত্যাশা থাকে। কারণ, যে চুক্তির মধ্য দিয়ে দাম্পত্য-সম্পর্ক তৈরী হয় সেই বিবাহ-চুক্তিটি দারুণভাবে সামাজিক। এই চুক্তিতে একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের স্বীকৃতি থাকে এবং প্রেমের ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার দায় থাকে। প্রত্যাশা থাকলেও সামাজিক প্রত্যাশা সব সময় পূরণ হয় না। যেহেতু প্রেম আর দাম্পত্য পরস্পরের পরিপূরক হলেও সমার্থক নয়। প্রেম উপলব্ধির বিষয়, একটি বিমূর্ত ধারণা। প্রেমের উপলব্ধি স্বধর্মে ক্ষণস্থায়ী। একজন নারী ও একজন পুরুষের সান্নিধ্যের ফলে যখন তাদের হৃদয় প্লাবিত হয়ে মুগ্ধতার উৎসারণ ঘটে তখন প্রেমের সৃষ্টি হয়। এই প্রেম সর্বদা মুক্ত। যে কোনো নারী পুরুষের জীবনে যে কোন সময় এই উৎসারণ ঘটতে পারে। তাই দাম্পত্য জীবনে স্বামী বা স্ত্রী অথবা উভয়েরই অন্য নারী বা পুরুষের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি বা প্রেম জন্মানো স্বাভাবিক ঘটনা। নর-নারীর জীবনধর্ম বা যৌবন ধর্ম সত্য হলে তাদের ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাও তাই সমান সত্য। একজন বিধবাকে যৌবনকালেও মৃত স্বামীর অস্পষ্ট স্মৃতি বুকে নিয়ে সাত্ত্বিক জীবন যাপনের বিধান সমাজ-শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও মনস্তত্ত্বে ঐ বিধান ন্যায় সঙ্গত নয়। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে ব্যক্তির চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অধিশাস্তা বা Super ego-র প্রাবাল্য সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির প্রেমের বহিঃপ্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নারী পুরুষের প্রেমের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা, কল্যাণবোধের ধারণা, শ্রদ্ধাবোধ,সহৃদয়তা, শিক্ষ-দীক্ষা, রুচি- সংস্কারের সমতার উপর। দাম্পত্য জীবনে প্রেম সম্প্রসারিত হলে স্বামী-স্ত্রীর জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কিন্তু দাম্পত্যে প্রেমহীন তাপিত জীবন যাপনের দৃষ্টান্তও সমাজ ও সাহিত্যে অপ্রতুল নয়। কারণ আমাদের দেশে নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের আবেগ, সংবেদনশীলতা, ভালোলাগা-মন্দলাগা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে

অবহিত হবার পূর্বেই দাম্পত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের মধ্যে রুচির বৈষম্য, ইগো প্রব্লেম, আত্মমর্যাদাবোধ প্রভৃতি কারণে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। শুরু হয় দাম্পত্য-সমস্যার। দাম্পত্য-সমস্যার চিত্র বঙ্কিম-উপন্যাসে থাকলেও রবীন্দ্র উপন্যাসের সঙ্গে তার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে ঔপন্যাসিকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর যৌন-জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদঘাটন করেছেন মনোবিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে। তাঁর এই বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতির মধ্য দিয়েই বাংলা উপন্যাসে নববাস্তবতার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে উপন্যাসে ঘটনা প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে, চরিত্রের অন্তর্লোকের চিত্র উদঘাটনই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বিহারী আশাকে ভালবাসে — মহেন্দ্রের এই সামান্য অভিযোগকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিহারীর গোপন মনের খবর আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তার দৃষ্টান্ত 'চোখের বালি'-র পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নেই বললেই চলে। ''আশাকে বিহারী ভালোবাসে, এ-কথা যে এমন রূঢ় করিয়া, এমন গর্হিতভাবে মহেন্দ্র মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কারণ, সে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনো মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা বজ্রাহত হইল — তার পরে ক্রোধে ঘৃণায় ছটপট করিয়া বলিতে লাগিল, ''অন্যায় অসংগত, অমূলক।''

কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা দেখিবার উপলক্ষে সেই যে একদিন সূর্যাস্তকালে বাগানের উচ্ছ্বসিত পুষ্পগন্ধপ্রবাহে লজ্জিতা বালিকার সুকুমার মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অনুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বুকের কাছে কী যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। দীর্ঘরাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া, বাড়ির সম্মুখের পথে দ্রুতপদে পায়চারি করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। যাহা সংযত ছিল তাহা

উদ্দাম হইল; নিজের কাছেও যাহার কোনো প্রমাণ ছিল না, মহেন্দ্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত করিয়া দিল।''[৩৯]

আমরা জানি আশার সঙ্গে বিহারীর বিবাহ সম্বন্ধের কথা হয়েছিল। তারপর মহেন্দ্রের সঙ্গে আশার বিয়ে হলে ঐ প্রসঙ্গটি বিহারীর সচেতন মন থেকে অপসারিত হয়। যদিও আশার প্রতি একধরনের স্নেহ-দুর্বলতা তার ছিল। বিহারী নিজেকে শুধুমাত্র আশার শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই মনে করত। অন্য কোন গর্হিত সম্পর্কের কথা তার সচেতন মনের সামান্যতম স্থানও দখল করতে পারে নি। কিন্তু মানুষ কি তার মনের সব খবর জানে ? জানে না। তাই ঘটে অঘটন। সৃষ্টি হয় সমস্যা-সঙ্কটের। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য সমস্যায় জড়িয়ে যায় বিহারীর নাম।

মহেন্দ্রের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব ছিল; এর মূলে মা রাজলক্ষ্মীর বল্গাহীন সন্তান-স্নেহ। তার পদস্খলনের জন্য মায়ের স্নেহান্ধতা ও স্ত্রীর চূড়ান্ত আনুগত্যও পরোক্ষভাবে দায়ী। আশা ব্যক্তিত্বহীনতার জন্য মহেন্দ্রর কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করে। এরপর দেখা যায়, সদ্য বিবাহিত মহেন্দ্র সাংসারিক দায়িত্ব কর্তব্য একপ্রকার ভুলে তাকে নিয়েই প্রেমের স্বর্গ রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে পুত্রের প্রতি মায়ের একাধিপত্য কমতে থাকে। প্রবল ধাক্কা খায় মায়ের অধিকার বোধ। তবে পুত্র-পুত্রবধূর প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও মায়ের সচেতন মন কখনোই তাদের অমঙ্গল কামনা করেনি। অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে ক্ষোভ থাকলেও তিনি তাদের ক্ষমা করেন, '' আহা, বউ লইয়া মহিন সুখে আছে, সুখে থাক্ — যেমন করিয়া হোক সে সুখী হোক। বউকে লইয়া আমি তাহাকে আর কোনো কষ্ট দিব না।''[৪০] কিন্তু আমরা দেখি, একাধিপত্য ক্ষুন্ন হওয়ায় পুত্রবধূ আশার প্রতি রাজলক্ষ্মীর অবচেতন মনের বিরূপতাই তাকে প্রতিহিংসা পরায়ণা করে তুলেছে। মহেন্দ্র-আশার সুখের দাম্পত্যের সৌভাগ্যের ভরা ঘট রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনীর ঈর্ষার তুফানে তলিয়ে যায়— একথা বলাই যায়। 'মায়ের ঈর্ষা'-র জন্য মহেন্দ্রের কুৎসিৎ রিপু (Id বা আদস) দাঁত নখ বের করে দাম্পত্য-সম্পর্ককে ঘুলিয়ে তোলে। মহেন্দ্র-আশার-দাম্পত্য নষ্ট দাম্পত্যে পর্যবসিত হয়। রাজলক্ষ্মী তাঁর গোপন মনে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা ঈর্ষা

বা হিংসাপ্রবৃত্তির কথা নিজেও উপলব্ধি করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষার মধ্যেই তাঁর ' আঁতের কথা' তুলে ধরেছেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না বিনোদিনীর উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে — " নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কখনও তোমার বউ-এর উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই ? "[৪১] বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে তাঁর ঐ ঈর্ষা সম্পর্কে সচেতন না করলে তিনি হয়তো তার মনের গোপন অভিসন্ধির কথা জানতেও পারতেন না। ঔপন্যাসিক রাজলক্ষ্মী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মনের গভীরে যে বিচিত্র-জটিল কর্মকান্ড সংঘটিত হয় তার সম্পর্কে ব্যক্তি নিজেও সবসময় সচেতন থাকে না। অথচ তার নির্জ্ঞান বা গোপন মনের অঙ্গুলি হেলনেই তার আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি যা ভাবে কখনো কখনো তার বিপরীত আচরণও করে থাকে। তাই দেখা যায় মহেন্দ্রের প্রতি মায়ের স্নেহের ছদ্মবেশ ধরে রাজলক্ষ্মীর মনের আত্মপ্রীতির প্রকাশ ঘটে ; আবার পুত্রবধূ আশার প্রতি ঈর্ষার জন্য পুত্রের সর্বনাশ সাধনের অভিপ্রায়ও তাঁর সচেতন মনের অজান্তে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। রাজলক্ষ্মী, আশা ও বিনোদিনীর ভ্রান্ত ধারণার ফলেও মহেন্দ্র-আশার-দাম্পত্যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ প্রসঙ্গে শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে — "রাজলক্ষ্মী তাঁহার ছেলেকে সাধারণ মায়ের অপেক্ষা অধিক নিকট করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি ছেলেকে ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ছেলে যখন আশাকে লইয়া পড়িয়াছে, তখন সন্দেহ করিয়াছেন ইহা অন্নপূর্ণার চক্রান্ত, যখন সে বিনোদিনীর জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, তখন মনে করিয়াছেন, বৌকে ছাড়িয়া ছেলে থাকিতে পারিতেছে না। আশার ভুলের তো সীমাই নাই। সে তাহার সখী ও স্বামীকে খুবই ভালবাসিত। কিন্তু তাহার সখী কেন তাহাকে 'চোখের বালি' বলিয়া ডাকিত এবং তাহার স্বামীর সঙ্গে সখীর যে কি সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল ইহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। ইহাদের পরিচয় সে সংঘটন করাইয়া দিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্য হয় তাহার জন্য সে চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু এই পরিচয়ের ভিতরকার খবর সে কিছুই অনুধাবন করিতে পারে নাই। বিনোদিনী আশা অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও কৌশলী ; কিন্তু তাহারও চালে ভুল হইয়াছে। আশা তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে মনে করিয়া ঈর্ষাপরায়ণ রমণী সর্ব্বত্র আশার জয় দেখিতে

পাইয়াছে; প্রখর বুদ্ধি সত্ত্বেও সে বুঝিতে পারে নাই যে আশার প্রতি বিহারীর স্নেহ থাকিতে পারে কিন্তু প্রেম নাই। সব জানিয়াও সে এই ভুল না করিলে অনেক অনর্থ ও অশান্তির সৃষ্টি হইত না।''[৪২]

ভ্রান্ত ধারণা ছাড়াও হীনমন্যতা ও সরলতা আশার ব্যক্তিত্বে প্রকটিত হতে দেখা যায়। সাংসারিক কাজকর্মেও আশার দক্ষতার অভাব ছিল। মাতৃ-পিতৃহীন আশালতা আবাল্য জ্যাঠামশায়ের আশ্রয়ে মানুষ হয়। এর ফলে এক ধরণের হীনতাবোধের ধারণা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উচ্চ শিক্ষিত ধনবান মহেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় জ্যাঠামশায়ের অধীনতা থেকে সে মুক্ত হতে পেরেছিল, কিন্তু হীনতাবোধের ধারণার জন্য প্রথম দিকে সে মহেন্দ্রের প্রেমে সপ্রতিভভাবে সাড়া দিতে পারে নি। বরং স্বামীর প্রতি তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবোধ হীনমন্যতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। সারল্যের জন্য বিনোদিনীর দেওয়া চোখের বালি নামটিকে সে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল। নামটির অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে ভাবিত হয়নি। আবার তাদের বাড়িতে থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিনোদিনী যখন বলে, ''গায়ের জোর আর ভালবাসা কি একই হইল।''[৪৩] তার উত্তরেও আশা সহমত পোষণ করেছিল। এরপর মহেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বিনোদিনী তাদের বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করে—'' ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কষ্ট হইবে, সে তো আমার সৌভাগ্য। কী বল ভাই চোখের বালি, সংসারে এমন সুহৃদ কয়জন পাওয়া যায়। তেমন ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী, অদৃষ্ট গুণে যদিই বা পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইব কেন।''[৪৪] এর পরেও আশালতা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সখীকে বলে, ''তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই। আমার স্বামীতো হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থামো।''[৪৫] আশার এই ধরণের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত না হলেও তার পূর্বাপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তার হীনতাবোধ, আধুনিক শিক্ষার অভাব ও অতি সরলতা, বিনোদিনীর প্রতি নির্ভরশীলতা, নারী পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অভাব — প্রভৃতি বিষয়গুলিকে দাম্পত্যে সমস্যা সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ধরা না গেলেও অবশ্যই সেগুলি সমস্যা সৃষ্টির পরোক্ষ কারণ। যার পরিণামে বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের মনে উদ্দাম প্রেমাকাঙ্ক্ষা

জেগে উঠেছিল এবং এক সময়ের মাতৃভক্ত ও স্ত্রৈণ মহেন্দ্র মা ও আশার প্রতি তার কর্তব্যবোধ ভুলে বিনোদিনীর পিছনে চরকির মতো ঘুরে বেড়িয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অবশ্য বলা প্রয়োজন তার সঙ্গে বিনোদিনীর প্রেম-প্রেম খেলাকেই মহেন্দ্র প্রেম বলে ভুল করেছিল। শুধু তাই নয়, তার মোহিনী মায়ায় আসক্ত হয়ে আরও এমন কিছু ভুল করে সে যার ফলে মহেন্দ্র-আশার সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি হয়— " তাহার ভুল গণনাতীত। সে আজন্মবন্ধু বিহারীর অকপট বন্ধুত্বকে চিনিতে পারে নাই, আর সদ্যপরিচিতা মায়াবিনীর উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারে নাই। মহেন্দ্র ও বিনোদিনী — উভয়েই উভয়কে ভুল বুঝিয়াছে। বিনোদিনী জানিত না যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য আসক্তি জাগান যায় ; কিন্তু সেই আসক্তি জাগিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সে তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার চায়। মহেন্দ্র বুঝিতে পারে নাই যে, বিনোদিনী মায়াই বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, ইহার অতিরিক্ত কিছুই দিতে সে প্রস্তুত নহে। যখন সে তাহার সঙ্গে যাইতে রাজি হইয়াছে তখনও বিহারীর নিকট হইতে প্রত্যাখ্যান পাইয়াই সে রাজি হইয়াছে, অথবা ইহা মনে করিয়াছে যে মহেন্দ্রের আশ্রয় বিহারীকে পাইবার সোপান মাত্র।"[৪৬]

আশার দাম্পত্য-সুখের কথা বিনোদিনীর অবচেতন মনের প্রেম-বাসনাকে জাগ্রত করে। উপন্যাসটিতে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণী আলোকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবি বিনোদিনীর নিজ্ঞান মনের দ্বন্দ্বকে নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তাতে বিনোদিনী হয়ে উঠেছে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। উপন্যাসে মহেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ-বিকর্ষণ, পারিপার্শ্বিক অবলম্বনহীনতার জন্য অসহায়তাবোধ, প্রথমদিকে বিহারীকে অবলম্বন করে তার বেঁচে থাকার বাসনা এবং শেষে তার প্রতি বিনোদিনীর গভীর ভালবাসার প্রকাশ ঘটায় উপন্যাসটিকে ঘিরে প্রবল বিতর্কের ঝড় ওঠে। কিন্তু ঔপন্যাসিক তাকে এমন ভাবে সৃজন করেছেন যে ঝড়ের অভিঘাত তার চারিত্রিক আভিজাত্যকে ধুলোয় মেশাতে পারে নি। মহেন্দ্র ও বিহারী — এই দু'জনের মধ্যে কোনো একজনের কাছে বিনোদিনী নিজেকে সমর্পণ করবে। কিন্তু তার এই জীবনসঙ্গী নির্বাচনের বর্ণনা যেভাবে উপন্যাসে রয়েছে তাতে তার ঘটনাবহুল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে ওঠার দিকটিই উদ্ভাসিত হয়।

প্রথমদিকে বিনোদিনীর প্রেম-জীবন তথা যৌন-জীবনের মানস জটিলতা মনস্তত্ত্বের বহুবল্লভতার কামনা (Polymorphous perverse) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। পরে অবশ্য তার ঐ মানসিকতার উত্তরণ ঘটেছে। মহেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় উভাবেগতত্ত্ব (Ambivalence theory) বা ব্যক্তির দ্বৈত মানসিকতার কথা। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী ভালো না বাসলেও দেখা যায়, তাকে কেন্দ্র করে বিনোদিনীর মনে আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। তার ঐ ধরণের আচরণের মূলে রয়েছে নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া। 'চোখের বালির' মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক অভিনব রচনাশৈলী প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল —" চোখের বালি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে একটি নূতন ধারা বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহা আজ সর্ববাদীসম্মত। লেখক স্বয়ং ইহার বৈশিষ্ট্য যে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহা নহে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা মনের দ্বন্দ্বলীলা নিবিড় হইয়াছে। এতবড়ো উপন্যাস, চরিত্রসংখ্যা অল্পই — মহেন্দ্র, আশা, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ক্ষীণভাবে সংলগ্ন। এই কয়টি মাত্র চরিত্রের মধ্যেই সংগ্রাম চলিয়াছে অহর্নিশি।... নরনারীর যৌন-আকাঙ্ক্ষা-অধ্যুষিত সমস্যা ও সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের প্রধানতম বিষয়বস্তু।"[৪৭]

'চোখের বালি'-তে বিধবা বিনোদিনীকে দেখা যায়, চড়িভাতিতে গিয়ে অনাত্মীয় বিহারীর কাছে হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতে ; মহেন্দ্রর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে বিহারীকে স্মরণ করে বাসর রচনা করতে। সমকালীন বিধবাদের বৈধব্য-সংস্কার বিনোদিনীর মনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে নি। মৃত স্বামীর অস্পষ্ট স্মৃতি আঁকড়ে যৌবনধর্ম অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ছিল তার তীব্র অনীহা। তাই তার চেতন মন যৌবন-উপভোগের বাসনাকে সেইভাবে অবদমন করতে চায় নি। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে আধুনিক শিক্ষার দ্বারা কালের যোগ্য করে তুলেছেন। তাই সমাজ তাকে তার প্রাপ্য জীবন থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেই সে অবনত মস্তকে সামাজিক বিধানকে মেনে নেয় নি। সুখ-সমৃদ্ধময় প্রাপ্য জীবন হতে বঞ্চনার ক্ষোভ থেকে তার মধ্যে জেগে উঠেছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিহিংসা-বাসনা। তার আত্মপ্রতিষ্ঠার

আকাঙ্ক্ষাই তাকে সেকালের আর পাঁচজন বিধবার থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তার চরিত্র অসামঞ্জস্যপপূর্ণ — এমনটি ভাবার অবকাশ এনে দিয়েছে। বিনোদিনীর আচার আচরণ, কথাবার্তা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, জীবন-বাসনা, সর্বোপরি তার ব্যক্তিত্ব তৎকালীন সমাজের বিধবাদের মতো নয়, একথা সত্য। তা বলে বিনোদিনী চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিভূমিকে দুর্বল ভাবারও কারণ নেই। কেননা উপন্যাসে শুধু বাস্তব জীবনের ছবিই প্রতিবিম্বিত হয় না, মানব জীবনের সম্ভবপরতার দিকটিও প্রতিফলিত হয়। বিনোদিনী যদি পরম্পরাগত বৈধব্যকেই জীবনের ধ্রুবসত্য হিসেবে মেনে নিয়ে আমাদের দেখা পরিচিত বিধবাদের একজন হয়ে উঠত, তাহলে যে বক্তব্যের জীবনায়নের জন্য তার শিক্ষা-দীক্ষা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। তৎকালে যে বিধবারা সমাজ-সংসারে ঘুরে বেড়াত, তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তেমন ধারণা ছিল না— এমনটি নয়। রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, ক্ষেমঙ্করী, হরিমোহিনী তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু বিনোদিনী বিধবা হলেও তার সাজ-সজ্জায়, সংস্কার-বিশ্বাসে, কথা-বার্তায় সর্বোপরি জীবন-ভাবনায় বৈধব্যের কোনো লক্ষণই প্রকাশিত হয় নি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপে এদেশের নারী বিশেষ করে বিধবা মেয়েরা বিনা বেতনের দাসীত্বকে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম বলে মেনে নেবার রীতিকে পরম্পরাগতভাবে মান্যতা দিয়ে এসেছে। বিনোদিনী তার আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন — " আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণমূল্য দাবি করেছে। ... সম্পূর্ণ ব্যক্তি বিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য।"[৪৮]

রবীন্দ্রনাথের কৈশরেই স্ত্রী-স্বাধীনতার এক ধরণের ধারণা বঙ্গসমাজে চালু হয়ে গেছে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা 'স্ত্রী স্বাধীনতার দল' হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা ১৮৭২-৭৩ সাল থেকে স্ত্রী শিক্ষার স্বার্থেই যে শুধু সংগঠিত কাজ করেছিলেন তাই নয়, ১৮৭৮ সালে একটি 'ঘননিবিষ্ট দল' সৃষ্টি করে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতিকে তার একটি আবশ্যিক শর্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারও (Universal Suffrage) নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়।

পালাবদলের উপন্যাসে বিনোদিনী তাই বিধবা বা দাসী হিসেবে নয়, নারী ব্যক্তিত্বের অধিকারে বা সমাজের একজন মানুষ হিসেবেই সে তার প্রাপ্য মর্যাদা দাবী করেছে। মহেন্দ্র, বিহারী — এদের কাছে উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার ক্ষোভের আগুন চারপাশে ছড়িয়েছে এবং নিজেও সেই আগুনে দগ্ধ হয়েছে — " বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাশতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে ! দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ! প্রতিকূল ভাগ্য-বশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহত ভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহার মূর্তি ধরিল।"[৪৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিনীর মতো জীবন-যৌবন উপভোগ করবার সুতীব্র বাসনা বিনোদিনীর ছিল — একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জীবন-তৃষ্ণার ক্ষেত্রে রোহিনীর মতো দাহ ও ঈর্ষার মনস্তত্ত্ব বিনোদিনী চরিত্রের শুরুতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে —" ক্ষুধিত হৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।"[৫০] কিন্তু এই দহন-ই বিনোদিনী চরিত্রের শেষ কথা নয়। নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯৭৮) -এ রোহিনী চরিত্রের যে উত্তরণ ঘটাতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ উদার মানবতাবাদের আলোকে বিনোদিনীর সেই উত্তরণ দেখিয়েছেন তাকে তার নিজ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। ভালোবাসার জন্য এবং ভালবাসার পাবার জন্য বিনোদিনীর হৃদয় ব্যাকুল। মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর ভালোবাসা লাভের প্রত্যাশায় সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু মহেন্দ্রর ভালবাসা পেলে জীবন চরিতার্থ হবে, বিনোদিনী এমন ভাবে না। আপন ব্যক্তিত্বে স্বাবলম্বী হওয়ায় বিনোদিনী মহেন্দ্রর

ভালবাসার মধ্যে লুকানো ফাঁকি ধরে ফেলতে পারে। তেত্রিশ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে তার যুক্তিবোধ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে; শুধু তাই নয়, চিঠিতেও তার ব্যক্তিত্ব-আত্মসম্মানবোধ ও হৃদয়বত্তার পরিচয়ও ধরা পড়েছে — " আমার কাছে কি চাও তুমি। ভালবাসা ? তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই।

'জগতে আমার ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার কোনো স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটি কি ফুরায় না। ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উঁকিঝুঁকি কেন। এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার তো ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া খেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

'তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাস। খেলার বেলায় সে-কথা শোনা যাইতে পারে — কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও-কথা বিশ্বাস করি না। এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ, সেও মিথ্যা ; এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাসো।

'ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে — সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্জ হইয়া আমাকে লজ্জা দিও না। আমার খেলার শখ ও মিটিয়াছে ; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ — সে-কথা সত্য হইতে পারে ; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে — তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। "[৫১] অথবা, "মহেন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করে, ইহাতে বিনোদিনীর গর্ব ও সুখ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা, রুগ্নামাতার শয্যাপার্শ্বেও লুব্ধ হৃদয়ে বসিয়া থাকা — ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘৃণাবোধ হইত।"

আসলে বিনোদিনীর শিল্পীজনক তাকে 'ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের' খাতিরে যে রকম বিধবাদের সচরাচর আমরা দেখে থাকি তাদের মতো করে সৃষ্টি করেন নি। কেন না, বৈধব্য সত্য হলেও বৈধব্যের সংস্কার চিরকাল এক থাকে না। স্থান কাল ভেদে সংস্কারের বদল ঘটায় স্বাভাবিক। তাই বিনোদিনী চরিত্রটিকে বাহ্যিক দিক থেকে দেখে বা সমকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকতার দৃষ্টিতে তার গহন মনের গভীরে আলোক ফেলে বিচার করলে তার চারিত্রিক গঠনে পূর্বাপর সঙ্গতি ধরা পড়ে। যেহেতু মানুষের মৌলিক চাহিদা বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের ভালবাসার এবং ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা স্থান কাল ভেদে সর্বত্রই প্রায় সমান।

তাই আমরা বলতে পারি, 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর পরিণাম অসংগত হয়নি। মহেন্দ্র আশার প্রতি তার ক্ষোভ-বিক্ষোভ, বিরাগ-বিদ্বেষ, বিহারীর প্রতি প্রেমের আকর্ষণ ও তার প্রেমের আলোকে বিনোদিনীর উত্তরণ তার চারিত্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে প্রেক্ষাপটে বিনোদিনী চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিহারীর সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই তার পরিণাম হয়ে উঠত অসংগত। বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়েছিল তার প্রতি প্রেমের আকর্ষণে নয়, নিজের ভালবাসার পাত্র ঘর-ছাড়া বিহারীর খোঁজেই — বিহারী তার সেই অভীপ্সা প্রথমে ধরতে পারে নি। কিন্তু বিনোদিনী বিহারীকে তার মনের কথা জানিয়ে দেয়, অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করে। এরপর দেখা যায় — প্রেমে, শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে বিহারী তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। বিনোদিনী বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তার বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখানকে শিল্পীর পশ্চাদ্‌পসারণ বললে ভুল হবে। কারণ, বিহারীর সঙ্গে বিবাহের বাধা ছিল বিনোদিনীর আত্মচেতনায়, বৈধব্য-সংস্কারে নয়। জীবনে অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে শেষে একদা বিহারীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাতা বিনোদিনী যে উপযাচিকা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে তা সে হারাতে চায় নি। কারণ তাদের তাপিত দাম্পত্য বিনোদিনীর নিন্দিত জীবনের অনপনেয় স্মৃতির দ্বারা কলুষিত হবার সম্ভবনা ছিল অধিক। এই জন্য বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখানে তার যুক্তি — "আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে শিক্ষা যদি

ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি — এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।"[৫২] — বিনোদিনীর এই যুক্তিকে রোমান্স বা নীতিবচন বলা উচিত নয়। তার যুক্তি বা সিদ্ধান্তের মূলে আছে অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা, নবজাগ্রত রুচি ও তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অনেকে মনে করেন বিহারী ও বিনোদিনীর প্রেমকে ঔপন্যাসিক কোনো চরম পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারেনি; অনেকের আবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ — তিনি উপন্যাসে বাস্তবতাকে সাহস ভরে প্রকাশ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যৌন বিচার প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া এক শ্রেণীর লোকের নিকট নিন্দভাগী ইহয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই শ্রেণীর নগ্ন আলোচনা সমাজের স্বাস্থ্যহানিকর। আবার আর এক দল মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ সাহসের সহিত কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মসমাজীয় নীতিবোধ নায়ক-নায়িকাদের উপর প্রয়োগ করিতে গিয়া তাহা কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে। বিহারী ও বিনোদিনীর প্রেমকে কোন চরম পরিণতিতে উত্তীর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া অধিকাংশের আক্ষেপ। এই শ্রেণীর সমালোচকদের মতে রবীন্দ্রনাথ দুর্বলভাবে চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করিয়াছেন, বাস্তবকে সাহসভরে প্রকাশ করিতে পারেন নাই; কিন্তু যাঁহারা রবীন্দ্রসাহিত্য স্থিরভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্মবোধ হইতে কখনো তাঁহার শিল্প-সৃষ্টিকে লালসার পঙ্কে নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই ; উপন্যাসের মধ্যে তিনি নায়ক-নায়িকাদিগকে সেই পঙ্কশয্যায় নামাইতে সংকোচ বোধ করিতেন ; সেটিকে ভীরুতা অপবাদ দেওয়া যায় না, সেটি মার্জিত চিত্তের সুরুচিমাত্র।"[৫৩] 'চোখের বালি' উপন্যাস সম্পর্কে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যটিই আমাদের যথার্থ বলে মনে হয়।

চতুরঙ্গ ঃ

১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন — এই চার মাস ধরে 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকায় 'চতুরঙ্গ'- এর চারটি অঙ্গ ('জ্যাঠামশায়', 'শচীশ', 'দামিনী' ও

শ্রীবিলাস) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩২৩ সালের ভাদ্র মাস। এটি 'গোরা' উপন্যাসের মতো আয়তনে সুবৃহৎ নয়। কাহিনির শুরুতে এটি যে ছোটো গল্পরূপে পরিকল্পিত হয়েছিল, সেকথাও সর্বজন বিদিত। উপন্যাসটির আয়তন ক্ষুদ্র হলেও সংহত ; আবার রবীন্দ্র-উপন্যাস সাহিত্যের সবচেয়ে বিতর্কিত উপন্যাসও বটে। নর-নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধগত সমস্যার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে যৌবনোন্মেষের কাল থেকেই ভাবিয়ে তোলে। পরিণত বয়সে ঐ সমস্যার, বিশেষ করে নারী পুরুষের পরস্পর নির্ভরশীলতার যে সামাজিক সম্পর্ক তা তাঁর সংবেদনশীল মনকে আরো বেশি আলোড়িত করে। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর মানস-ব্যবধান জনিত নিঃসঙ্গতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মর্মান্তিক পরিচয়ের সংখ্যাধিক্য । স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর মর্মান্তিক পরিচয় ছাড়াও 'চতুরঙ্গ' রচনার কাল-পর্বের মধ্যেই তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন বড়মেয়ে মাধুরীলতা ও কনিষ্ঠ কন্যা মীরা-র দাম্পত্য সংকটের নানান জটিলতাকে। স্বামীর অশোভন ব্যবহার, অসংযত ও নিষ্ঠুর আচরণের জন্য মীরাদেবীর দাম্পত্য জীবন তো অশান্তির আগুনে ভরা ছিল। অশান্তির আগুন এতটাই তীব্র ছিল যে, তার দাহ সহ্য করতে না পেরে তিনি ছেলে মেয়েদের নিয়ে পিতার কাছে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মীরাদেবীর সন্তানেরা তাদের পিতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখলেও মীরাদেবী স্বামীর সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখেন নি। মানসিক বিচ্ছিন্নতার ফলে একাকীত্বের মর্মান্তিক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে স্বামী বা স্ত্রীর বেঁচে থাকার কষ্টকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি উপন্যাসে এই জটিল সমস্যার দিকটি ফুটে উঠলেও রবীন্দ্র উপন্যায় ধারায় চতুরঙ্গ-এর স্থান স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ এখানে শিবতোষ ও দামিনীর দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে অসুখী দাম্পত্যের রূঢ় বাস্তব পরিচয় খুব সংক্ষেপে হলেও বর্ণনা করেছেন; অন্যদিকে 'জ্যাঠামশায়' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে জগমোহনের মুখ দিয়ে আনন্দময় সুখী-দাম্পত্যের জন্য বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর 'মন জানা জানির' বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আবার দামিনীর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার দ্বিতীয় দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনাকে উপন্যাসের পরিসমাপ্তির মূল মঞ্চ তৈরী করেছেন। দামিনী ছাড়া ননিবালা এবং নবীনের স্ত্রীর

দাম্পত্য প্রসঙ্গও উপন্যাসের গতিমুখ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের কাহিনীর গতিমুখ পরিবর্তিত হয়েছে কোনো না কোনো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ননিবালা, নবীনের স্ত্রী এবং দামিনীর মৃত্যু যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দাম্পত্যের গভীর অসুখের বিষময় পরিণতিকেই তুলে ধরেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রিঃ) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মানব মনের কারখানা ঘরে নেমে 'আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি'-র মধ্য দিয়ে আঁতের কথা টেনে বের করেছেন, তেমনটা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে খুব একটা ঘটেনি। কারণ, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত করার জন্য উপন্যাসে যথেষ্ট পরিসরের প্রয়োজন। চতুরঙ্গ-র সুসংহত আয়তন এবং পরিসরের স্বল্পতা বিস্তৃতভাবে চরিত্রের অন্তর্লোকে প্রবেশের পক্ষে অপ্রতুল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঔপন্যাসিক সংকেতে ব্যঞ্জনায় চরিত্রকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহে বিদ্যুৎগতি প্রদান করেও ঘটনা ও চরিত্রের গতি প্রকৃতির কার্যকারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খলা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচক নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন — "...'চতুরঙ্গ' বা 'শেষের কবিতা' বিবরণধর্মী উপন্যাস নয়। নিছক রসসমৃদ্ধ বিবৃতির স্তরের ঊর্ধ্বে উঠিয়া লেখক বুদ্ধির স্তর হইতে ইঙ্গিতে সংকেতে ব্যঞ্জনায় হ্রস্ব সূত্রাকারে ঘটনা ও চরিত্রের গতি পরিণতির আভাস মাত্র দিয়াছেন। যাহা ঘটিতে অনেক সময় লাগিয়াছে, অনেক খড়কাঠ পুড়িয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নাই ; এখানে একটি সরল, ওখানে একটি বক্ররেখা দিয়া লেখক কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, ইহার সঙ্গে একটু বুদ্ধি ও কল্পনা যোগ করিলেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই বুদ্ধি ও কল্পনাকে কোথায় কি ভাবে মুক্তি দিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত-সংকেত রাখিয়া যাইতে লেখক কোথাও ভুলেন নাই। গুহা-দৃশ্যটি পাঠককে স্মরণ করিতে বলি। কি অপূর্ব পরিবেশ-সৃষ্টি! কি অভিনব সংকেতময় ব্যঞ্জনায় রহস্যের অবতারণা! সেই 'আদিম জন্তুটা'র ধর্ম, তাহার গভীর অর্থ, তাহার পশ্চাতের সুদীর্ঘ অলিখিত ইতিহাস কি সবিস্তার বর্ণনার, কার্যকরণ-সম্বন্ধ-বিশ্লেষণের আর কোনও অপেক্ষা রাখে! শচীশের সঙ্গে দামিনীর যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্বন্ধ তাহার সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্বলীলাও লেখক সবিস্তারে বলেন নাই, কিন্তু

প্রত্যেক ভাব-পরিবর্তনেই দু' একটি ভাবগর্ভ বুদ্ধিদীপ্ত সংকেতময় সূত্রে যে-রহস্য-ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন, কার্যকারণ-সম্বন্ধে শৃঙ্খলা সেইখানে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই ধরনের সূত্র কত যে এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তাহার হিসাব করা যায় না। ইহারা যে কবিকল্পনায় সমৃদ্ধ তাহাই নয়, ইহারা এক একটি বিদ্যুচ্চমক; যেখানেই ঘটনা ও চরিত্রগুলি চোখের আড়ালে চলা-ফেরা করে, সেইখানেই ইহাদের ক্ষণিক দীপ্তি একমুহূর্তে সব কিছুকে আলোকিত করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়া দেয়, অন্যমনস্ক হইলেই এই সব বিদ্যুচ্চমক পাঠককে এড়াইয়া যায়, তখন মনে হয় ঘঠনাগুলি অসংলগ্ন, চরিত্রগুলি বাত্যাতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় উদ্দাম। বস্তুত, তাহা নয়।''[৫৪]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সমালোচনায় উপন্যাসটিকে কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (Fragmentary) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন — ''...সমস্ত বিষয়ে আলোচনা অপূর্ণ ও আংশিকতা-দুষ্ট। শচীশ ও দামিনীর দ্রুত পরিবর্তনগুলি যেন অনেকটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালেরই অনুবর্তন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটিকে অস্থির পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা বিবর্তিত করিতেছে। উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব সর্বত্রই পরিস্ফুট। মাঝে মাঝে বর্ণনা বা বিশ্লেষণে অপ্রত্যাশিত কবিত্বশক্তি ও মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।''[৫৫] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি সঠিক কিনা, সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও একথা বলা যায় যে, বিস্তৃত বর্ণনার পথে না হেঁটেও রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো তুলির টানে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে উত্তাল মানবমনের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ যাত্রাপথের ক্রমিক উন্মোচন করেছেন। বিশেষত, দামিনী ও শচীশ চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে। প্রথমদিকে উপন্যাস শচীশকে অনুসরণ করলেও উপন্যাসের অন্তিমে দামিনী বিদ্যুৎ-ফলার মতো ঝলসে উঠেছে। দামিনী-চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রের মানসলোক উন্মোচনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মূলত, দামিনীকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের উন্মোচন ও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সে মনের 'অন্ধকার গোপন কুঠরির' প্রেরণায় কামনাচঞ্চল। তাই তার মানস-উত্তাপে উপন্যাস নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

এমন কি উপন্যাসে প্রথাগত বাঙালি দাম্পত্যের অসুখী-অসম সম্পর্কের সীমা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত সে দাম্পত্যের আদর্শ সরণিতে পৌঁছেছে শুধুমাত্র মানস বিবর্তনের বক্র পথ ধরেই।

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় হল 'জ্যাঠামশায়'। এই অধ্যায়ের অবিসংবাদিত নায়ক অবশ্যই জ্যাঠামশায়। জ্যাঠামশায়ের পাশে আর সব চরিত্র যেন ম্রিয়মান। শচীশের জ্যাঠামশায়ের প্রকৃত নাম জগমোহন। ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে জ্যাঠামশায়ের জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রী বিলাস বলেছে "ইংরেজি ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি মেকেলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মত তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা।"[৫৬] উপন্যাসে জ্যাঠামশায়ের দাম্পত্য-জীবনের কোনো বর্ণনা নেই। অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার আর বিবাহ করেন নি। কেননা টমাস রবার্ট ম্যালথস (১৭৬৬-১৮৩৪)-এর দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দাম্পত্যের কোনো স্মৃতি জগমোহনের মনে জাগ্রত ছিল কিনা, তার উল্লেখ উপন্যাসে নেই। কিন্তু দাম্পত্যের আদর্শ সম্পর্কে তিনি যে অবহিত ছিলেন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি ননিবালার প্রসঙ্গে। শচীশের সঙ্গে ননিবালার বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়েছে অথচ শচীশের সঙ্গে ননিবালার আন্তরিক পরিচয় ঘটেনি। তাই জ্যাঠামশায় শচীশকে ডেকে বলেছেন — "বিবাহের পূর্বে নিরালায় একদিন ননির সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানা জানি হওয়া দরকার।"[৫৭]

স্বামী-স্ত্রীর 'মন জানাজানি'-র সম্পর্ক বাঙালি দাম্পত্যের বিরল ঘটনা। এখানে স্বামীর মন ও মত-ই শেষ কথা। পাত্রী বা স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব তৎকালে ছিল না বললেই চলে। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের একাধিপত্যের ছিদ্র পথেই শনি প্রবেশ করে স্বামী অথবা স্ত্রীর আত্মবিচ্ছেদ রূঢ় মর্মান্তিক পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়। অসুখী দাম্পত্যের এই দিকটি উপলব্ধি করেছেন বলেই জগমোহন শচীশ ও ননিবালার মধ্যে মানসিক যোগাযোগের সেতুটি মজবুত করতে চেয়েছিলেন। জগমোহনে অনুজ হরিমোহন কিংবা শচীশের দাদা পুরন্দরের মধ্যে এই উপলব্ধির অভাব-ই তাদের জগমোহনের থেকে পৃথক করেছে। সমাজের চোখে নষ্ট, কুলটা

মেয়ে ননিবালাকে একারণেই স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের এত কুন্ঠা। অথচ নাস্তিক জগমোহন সেই সমাজ-অস্পৃশ্যা নারীকেই জগৎমাতার আসনে বসিয়েছেন। জগমোহন ননিবালাকে অকপটে জানাতে পারেন —"মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল ; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।"[৫৮]

উপন্যাসে দেখা যায়, জগমোহন সুমহান চারিত্রিক গুণে বলীয়ান। নবজাগ্রত মানবতাবাদের যে ঢেউ ইউরোপে থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের জনমানসে আছড়ে পড়েছিল, জগমোহন তারই স্বর্ণ-সন্তান। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধন' ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এই ব্রত-ই তাঁর জীবনের চালিকাশক্তিও বটে। এই কারণেই তাঁর সমস্ত কাজ কর্মের অনুপ্রেরণার কারণ ব্যাখ্যায় সক্রিয় মনস্তত্ত্বের সূত্র অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন থাকে না। পুত্রাধিক প্রিয় শচীশের সাথে সমাজের চোখে পতিতা ননিবালার বিবাহে জগমোহনের উদার মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। হরিমোহনকে জগমোহন এ প্রসঙ্গে জানিয়েছে — "শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিয়াছি ; আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।"[৫৯] জ্যাঠামশায়ের মানস পুত্র শচীশ সমাজ-সেবার মানসিকতাতেই ননিবালাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপনের মানসিকতা তার আচরণে ধরা পড়ে নি। বরং ননিবালাকে উদ্ধার করার কর্তব্য পালনের ইচ্ছাই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে এক্ষেত্রে। শচীশ পিতা হরিমোহনকে জানিয়েছে — " কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।"[৬০] উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে দামিনীর প্রতি মোহ ও আকর্ষণ অনুভব করলেও শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কিত নির্মোহ মনোভাবই শচীশকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেয় নি।

পুরন্দর পাশবিক লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে ননিবালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে লিপ্ত হলে ননিবালা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কিন্তু ননিবালা পুরন্দরের সমাজ-স্বীকৃত স্ত্রী নয়। তাই, তাদের কলঙ্কিত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জ্যাঠামশায় ও শচীশ এক গভীর সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। পুরন্দর শচীশের বড়দাদা। হরিমোহনের এই

জ্যেষ্ঠপুত্র সর্বার্থেই বখে যাওয়া ছেলে। ''হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন।''[৬১] ফলে ''পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।''[৬২] পুরন্দর ইদ্ (Id) বা অদসের প্রভাবে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হয়। দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে বিষময় হয়ে ওঠে, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরন্দরের স্ত্রী স্বামীর পর-দার গমনে বাধা দিলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হরিমোহন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলতেন, ''ঘরে তার উৎপাতেই তার ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।''[৬৩] স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ তথা অসুখী দাম্পত্যের কারণেই পুরন্দরের স্ত্রী পুরন্দরের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছে। কেননা পুরন্দর তার কাছে আপদ। শচীশ ননিবালাকে বিবাহ করলে পুরন্দর আত্মহত্যা করবে, এমন কথা প্রচারিত হলে তার স্ত্রী বিদ্রূপের সঙ্গে জানিয়েছে, ''তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না।''[৬৪]

পুরন্দর, শচীশ বা জ্যাঠামশায় জগমোহনের মতো চরিত্রবান নয়। বরং পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূরূপে সে বিশ্বাস করে নারী পণ্য মাত্র। তার কাছে নিজের স্ত্রীর মতোই অন্য কোনো নারীরও কোনো মর্যাদা নেই। তাই ননিবালার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে পথভ্রষ্ট করতে সে পিছপা হয় নি। ননিবালা বিধবা মায়ের সঙ্গে এসে উঠেছিল তার মামা বাড়িতে। ননিবালাও বালবিধবা। তার ''মামাতো ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননিবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল।''[৬৫] পরে ননিবালা সন্তান-সম্ভবা হলে একরাতে তাকে পরিত্যাগ করে সেই পাপিষ্ঠ। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে আমরা ঘটনাচক্রে জেনেছি যে, ননিবালার এই চরম সর্বনাশ করেছে শচীশের দাদা পুরন্দর।

ননিবালা পুরন্দরের বিবাহিত স্ত্রী নয়। তাই তৎকালীন সমাজ ননিবালাকে পুরন্দরের স্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি দেয় নি, দেয়নি কোনো আইনি অধিকার। ভোগবাসনা চরিতার্থ করার পর ননিবালার কোনো দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়নি পুরন্দরের উপর। বরং ননিবালার উপর এক আদিম দাবি থেকে যায় পুরন্দরের। শচীশের সঙ্গে ননিবালার বিবাহের প্রসঙ্গ এ কারণেই পুরন্দর মেনে নিতে পারে না। ননিকে পুরন্দর

প্রতারণা করেছে। পুরন্দর ননিবালার স্বামীও নয়। তবু পুরন্দরের জন্যই সে কলঙ্কিনী, তার সামাজিক লাঞ্ছনার মূলেও রয়েছে পুরন্দর। সামাজিক বা আইনি স্বীকৃতিই দাম্পত্য-সম্পর্কের সব কথা নয়। ননিবালা নারীর স্বাভাবিক সংস্কার বশতই হয়তো পুরন্দরকে স্বামীত্বের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই জগমোহন ও শচীশের উদ্যোগে সে নতুন করে বিবাহিত জীবন উপহার পেতে চলেছে জেনেও সে শেষ পর্যন্ত বেছে নেয় আত্মহননের পথ। 'সুইসাইডাল নোট'-এ ননিবালা লেখে —"বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রী চরণে শতকোটি প্রণাম।"[৬৬] 'তাঁকে' বলতে ননিবালা যে পুরন্দরকেই বুঝিয়েছে, এ বিষয়ে পাঠক মাত্রেরই কোনো সংশয় থাকে না। ননিবালার মৃত্যু উপন্যাসে আকস্মিক কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। অবাঞ্ছিত হলেও মাতৃত্বের টানেই সে বেঁচে ছিল। কিন্তু মৃত সন্তান প্রসব করার পর তার কোনো পিছুটান ছিল না। কারণ, শচীশকে শ্রদ্ধা করলেও সে তাকে নতুন করে স্বামীত্বের আসনে বসাতে পারবে না। সনাতন ভারতীয় নারীর মতোই যে পুরুষকে সে অন্তরের সিংহাসনে বসিয়েছে সে প্রতারক হলেও তার স্মৃতি বঞ্চিতা নারীর হৃদয় থেকে অবলুপ্ত হয় না।

পুরন্দর ও ননিবালা কখনও বিধিবদ্ধ দাম্পত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হয় নি। কিন্তু নবীন ও নবীনের স্ত্রী সামাজিক মতে স্বামী-স্ত্রী। লীলানন্দ স্বামীর 'চেলা' নবীন শ্রীবিলাসের 'কীর্তনের দলের একজন গায়ক, লীলানন্দ স্বামীর রসের সাগরে নিমজ্জিত একজন ভক্ত বিশেষ। এহেন নবীনের দাম্পত্য জীবনে সংকটের ঘনঘোর দুর্যোগ নেমে আসে তার স্ত্রীর ছোট বোনকে কেন্দ্র করে। নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। এই রূপসী বোনের সঙ্গে নবীনের ভাইয়ের বিবাহ সম্বন্ধ একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। "এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে।"[৬৭]

এরপর দেখা যায় স্ত্রীর উদ্যোগে ঐ শ্যালিকার সঙ্গে নবীনের পুনরায় বিবাহ সম্পন্ন হয়। "বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা

করিয়াছে।''[৬৮] তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সতীনের সঙ্গে ঘর করা একেবারে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিল না। তবুও নবীনের স্ত্রী ক্ষোভে-দুঃখে আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার মূল কারণ হিসেবে নবীনের বহুবল্লভতার কামনা বা এক ধরনের মানসিক বিকৃতিকে দায়ী করা যায়। নবীনের স্ত্রী দাম্পত্যে বিশ্বাস-ভঙ্গের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত না হলে হয়তো শত অভাব-অনটনেও আত্ম-বিসর্জনের কথা ভাবত না।

উপন্যাসে দামিনী ও শ্রীবিলাসের দাম্পত্যের পূর্বসূত্র রচনা করেছে এই নষ্ট দাম্পত্য সম্পর্কগুলি। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসেই দাম্পত্যের গভীর অসুখের চরিত আখ্যাত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগের সেতু ভঙ্গুর হলে দাম্পত্য-সম্পর্ক একটা বড় প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিশ্বাসহীনতা দাম্পত্যের মাধুর্য নষ্ট করে। আর লোভ দাম্পত্যকে ঠেলে দেয় গভীর খাদে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে নষ্ট দাম্পত্যের সম্পর্কগুলি সেই সত্যই তুলে ধরে। একমাত্র ব্যতিক্রম দামিনী ও শ্রীবিলাস। দামিনী ও শ্রীবিলাসের দাম্পত্য-জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছেই শুধু নয়, বাংলার গৃহস্থ জীবনেও পরম কাঙ্ক্ষিত।

রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে দামিনী অতি-উজ্জ্বল এক চরিত্র। সংক্ষিপ্ত পরিসরের উপন্যাসে 'দামিনী' বিদ্যুৎ ঝলকের মতো চকিতে উদ্ভাসিত হলেও সে ক্ষণস্থায়ী নয়। বরং চারিত্রিক দৃঢ়তায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সে উপন্যাসের অন্যতম নিয়ন্ত্রা হয়ে উঠেছে। শিবতোষের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন, অকাল বৈধব্য, লীলানন্দ স্বামীর কাছে আশ্রয় লাভ, শচীশের সংস্পর্শে আসা এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া — এই ঘটনাগুলি উপন্যাসে অতি দ্রুত সংঘটিত হলেও রবীন্দ্রনাথ প্রতি মূহূর্তে দামিনীর কামনা-চঞ্চল মনের মনস্তত্ত্বকে ছুঁতে চেয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শচীশের আত্মিক উপলব্ধি, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের মার্গ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দামিনীই শাশ্বত বাঙালির দাম্পত্য সম্পর্কের 'চিরমধুর বন্ধন'কে শ্রেয় বলে স্বীকার করে নিয়েছে। শচীশের পরম বন্ধু শ্রীবিলাসও দামিনীর সঙ্গে একাসনে এসে বসেছে। লীলানন্দ স্বামীর আখড়ায় দামিনীকে প্রথম দেখে শ্রীবিলাসের উপলব্ধি-

''দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ, অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিতেছে।''[৬৯] শচীশের 'ডায়ারি'-র বয়ান অনুযায়ী 'সে জীবন রসের রসিক'। অথচ দামিনীর পূর্বজীবন একেবারেই সুখের ছিল না। বৈধব্যের আগে তার দাম্পত্যজীবন সমস্যায় জর্জরিত ছিল।

দামিনীর প্রথম স্বামীর নাম শিবতোষ। দামিনীর বাবা ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মেয়ে-জামাইয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু শিবতোষের মন অন্ধ ধর্মীয়সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, জ্যোতিষ শাস্ত্রে ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। তাই ''একজন গণৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতিবার কোন এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দ স্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।''[৭০] তার সংসার-বিমুখতার জন্যই 'যৌবনে গঠিতা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা' দামিনীর মানস-সঙ্গী সে কখনো-ই হতে চায় নি, হতে পারে নি। বিবাহের পর একটি মেয়ে যখন স্বামীকে একান্ত আপনার করে পেতে চেয়েছে, স্বামী তখন তার উত্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করার পরিবর্তে পুরুষতন্ত্রের জবরদস্তি প্রয়োগ করে স্ত্রীকে লীলানন্দস্বামীর ভক্তিমার্গে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেছে। শিবতোষের আচার ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত দামিনী লীলানন্দ স্বামীর উপদেশ শুনতে চায় না। কারণ, ঐ সময়ে তার বাবার ব্যবসায় চরম আর্থিক ক্ষতির ফলে বাবা এবং ছোটো ছোটো ভাইয়েরা উপবাস করে দিন কাটাচ্ছিল। শিবতোষ তাদের ঐ দুরবস্থার বিষয়ে উদাসীন ছিল, কিন্তু দামিনী ভীষণ চিন্তিত ছিল। সে বাবার দেওয়া সোনার গহনা বাবাকে ফিরিয়ে দিয়ে ঐ সংকট থেকে মুক্ত করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু শিবতোষ সোনার গহনা গুরুদেবকে নিবেদন করে দামিনীকে জানায় 'বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।' এইভাবে দামিনীর উপর '' ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে

হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া সে তরকারিতে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে — তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।''[৭১]

আর মৃত্যুর পূর্বে শিবতোষ তার স্ত্রী দামিনীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিলেন সমস্ত সম্পত্তি সমেত স্ত্রীকে লীলানন্দ স্বামীর হাতে সমর্পণ করে।

দাম্পত্য-সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর শিক্ষা-সংস্কার, রুচি-মানসিকতা অথবা চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বা সমন্বয়ের অভাব হলে সম্পর্কের বাঁধুনি শিথিল হয়ে পড়ে। শিবতোষ ও দামিনীর মধ্যে মানস-প্রবণতার দুস্তর ব্যবধান ছিল। যে কারণে বৈধব্য-জীবনে শিবতোষের স্মৃতি দামিনীকে কখনো ভারাক্রান্ত করে নি। বরং লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে আশ্রিতা দামিনী প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ করেছে যন্ত্রণাময় পূর্বস্মৃতির অগ্ন্যুৎপাতে। স্বামীর কাছ থেকে সঙ্গসুখ লাভ করেনি বলেই তার অচরিতার্থ কামনার জানালায় উঁকি দিয়েছে শচীশ। শচীশকে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে দামিনী। তাকে বরণ করেছে গুরুপদে। শচীশকে কেন্দ্র করেই তার কামনাকুসুম বিকশিত হতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শচীশের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে সাংসারিক জীবনবৃত্তে।

অন্যদিকে শ্রীবিলাস শচীশের অন্ধ সমর্থক। শচীশের জীবন বৃত্তান্তে নিজের দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসৎ সে কখনই পায় নি। দামিনী রূপসী, কিন্তু তার রূপের ঝলক শ্রী বিলাসকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। আসলে, দাম্পত্য-জীবনে স্বামী শিবতোষের আধ্যাত্মিক ভাবনা এবং ঐ ভাবনায় লীলানন্দ স্বামীর ঘৃতাহুতির ফলেই দামিনীর কামনা-বাসনা অবদমিত হয়েছিল। তাই শচীশের জীবন-বিবিক্ত যে অরূপের সাধনা, যা জীবন তথা যৌবন-ধর্মকে অস্বীকার করে — দামিনী তাকে মেনে নিতে পারেনি। শচীশকে খুব কাছ থেকে দেখা এবং জানার ফলেই দামিনী শেষপর্যন্ত বুঝতে পারে যে, শচীশও শিবতোষের মতোই 'কেবল মন লইয়া থাকে' শরীরের অভিভাবক নারীদের 'চোখেই দেখিতে পায় না।' আর দেখলেও 'এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি।' তাই শচীশ কখনোই যথার্থ জীবন-সঙ্গী হতে পারবে না। দামিনী তার ঘটনা বহুল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যবোধের আলোকে

শ্রীবিলাসের হৃদয়ের কোমল অংশটিকে দেখতে ও চিনতে পেরেছে। তাই তার প্রস্তাবের সঙ্গে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছে। ''দামিনীর চরিত্রে প্রথম দিকে ছিল কামনার চঞ্চলতা। সে চঞ্চলতা শান্ত হয়েছে শচীশের আঘাতে। তখন সে তার উর্ধ্বমুখী প্রেম প্রসারিত করেছে শচীশের দিকে। কিন্তু ক্রমে দামিনী এও উপলব্ধি করেছে শচীশকে বিবাহের গন্ডিতে আবদ্ধ করলে, তাকে সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে টেনে আনলে যে অসাধারণ শচীশকে লাভ করার জন্যে দামিনী মুগ্ধ তার সে অসাধারণত্ব আর তখন থাকবে না। শচীশের প্রেম উপলব্ধি রাজত্বের। অথচ অন্য দিকে দামিনীর মধ্যে আছে স্ত্রী-জাতীয়ত্বের আকাঙ্ক্ষা, সেই তার স্বধর্ম। সেই স্বধর্মের তাগিদে ঘর-বাঁধার আগ্রহ, নিজের দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে শরীর গড়ে তোলার উৎসাহ। তাই শ্রীবিলাসকে তার প্রয়োজন।''[৭২]

শ্রীবিলাস প্রথম থেকে দামিনীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। কিন্তু ব্যাকুলতার সঙ্গে তার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় নি। কারণ সে শচীশের প্রতি দামিনীর সুতীব্র ভালবাসার কথা জানতো। তাই সে নিজের প্রেমকে সংযত করে হৃদয়ের গভীরে সংগুপ্ত রেখেছিল। তাকে মাঝখানে রেখে শচীশের সঙ্গে দামিনীর ছলনাময়ী খেলা সে নীরবে সহ্য করেছে। মনে ব্যথা পেলেও ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হয় নি। বরং শচীশ ও দামিনীর মঙ্গল কামনায় শ্রীবিলাস সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতো। তাই শেষ পর্যন্ত দামিনীকে একটা সুস্থ জীবন উপহার দিতেই সে দামিনীকে বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলেজ জীবনে শচীশের ব্যক্তিত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, জ্যাঠামশায়ের ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, লীলানন্দ স্বামীর সান্নিধ্যে থাকার সময়ে তার আচার-আচরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ধরে শ্রীবিলাসের চরিত্রধর্ম পূর্বাপর বিচার করলে দামিনীকে বিবাহের সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। '' শ্রীবিলাস যে ধরনের মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন (balanced) তাতে তার পক্ষে দামিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করা অসঙ্গত নয়। শ্রীবিলাস চিরকাল দামিনীকে ভালবেসেছে। দামিনীর ভালবাসা প্রথমদিকে সে পায়নি বলে বেদনা বোধ করেছ। এমন কি যখন শেষ দিকে দামিনী শ্রীবিলাসকে আশ্রয় করেছে তখনও সে তার মনে শচীশ সম্পর্কে দুর্বলতা আছে এই উপলব্ধি শ্রীবিলাসকে ব্যথিত করেছে। তবুও সব কিছুকে সহজ শান্ত ভঙ্গিতে গ্রহণ করার মতো মনের সমতা তার আছে। সুতরাং

শচীশের প্রতি দামিনীর শ্রদ্ধার কথা জেনেও দামিনীর প্রেমকে গ্রহণ করতে তার বাধেনি। রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই এক ধরনের পুরুষ চরিত্র-শোভনলাল যার সগোত্রীয় শিক্ষিত বুদ্ধিমান বিচারশীল-অথচ শান্ত অনুত্তেজিত এদের স্বভাববৈশিষ্ট্য, জোর করে, সোচ্চার ভঙ্গিতে এরা নিজেদের জাহির করে না-কিন্তু সব বোঝে। এদের প্রেম খুব অভিমান-প্রবণ নয়, সহনশীল। শ্রীবিলাসও উপন্যাসে সদাসর্বদা দামিনীর প্রেম যাঞা করেছে, দামিনী শচীশের জন্য উন্মুখ জেনেও সম্পূর্ণ বিরুপ হয়নি। সুতরাং শেষ কালে আশ্রয়হীন দামিনীকে ভালবেসেই সে আশ্রয় দেবে — এ অস্বাভাবিক নয়।''[৭৩]

শ্রীবিলাসের সিদ্ধান্ত ও দামিনীর সম্মতিতে দুটি পরিণত মন খুঁজে পায় পারস্পরিক সাহচর্যের নিভৃত আশ্রয়। দামিনীকে পেয়ে শ্রীবিলাসের উপলব্ধি- ''...সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিনী হইল না, সে মায়া হইল না, যে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কারসাধ্য তাকে ছায়া বলে? ''[৭৪]

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শ্রীবিলাস ও দামিনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-কে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির ভাললাগা, মন্দলাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে, সহানুভূতি, সহমর্মিতাবোধ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা তাদেরকে আদর্শ দম্পতির স্বর্ণ সিংহাসনে বসার সুযোগ এনে দিতে পারে। প্রেমভক্তি ভালবাসা শ্রীবিলাস ও দামিনী-র দাম্পত্যকে আনন্দময় করে তোলে। তারা তাদের সেই আনন্দকে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলে— '' বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গা যমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপর দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।''[৭৫]

মাত্র এক বছর শ্রীবিলাসের সঙ্গে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করে দামিনী শ্রীবিলাসকে ছেড়ে চিরতরে বিদায় নেয়। কিন্তু স্বল্পকালের দাম্পত্যে দামিনী যে স্নিগ্ধ মাধুর্যের আস্বাদ পেয়েছিল তা তার জীবন-তৃষ্ণাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই

মৃত্যুর পূর্বে অসীম নীলাকাশের নীচে ভরা জোয়ারের কল্লোলিত সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে শচীশ বা প্রথম স্বামী শিবতোষকে সে জন্মান্তরে স্বামী হিসাবে পেতে চায় নি, শ্রীবিলাসকেই স্বামী হিসেবে ফিরে পেতে চেয়েছে — ''যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।''[৭৬]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাম্পত্যের এই আদর্শ উপন্যাস সাহিত্যে প্রতিফলিত করে রবীন্দ্রনাথ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসকে ঘিরে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল শুধু আঙ্গিক প্রকরণ, রচনারীতির অভিনবত্ব ও আয়তনের ক্ষুদ্রতার জন্য, এমনটি ভাবা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসটিতে উদার মানবতাবাদের ভিত্তিতে বিধবা দামিনী ও শ্রীবিলাসের দাম্পত্য জীবনের আদর্শ নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তা ব্যক্ত করেছেন, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যাবে না।

দামিনীর জীবনের পূর্ব-ইতিহাস অর্থাৎ শিবতোষ-দামিনীর বিবাহের বিষয়, বৈধব্য, তাকে উপেক্ষা করে শচীশকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসার কথা, দামিনীর স্বভাব প্রকৃতি ইত্যাদি শ্রীবিলাসের অজানা নয়। '' অনেক নদী পর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে। 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।''[৭৭]

এক্ষেত্রে আমাদের মনে হতে পারে, শ্রীবিলাস সবকিছু জানা সত্ত্বেও কেন দামিনীকেই জীবন-সঙ্গিনী করতে চাইল? তাছাড়া দামিনী তো তার চরম অসহায়তার সময়েও শ্রীবিলাসকে আঁকড়ে ধরতে চায়নি। দামিনী মাসি বাড়ি থেকে আশ্রয়হীন হলে শ্রীবিলাস তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় যাইবে ?' এর অকপট উত্তরে দামিনী 'লীলানন্দ স্বামীর কাছে' যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। দামিনীর সঙ্গে বৈবাহিক

সম্পর্ক স্থাপন করে নীড় বাঁধতে চাওয়ার কারণ হিসেবে দামিনীর প্রতি শ্রীবিলাসের গভীর ভালবাসা, তার-সহনশীলতা ও সমতাসম্পন্ন (blanced) মানস বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার চরিত্রের আর একটা দিক হয়তো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তা হলো, বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে শান্ত-সংযত থেকে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাওয়া, উচ্চশিক্ষিত শ্রীবিলাসের বিজ্ঞানমনস্ক ও উদার মানবিক দৃষ্টির আলোকে জগৎজীবনকে দেখে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ-বর্জন করার মানস-বৈশিষ্ট্যের দিকটি। তাই শচীশের প্রতি মানবিক দুর্বলতা বা বন্ধুত্বের টানে সে লীলানন্দ স্বামীকে সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু স্বামীজীর সাধনার মত ও পথকে সে কখনোই মেনে নেয় নি। শচীশ দাদা পুরন্দরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও সমাজ-সেবার মানসিকতা নিয়ে ননিবালাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল।

তার সংসার-জীবন যাপন করার অনিচ্ছার বিষয়টি উপন্যাসে ননির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যতটা প্রতিফলিত, তার চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর দামিনীকে কেন্দ্র করে শচীশের আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য — " দামিনীর দুর্দমণীয় কামনা যখন শচীশকে লক্ষ্য করিয়া উচ্ছ্বসিত তখনো তা শচীশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার সেবা মাধুর্যে শচীশ মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তার বেশি নয়।"[৭৮] অন্যদিকে দেখা যায় শ্রীবিলাস দামিনীকে ভালবাসে বলেই তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার জন্য সবদিক ভেবে চিন্তেই বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাকে বিবাহ করেছিল। শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহের যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাকে আকস্মিক আবেগের হটকারী কোনো প্রকাশ বলে মনে হয় না।

তৎকালে বাংলার মাটিতে ইউরোপের নব্য মানবতাবাদের যে ঢেউ এসে পড়েছিল, তার প্রভাবেই শ্রীবিলাস সমস্ত রকম কুসংস্কার, সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে দামিনীকে প্রেমিকা হিসেবে, নারী হিসেবে, সর্বোপরি মানুষ হিসেবে দেখতে অনুপ্রাণিত হয়েছে, বিধবা বা ভ্রষ্টা বা নষ্ট মেয়ে হিসেবে তাকে দেখে নি। সমকালের তুলনায় প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনাকে যদি আধুনিকতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে ধরা যায়, তাহলে শ্রীবিলাসের বৌদ্ধিক ভাবনা-চিন্তা এবং দামিনীকে বিবাহের সাহসী সিদ্ধান্তকে ব্যতিক্রমী ভাবা যেতে পারে কিন্তু অবাস্তব ভাবা ঠিক হবে না। আলোচ্য উপন্যাসের পুরন্দর, নবীন, শিবতোষ

এদের সঙ্গে সাতপাক ঘুরে যারা সমাজ-স্বীকৃত স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিল, দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে গিয়ে তাদের মনে হয়তো একটি প্রশ্ন উঁকি দিয়েছিল- 'বিয়েটা কেন ভাঙ্গা যায় না?'

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রশ্নটা অনুচ্চারিত থাকলেও রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে তা স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দেহমন' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম স্মরণীয়। অনাত্মীয় দু'জন নারী-পুরুষ আত্মিক-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দাম্পত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সম্পর্কের এই সূক্ষ্মসুতোর বাঁধনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ যদি পারস্পরিক সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে একে অপরের আশা-ভরসা ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে, তাহলেই তাদের বন্ধন সার্থক হয়। তাদের সার্থক দাম্পত্য-ই সমাজ জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু পুরন্দর, নবীন —এদের বহুগামী মানসিকতা ও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ, শিবতোষের অবাস্তব আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের প্রয়াস, পুরুষ তান্ত্রিক জবরদস্তি যখন দাম্পত্য-সম্পর্কের পবিত্র বন্ধনকে কলুষিত করে তখন ঐ বন্ধনের সূক্ষ্মগ্রন্থি ছিন্ন করে নারী যদি মুক্ত হতে চায় বা কোনো পুরুষ যদি তাদের মুক্তির জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তা কোনো একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের মানুষের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শাশ্বত কল্যাণবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে তা সবসময়েই স্বাভাবিক। তাই সমাজ-সভ্যতার প্রয়োজনে 'বৈবাহিক-বন্ধন' সত্য হলেও ঐ একই প্রয়োজনে 'বৈবাহিক-বন্ধন মুক্তি'-ও সমান সত্য। বয়সগত ব্যবধান ও তৎসঞ্জাত রুচিবোধের পার্থক্য, অসংকোচ লালসা, বহুবল্লভতার কামনা, প্রভুত্বপ্রিয়তা প্রভৃতি কারণে কোনো সম্পর্কের মাধুর্য নষ্ট হলে, তার জন্য স্বামী অথবা স্ত্রী যার দোষ-ই থাক না কেন, ঐ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা অর্থহীন। বরং সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপনের মাধ্যমে অথবা নতুন করে অন্যত্র আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবন যদি দামিনীর মতো আনন্দময় হয়ে ওঠে, মনে জাগে অনন্তকাল বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, তাতে কোনো অগৌরব থাকতে পারে না। তবে স্বামী-স্ত্রী দৈনন্দিন জীবনে তাদের ছোট খাটো দোষ-ত্রুটি ঢেকে পরস্পরকে ক্ষমাসুন্দর ঔদার্যে গ্রহণ করতে না পারলে দাম্পত্য-জীবনের ভিত্তি সব সময়েই টলমল করবে।

প্রেমিক-স্বামী ও প্রেমিকা-পত্নী একে অপরের বন্ধুত্বের আসন গ্রহণ করলেই দাম্পত্য স্নিগ্ধ-মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঘরে বাইরে ঃ

'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' সমসাময়িক রচনা। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' — দুটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ব সচেতনতার পরিচয় থাকলেও 'ঘরে-বাইরে'-র সাফল্য 'চতুরঙ্গ'- এর চেয়ে অনেক বেশি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে গল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রীবিলাস লেখকের প্রতিনিধিত্ব করেছে। শচীশ, জ্যাঠামশায়, দামিনীর কথা আমরা তার মুখেই শুনতে পেয়েছি। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে কাহিনির কথক কোন একটি চরিত্র নয়, উপন্যাসের তিনজন প্রধান পাত্র-পাত্রী তাদের আত্মকথন বা ডায়ারির মাধ্যমে কাহিনিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের আত্মকথনে তাদের নিজেদের কথা — নিজেদের অভ্যন্তর জীবনের কথা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি তাদের চেতনার আলোকে উঠে এসেছে অন্যান্য চরিত্রের কথাও।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি রচিত। তাই একটি বিশেষ যুগের দেশ কালের রাজনীতি উপন্যাসটির মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে একথা ঠিক। তবে রাজনীতিই উপন্যাসটিতে প্রধান হয়ে ওঠেনি। ''আঁতের কথা'টি তুলে ধরতেই উপন্যাসের অভিনব কলাপ্রকরণ। কত ঢাকঢোল বাজিয়ে কতলোকের কাঁধে চড়ে এসেছিল সন্দীপ; দেশজোড়া উত্তাল আলোড়নের কী দৃপ্ত প্রতিশ্রুতি। কিন্তু রাত না-পোহাতেই উপন্যাসের জীবনস্রোত আটকা পড়ে গেল তিনটি ব্যক্তিত্বের নিভৃত ওঠাপড়া, ঘাত-প্রতিঘাতের যোগাযোগে। 'স্বদেশী'র ঝড়ের ঠেলায় গল্পের শুরু ; সে-গল্প সমে এসে যখন থেমেছে, তখন 'স্বদেশী'র ঐতিহাসিক পরিণামের গহন হতে মাথা তুলে তাকাতে থাকে ঐ তিনটি অনন্য-স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আত্মমন্থনের চলচ্ছবি। ওদের আত্মার অতলস্পর্শ আলোড়নের একমাত্র সাক্ষী তো ওরা নিজেই। আসলে

ব্যক্তিত্বের নিরুপাধি-জটিল যন্ত্রণার অনুভাবক ব্যক্তিরই নিরবলম্ব চেতনা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই আগাগোড়া উপন্যাসটির বিন্যাস বিমলা, সন্দীপ এবং নিখিলেশ-এর 'আত্মকথা'র মাধ্যমে; নিজের সঙ্গে যেখানে একমাত্র নিজের ছাড়া আর কারো কথা নেই। তাতে কোনো আব্রু আবরণ থাকে নি; কিংবা নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে যাওয়া গেছে নিজেরই চেতনার অচেনা গভীরে — পাঁচজনের মাঝখানে থাকলে যে-দৃষ্টি, যে-অনুভব ফুটতই না কখনো।''[৭৯]

রাজনীতিকে উপলক্ষ্য করে প্রধান হয়ে উঠেছে নর-নারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক-দাম্পত্যের সমস্যা-সংকট। উপন্যাসের বিস্তার মোট আঠারোটি অধ্যায়ে। এক একটি চরিত্রের আত্মকথা উপন্যাসের এক একটি অধ্যায়। সূচনা হয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমলার আত্মকথা-র মধ্য দিয়ে। সূচনাতেই ভারতীয় দাম্পত্যের নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর সতীত্বের আদর্শকেই বড় করে দেখা হয়েছে। মায়ের মত বিমলার রূপের গৌরব ছিল না ; সে সতীত্বের গৌরব অর্জনকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতো— '' সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম।''[৮০]

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে যে সময়ের ছবি ফুটে উঠেছে তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্বামীর স্বতাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্ত্রীর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি সমাজে মান্যতা পায় নি। তার ওপর স্বামীর একচ্ছত্র অধিকারই ছিল সমাজ-সমর্থিত। পুরুষের কাছে নারীর বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণকে সমাজ আদর্শবাদ ও সতীধর্মের স্তবস্তুতির সমারোহে বড়ো করে দেখিয়ে নারী জাতিকে ভুলিয়ে রাখতো। সতী থাকাটা নারীর পক্ষে শুধু জরুরী নয়, পুণ্য কর্ম হিসেবেও দেখা হত। বিমলার স্বামী নিখিলেশ। নিখিলেশ আধুনিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত। সে সনাতন দাম্পত্যের আদর্শবাদের অন্তরালে যে মিথ্যা থাকে তাকে মেনে নিতে চায় নি। নিখিলেশ মনে করে ''স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সমান-প্রেমের সম্বন্ধ।''[৮১] প্রেমের ক্ষেত্রে বিমলাকে সে স্বাধীন নির্বাচনের সুযোগ দিতে চেয়েছে — ''আমি চাই

বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকী আছে।''[৮২] বিমলা নিখিলেশের আদর্শে সাড়া দেবার প্রয়োজন অনুভব করে নি। বিমলা যে সমাজ পরিবেশে মানুষ হয়েছে তাতে নিখিলেশের মতো পুরুষকে স্বামী হিসেবে পাওয়ায় সে গর্বিত। স্বামীর কাছ থেকে সে আশাতীত ভালবাসা পেয়েছে, পেয়েছে সম্মান। নিখিলেশ তাকে ভালবেসে পূজার আসনে বসিয়েছে। বিমলা জানতো না সত্যিই কতটা ভালবাসা পাওয়ার সে যোগ্য ? কারণ, মূল্য দিয়ে ভালবাসা অর্জনের সুযোগ বিমলার জীবনে আসে নি। সাধনার দ্বারা সাধ্যবস্তু লাভ করাতেই যে মেয়েদের আনন্দ — ''প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাওনি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ — আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ি নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি — আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য! এতে আমার মনে গর্ব অসে, আমার মনে হয় এ আমার ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি; সে দাবি কেবল বাড়িতেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন ? ''[৮৩]

বিমলা মুক্তি চায় নি ; চেয়েছিল ভক্তি — স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতে চেয়েছিল। বিমলার মধ্যে ছিল ভারতীয় নারীর আজন্ম লালিত স্বামী সংস্কার — 'পতি পরম গুরু'। সংস্কারকে আঁকড়ে থেকে বিমলা সুখেই ছিল। কিন্তু তার সুখের সংসারে আছড়ে পড়ে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ। অন্তপুরের গতানুগতিক জীবনধারা থেকে সে বেরিয়ে আসে বাইরের বৈঠকখানায়, পরিচিত হয় স্বামীর বন্ধু

সন্দীপের সঙ্গে। সন্দীপ তার উন্মাদনাময় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত করতে চায় বিমলাকে। সন্দীপের মত্ত আবেগ, বাগ্মিতায়,স্তাবকতায় বিমলা মুগ্ধ হয়। সন্দীপের তুলনায় স্বামী নিখিলেশকে তার নিস্তেজ, বৈচিত্রহীন বলে মনে হয়। আলোড়িত হয় তার অন্তর্জগৎ — শুরু হয় ঘরে বাইরের সংঘাত। তার মগ্নচৈতন্যের গভীরে যে 'আমি' সুপ্ত ছিল সে জেগে ওঠে — ''এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোট নদী— তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা—কিন্তু এখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেল —...আমাকে কি বিধাতা আজ নতুন করে সৃষ্টি করলেন ? তার এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন ? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে।''[৮৪]

নিখিলেখ বিমলাকে নারী হিসেবে নয়, স্ত্রী হিসেবে নয় — ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটাতে পারে নি। সংস্কারের কালো পর্দা ছিঁড়ে তাকে আলোর জগতে টেনে আনতে পারে নি। এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেকার সংযোগসেতু যথার্থ ছিল না। নিখিলেশ স্ত্রীকে দেবতার আসনে বসিয়ে, তার কাছে কিছু প্রত্যাশা না করে বিমলার আত্মপ্রকাশের চাহিদাকেই উপেক্ষা করেছিল। সন্দীপই প্রথম বিমলার আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলেছিল। বিমলার কথায় — ''সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সেকথা আমার বিশ্বাস করতে বাধে নি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্য শক্তি এসেছে ; সে এমন একটা কিছু যাকে ইতিপূর্বে আমি অনুভব করিনি;''[৮৫]

বিমলা স্বামীর কাছ থেকে শুধু পেয়েই এসেছে, বিনিময়ে তাকে কিছু দিতে হয় নি। কিন্তু আপন সত্তাকে প্রকাশ করার একটা তাগিদ তার ভিতরে ছিল। সন্দীপের 'আমি চাই'— কথার ভিতরের শক্তি বিমলার মধ্যেকার সুপ্ত আমিকে প্রকাশের আলোকে নিয়ে আসে — ''আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে

বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ, না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা।''[৮৬]

ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্রে সন্দীপের সংকোচজড়তাহীন উদ্ধত ভঙ্গী, শক্তির আস্ফালন, মত্ত আবেগ বিমলাকে মুগ্ধ করে, স্বামীর কাছ থেকে টেনে নিয়ে যায় তার দিকে, নিজের পায়ে বাস্তবের শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে শেখায়। বিমলা চিনতে পারে নিজেকে— তার ভিতর ও বাইরের 'আমি' কে — ''মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভালোবেসেছে, কিন্তু আমার আর একটা বুদ্ধি ভোলে।''[৮৭] — আদিম সর্বনাশা প্রবৃত্তি বিমলার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সে তাই দেশের নামে সন্দীপের জন্য চুরি করেছিল নিজেদেরই সিন্দুকের টাকা। এরপর অর্থকে কেন্দ্র করেই সন্দীপের স্থূলতা, কাপুরুষতা বিমলার কাছে উদঘাটিত হয়। মোহমুক্তি ঘটে বিমলার। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে বিমলা ও নিখিলেশ নিজেদের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হয়। বিমলা বলে — ''আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর স্মরণ নেই।''[৮৮] নিখিলেশের উপলব্ধি — ''আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটি সুকঠিন ভালোর ছাঁচে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতর এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবন তো ছাঁচে ঢালবার নয় ...আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।''[৮৯]

বিমলার জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি সন্দীপের আগমনের পূর্বে তাদের নয় বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবন এক প্রকার সুখেই অতিবাহিত হয়। নিখিলেশের প্রতি বিমলার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। নিখিলেশও বিমলাকে গভীরভাবে ভালোবাসত। স্ত্রী বিমলার ভালবাসা তার নিশ্চিন্ত নির্ভর ছিল বলেই সে অন্তপুরের অবরোধ থেকে স্ত্রীকে বাইরে নিয়ে আসতে চেয়েছিল, এবং নিয়েও আসে। উদারতন্ত্রে বিশ্বাসী নিখিলেশ চরিত্রবান

ও আদর্শবান। সে আন্তরিক-ভাবেই চাইত স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা সমমর্যাদায় পূর্ণ হয়ে উঠুক। সে চাইত না শুধুমাত্র বৈদিক মন্ত্রকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য স্ত্রী স্বামীকে সব সময় মেনে চলুক, তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে সারা জীবন তাকে ভালবেসে যাক —"স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী।"[৯০] আবার যথার্থ ভালোবাসা সম্পর্কে নিখিলেশ বিমলাকে বলেছিল — "যে পেটুক মাছের ঝোল ভালবাসে সে মাছকে কেটে কুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়। কিন্তু যে লোক মাছকে সত্য ভালবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্ত্তি করতে চায় না — সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে — তারপর যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের সখের বা সুবিধার জন্য তাকে ছেটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।"[৯১]

আসলে দাম্পত্য জীবনকে আদর্শবাদী নিখিলেশ একটা আদর্শের ছাঁচে গড়তে চেয়েছিল। দাম্পত্য-সমস্যার বীজ তার এই আদর্শের মধ্যেই সূক্ষ্ম আকারে নিহিত ছিল। সন্দীপ তাদের সুখের দাম্পত্যে সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজটি করেছে মাত্র। তাকে উপলক্ষ্য করেই বিমলার নিরুদ্ধ আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। 'ভালোবাসা' আবেগটি সম্পর্কে নিখিলেশের ভাবনা এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রতিফলনের মধ্যে স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে মনে করে একান্ত আপনার জনকে 'নিজের মনের মতোটি করে' নেওয়া হল ভালোলাগা, ভালোবাসা নয় ; কেননা এর মধ্যে একধরনের আত্মপরায়ণতার ভাব বা জবরদস্তি প্রকাশিত হয়। ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীর মুক্তির আনন্দের অংশীদার হতে পারার মধ্যেই যথার্থ ভালোবাসার পরিচয় ফুটে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, নিখিলেশ বিমলাকে নিজের

মতো করে গড়ে নিতে গিয়ে তার স্বভাব ও স্বাতন্ত্র্যকেই অস্বীকার করেছে। বিপত্তির শুরু এখান থেকেই।

সন্দীপ নিখিলেশের বন্ধু। কিন্তু প্রকৃতি ও মতাদর্শে সে নিখিলেশের একেবারে বিপরীত। নিখিলেশের বিশ্বাস — সত্যলাভের জন্য উপায় ও সত্যমূলক হওয়া চাই ; অন্যদিকে সন্দীপের কাছে সত্য নয় ফলই লক্ষ্য, উপায় নিয়ে বাছ বিচার করাকে সে মূঢ়তা বলেই মনে করত। শুধু রবীন্দ্র সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে সন্দীপ চরিত্র অদ্বিতীয়। এমন আত্মপরায়ণতা, নীতিহীন দাম্ভিকতা, দেহবাদী ভোগসর্বস্ব ছলনাপরায়ণ আধুনিকতা সন্দীপের পূর্বে আর কোন চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। অনেকে সন্দীপকে উপন্যাসের খলনায়ক বলেছেন। কিন্তু ছকে বাধা খলনায়ক সে নয়। রবীন্দ্রনাথ তার চরিত্রের মধ্যে একটি 'কিন্তু' ঢুকিয়ে দিয়ে তার জন্মান্তরের কথাও বলেছেন।

সন্দীপ তার অন্তর্নিহিত 'আমি' অর্থাৎ তার দ্বিতীয় সত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিল না বিমলার সান্নিধ্যে আসার পূর্বে। বিমলার জীবনে আবির্ভূত হবার আগেও যে অনেক নারী তার জীবনে এসেছিল তা আমরা জানি। বিমলা তার জীবনে আসা প্রথম নারী নয়। তবে বিমলার সাহচর্য থেকে সন্দীপ তার প্রতি এক সময় অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তার অবচেতনার অন্ধকারে থেকে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বেরিয়ে আসে বিমলার প্রতি প্রেম। সন্দীপ তার ডায়ারিতে লেখে— ''বুকের ভিতরে টান পড়েছে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিত হয়ে উঠেছে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্তি করে কেবলই ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিলমিল করতে থাকে, মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইছে।''[৯২] — কাম নিরঙ্কুশ হলে সন্দীপের মনে ঐ ব্যথাটা অনুভূত হত না। শুধু তাই নয়, বিমলা যখন সন্দীপের প্রতি সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত হয়ে তার পায়ে নিজেকে নিবেদন করে ফুলে ফুলে কেঁদেছে, তখন তার বুকের ভিতরের টান, 'সুরের ধারা' কামনার ধন হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও আত্মসাৎ করতে দেয় নি। সন্দীপের ভিতরে জেগে ওঠা প্রেমিক সত্তা ভেবেছে —

"ওর ওই কষ্টটা আমার বুকে লাগছে। ওযে এখন সম্পূর্ণ আমারই ; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"[৯৩] কিন্তু ভাবনা অনুযায়ী তো জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয় না। সন্দীপের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় — বিমলার চুরি করে আনা একরাশ মোহর দেখে তার লোভ চক্‌চক্ করে ওঠে। কিশোর অমূল্যর প্রতি বিমলার পক্ষপাতিত্বও তার সংযমের বাঁধকে টলিয়ে দেয়।

সন্দীপ তার আত্মকথায় লিখেছে — " জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তারপরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেই জন্যেই এত অঘটন ঘটে।"[৯৪] বিমলার উপলব্ধ সত্য — "আমরা জানি নে, আমরা শেষ কথাটিকে জানি যে এইটেই স্বীকার করা ভালো, আপনাকেও জানি নে। মানুষ বড় আশ্চর্য।"[৯৫] — সন্দীপ বিমলার উপলব্ধিতে যে মনস্তাত্ত্বিক সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে তা হল, মানুষ তার মন সম্পর্কে যতটা জানে ভাবে, আসলে সে ততটা জানে না। মানুষের মনের চিন্তা-ভাবনা, তার আচার-আচরণ, ক্রিয়া-কর্মের অনেকখানিই চেতনোর্ধ্ব মনের অর্থাৎ অবদমিত কামনা বাসনা বা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়।

নিখিলেশের প্রেমের অতিশয্য তার আদর্শবাদিতা, শান্তধীর স্বভাব ইত্যাদির জন্য বিমলার প্রেম-বাসনা অতৃপ্ত থাকে। বিমলার অবচেতন মনে একটা হীনতাবোধের ধারণা ছিল, যার জন্য সে স্বামীর প্রেমের মূল্যও বুঝতে পারে নি। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ বিমলার প্রথম আত্মকথাতেই তার হীনতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিমলা মা এবং দু জায়ের রূপের সঙ্গে নিজের রূপের তুলনা করে মনের মধ্যে একটী হীনতাবোধ অনুভব করত। এর বীজ যে বাল্যকালেই তার চরিত্রে উপ্ত হয়েছিল তা তার কথা থেকেই জানতে পারা যায় — "আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলেই বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলা একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। আমার গায়ের রং, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এযেন আর-কারও জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।"[৯৬]

তার এই হীনতাবোধ (inferiority complex) প্রবল হয় বিয়ের পর। কারণ, স্বামী নিখিলেশের কাছ থেকে সে অযাচিত ভাবেই প্রত্যাশার অতিরিক্ত অনেকে কিছুই পেয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে সে কিছুই দাবী করেনি। স্বামীর প্রত্যাশাহীনতার জন্য সে নিজের মূল্য যাচাই করার কোনো সুযোগ পায় নি। অথচ মানুষের সহজাত প্রবণতা হল আত্মমূল্য যাচাইয়ের বাসনা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আত্মাদর বা নিজের সম্পর্কে এক ধরণের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। আত্মমূল্য যাচাই করার অভিপ্রায় বিমলার আত্মকথায় ধরা পড়ে — ''পুরুষকে বশ করার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ''[৯৭] নিখিলেশ বিমলার যে সুখ-বাসনা চরিতার্থ করতে পারে নি, সন্দীপের কাছে সে সেই সুখের সন্ধান পেয়েছিল। বিমলার কথায় '' সন্দীপ বাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপ বাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।''[৯৮]

সন্দীপ বিমলার রূপ-সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করে, দেশের সম্বন্ধে তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিত, সে যে অনন্ত শক্তির আধার, দেশের প্রয়োজনে তার মতো নারীর যে এগিয়ে আসা দরকার সে কথা বিমলাকে সুযোগ পেলেই বুঝিয়ে দিত। এতে বিমলার অহংকারবোধ তৃপ্ত হয়। আত্মমূল্য সম্পর্কে তার মনে একটা স্ফীত ধারণার সৃষ্টি হয়। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় যাকে বলে (Superiority complex)। সন্দীপের মধ্যে ন্যায়-নীতি বোধের কোনো বালাই ছিল না — সন্দীপের বন্ধু নিখিলেশ অকপটে আমাদের একথা জানিয়েছে। সন্দীপ চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আত্মসুখ পরায়ণতা। ভোগবিলাসে তার বিন্দুমাত্র অরুচি নেই। নিখিলেশের কাছে সে নানা ছলছুতোয় অর্থ সংগ্রহ করতো। বন্ধুর গৃহে বাস করে বন্ধু-পত্নীকে অধিকার করবার জন্য সুচতুর ফাঁদ পাততে সে কোনো কুণ্ঠাবোধ করে নি। বিমলার আগেও যে নারীরা তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল — সে কথা স্মরণ করে তাকে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে দেখা যায়। নারী চিত্ত জয়ে পারদর্শী সন্দীপ জানতো বিমলার রূপ গুণের প্রশংসা করলে সে সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাই

সে বিমলাকে লাভের প্রত্যাশায় স্তুতি স্তবকতা করতে শুরু করে। বিমলা স্বাদেশীকতার আবেগে তার অভিপ্রায় বুঝতে ভুল করে। বিমলার মন নিজের শক্তিকে যাচাই করার সুযোগ পেয়ে ধীর, শান্ত, নিরুত্তাপ নিখিলেশের হৃদয়ের থেকে দূরে সরে এগিয়ে যেতে চায় সন্দীপের দিকে। শুরু হয় তার হৃদয়-দ্বন্দ্ব। যার উত্তাপে স্বামী নিখিলেশ ও বিমলা নিজেও ভয়ংকর রূপে দগ্ধ হয়। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন — ''ঘরে বাইরে' আধুনিক উপন্যাস, এখানে দেশ-কাল-সমাজ-সামাজিক বাস্তবতা উপস্থিত। সেই সঙ্গে উপস্থিত আধুনিক উপন্যাসের চারিত্রলক্ষণ। এখানে চরিত্রের আত্মসমীক্ষা প্রধান হয়ে উঠেছে। চরিত্র নিজের মুখোমুখি হয়েছে, তার তীব্র গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সাংকেতিক তাৎপর্যে অণ্বিত হয়েছে। নায়ক নিখিলেশ যেমন দেশ সময় সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়েছে তেমনি আপন অন্তরশায়ী অনুভূতির কথা বলেছে। নায়িকা বিমলা যেমন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল উন্মাদনা-প্রভাব মেনেছে, তেমনি নিজের মুখোমুখি হয়ে গূঢ় অন্তর্বিচারে আত্মনিযুক্ত হয়েছে। স্মর্তব্য, এই উপন্যাসে তিন প্রধান চরিত্রের আত্মকথা সংকলিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে। সেই আত্মকথা ডায়েরীধর্মী। ঈষৎ পার্থক্য আছে চরিত্রের ডায়েরী রচনায়। প্রধান দুই পুরুষচরিত্র (নিখিলেশ, সন্দীশ) ডায়েরী লিখেছে ঘটনা-অন্তর্গত হয়ে। সে কারণে তাদের ডায়েরিতে সঞ্চারিত হয়েছে প্রবল প্রাণময়তা, অনুভূতির ক্ষিপ্রতা, আবেগের অকৃত্রিম স্বঃস্ফূর্ততা ও দুর্বহ উৎকণ্ঠা।''[৯৯]

বিমলার দ্বন্দ্ব হল-মানুষের সহজাত কামনা বোধ, সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা (Sexual Selection) এবং সনাতন সতীত্বের সংস্কারেরই দ্বন্দ্ব। পূর্বেই বলা হয়েছে, সতীত্বের সংস্কার বিমলার মনে বাল্যকাল থেকেই জন্মলাভ করেছিল। তাই তার অবদমিত কামনা মনের চেতন স্তরে উঠে এসে সন্দীপকে কেন্দ্র করে চরিতার্থ হতে চাইলে সামনে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই সংস্কার। তার super ego বা অধিশাস্তা তাকে বাধা দিয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আদর্শনিষ্ট কিশোর অমূল্যর মা সম্বন্ধের ডাকটিও তার সংস্কারকে আরও প্রকটিত করে। অমূল্যর আদর্শনিষ্ঠার তুলনায় সন্দীপের নীচতা স্বার্থপরতা তার কাছে এক সময় ধরা পড়ে। আত্মমূল্য যাচাইয়ের যে স্বস্তি প্রথমদিকে সে লাভ করেছিল, পরে তা আর থাকে না।

বিমলার দ্বন্দ্ব-মথিত গোপন মনের হাহাকার ধরা পড়ে তার আত্মকথায় — "আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশির বিন্দুর মতো। কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায়, তখন আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন ? হৃদয়ের দিক তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে, কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েছে। যা সামনে ছিল, তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেই জন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছে করে মরি; কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, মরার ভিতর তো শেষ দেখতে পাচ্ছি নি।"[১০০]

— বিমলার মনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা আত্মবিরোধ রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বের আলোকে যেভাবে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তার দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। " সামাজিক সংস্কারের অবরোধ ভেঙে বিমলার অবচেতন থেকে আদিম নারী প্রকৃতির নিষ্ক্রমণ ; এবং তারপর উত্তেজনায় পূর্ণ, উদ্বেগে আকুল আত্মবিরোধের গহন নাটক। অবচেতন আদিমতার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবার আগে অন্তঃপুরিকাকে পেরিয়ে যেতে হয়েছে শঙ্কাকুল, পিচ্ছিল, সর্পিল পথ যার সবটাই অন্ধকার, ঝড়ের তান্ডবে যেখানে পদে পদে পতনের আশঙ্কা সত্যি হয়ে ওঠে, যেখানে উদ্যত হয়ে থাকে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো উৎক্ষিপ্ত হবার নিয়তি। সে যাত্রায় অনেক অশ্রু, অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে বিমলাকে,সহ্য করতে হয়েছে দুঃসহ অথচ অকথ্য মর্মদাহ। কিন্তু সেই সঙ্গে রক্তের স্রোতে সে অনুভব করেছে আদিম উল্লাস, তাতে পুলকিত হয়েছে তার সর্বাঙ্গ, উল্লসিত হয়েছে মন। বিমলার সেই আত্মবিস্মৃতি, আত্মবিরোধ ও আত্মবিচ্যুতি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির আলোতে প্রকাশিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই উন্মোচন যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ তেমনি আনুপূর্ব। মনস্তত্ত্ব ও ঘটনা, দুইই তাতে পর্যাপ্ত ; অসংগতি কোথাও নেই, যদিও আকস্মিকতা আছে, তবে তা অনিবার্য মনে হয় সমস্তই। লেখকের এই কৃতিত্বের কোনো তুলনা বাংলা উপন্যাসে নেই।"[১০১]

মায়ের ঈর্ষার সঙ্গে মহেন্দ্রের দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি তাদের দাম্পত্য-জীবনকে বিপন্নতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। ঘরে বাইরে উপন্যাসে বিমলার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি বাঁধভাঙা নদীর মতো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠায় তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কও জটিল হয়ে

ওঠে। বিমলা ও সন্দীপের মানসবিকৃতি মনস্তত্ত্বের বহুবল্লভতার কামনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিমলা যে সন্দীপের কামনার শিকার হতে চলেছে সে দিকটি লক্ষ্য করেছিলেন নিখিলেশের মাস্টার মশায় চন্দ্রনাথবাবু। সে সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে নিখিলেশের আত্মকথায়। নিখিলেশ বলেছে, 'সহজে তিনি চঞ্চল হন না, কিন্তু সেদিন সামনে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন।' নিখিলেশ নিজেও জানত সন্দীপের স্বভাব-প্রকৃতি —''সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে।''[১০২]

বিমলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও নিখিলেশের সচেতনতার অভাব ছিল না। বিমলার প্রকৃতি সম্পর্কে সে লিখেছে — ''ধৈর্যের পরে বিমলার ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন-কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।''[১০৩] নিখিলেশ জ্ঞানপাপী। সব জানা সত্ত্বেও একধরনের নিষ্ক্রিয়তা তার চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। দাম্পত্য সম্পর্ককে সার্থক ও সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে সে সক্রিয় হয়ে উঠলে হয়তো অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা হত। সন্দীপ নিখিলেশকে 'অদ্ভুত মানুষ' বলেছে। সত্যিই নিখিলেশের আচার-আচরণ অদ্ভুতই বটে। সন্দীপের দ্বারা তার সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, তবুও সে তাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেয় নি। অন্তত সসম্মানে বিদায় করতে পারত। কিন্তু তা সে করতে পারে নি। এক্ষেত্রে তার সক্রিয়তায় বাধা সৃষ্টি করেছে তার দাম্পত্যআদর্শের ধারণা, তার রুচিবোধ ও জমিদার সুলভ উদারতা। নিখিলেশকে অবশ্য পৌরুষহীন বলা যায় না। কারণ, সে যে যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার বিশ্বাসের জোরেই তাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বাইরের জগতে এনে যাচাই করতে চেয়েছিল — সে বিষয়টি আমারা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল রূপের প্রতি নায়কের মোহ। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নায়কের হৃদয়ে ঐ ধরনের কোনো মোহ সৃষ্টির জন্য দাম্পত্য-সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসটিতে দাম্পত্য-সমস্যা সৃষ্টির মূলে রয়েছে নায়িকার অর্থাৎ বিমলার মোহান্ধতা। তবে তার ঐ মোহ রূপের প্রতি নয়, সে সন্দীপের রূপে ভোলে নি। তার

মোহ ছিল তেজের প্রতি, আবেগের দুর্বার শক্তির প্রতি। যার অভাব ছিল নিখিলেশের মধ্যে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবেও নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য-সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্য-সম্পর্কে যথার্থ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন— "...বিমলার মনোবিকারের চিত্রও খুব স্বাভাবিক বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মুখে নিখিলেশের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা ও অবিচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সন্দীপের জ্বালাময় প্রচন্ড আবেগ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির তুলনা করিয়া সে তাহার স্বামীর মনোভাবকে কাপুরুষোচিত দুর্বলতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। তারপর ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে সে সন্দীপের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সন্দীপ নানাবিধ কৌশলে মোহাবেশ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। একটা দেশব্যাপী স্বীধীনতা-আন্দোলনের নেত্রী যে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ নৈতিক মাপকাঠির অধীন নহে, তাহার বৃহৎ প্রয়োজনের সহিত মিলাইয়া তাহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য এক নূতন নৈতিক আদর্শ খাড়া করিতে হইবে, শাস্ত্রের অনুশাসন ও স্বামীপ্রেম যে তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতে পারে না — ইত্যাদিরূপ যুক্তি-তর্কের দ্বারা সে বিমলার উপর নিজ প্রভাব বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছে। এই মাদকতার অবিরাম সেচনে বিমলার মনে এক প্রকার বিহ্বল অসাড়তার সৃষ্টি হইয়াছে — মানসিক ক্লোরোফর্মের মধ্যে নিখিলেশের সহিত তাহার প্রেম-সম্বন্ধ কখন ছিন্ন হইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।"[১০৪]

যোগাযোগ ঃ

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস। প্রকাশ কাল১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করলেও উপন্যাসের মূল উপজীব্য করেছেন নিখিলেশ-বিমলার দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যাকে। এক যুগ পর প্রকাশিত 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও চিত্রিত হয়েছে সেই পরিচিত দাম্পত্য-সম্পর্কের সমস্যা। কিন্তু বিমলার সমস্যা-সংকটের সঙ্গে

কুমুদিনীর সমস্যা-সংকটের মাত্রাগত পার্থক্য আশমান-জমিন। আলোচ্য উপন্যাসের দাম্পত্য-সংকটকে জটিল করে তুলেছে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক মানসিকতার দ্বান্দ্বিক পরিণাম, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নারীর নবজাগ্রত মূল্যবোধ তথা অধিকার সচেতনতা। 'ঘরে-বাইরে' ও 'যোগাযোগ' রচনা কালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক যুগ। এই দীর্ঘ সময়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করতেন তার পরিচয় আমরা 'চোখের বালি'-র মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য-সংকট থেকেই জানতে পেরেছি। তবে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দাম্পত্য-জীবনকে কেন্দ্র করে কুমুর আত্মিক সংকটকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তার দৃষ্টান্ত তৎকালের বাংলা সাহিত্যে নেই। সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল মানসিকতা থেকে বেরিয়ে নিখিলেশ বিমলাকে পুরুষতন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, গৃহ পরিবারের গণ্ডি থেকে তাকে বের করে এনে বৃহত্তর পৃথিবীর শরিক করে তুলতে চেয়েছিল। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের দেওয়া অর্থাৎ পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষের দেওয়া মুক্তিকেই বড় করে না দেখিয়ে যথার্থ অর্থে নারী মুক্তির কথা ঘোষণা করলেন এমন ভাবে যার দৃষ্টান্ত সমকালীন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নেই। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমুদিনীই স্বামী মধুসূদনকে মুক্ত করতে চেয়েছে, তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে নিজেও মুক্ত হতে চেয়েছে। তার বলিষ্ঠ ঘোষণা — 'আমি ওদের বড়ো বউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই।'[১০৫]

কুমু সামাজিকতাকে মেনে নিয়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে স্বামীর সংসারে ফিরে যায় ঠিকই, কিন্তু যাবার আগে দাদাকে জানিয়ে যায় যে, ঘোষাল বংশের সন্তানকে সে তার নিজের বাড়ীতে রেখে আবার 'স্বাধীন' হয়ে তারই কাছে ফিরে আসবে। দৃঢ় কন্ঠে সে ঘোষণা করে — ''এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না।''[১০৬] অথবা ''মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা,-আমি মুক্তি চাই।''[১০৭]

— কুমুর এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ , তার নিজস্বতা, তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বাঁচার প্রত্যাশা-ই যে যথার্থ অর্থে আধুনিকতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এইখানেই 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চোখের বালি' 'ঘরে বাইরে' 'গৃহদাহ', উপন্যাসের থেকে 'যোগাযোগ' স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। সব কটি উপন্যাসেই রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা-সংকটের চিত্র। কিন্তু ঐ উপন্যাসগুলির পাত্র-পাত্রীদের সমস্যা-সংকটের সঙ্গে কুমুর আত্মিক সংকটের পার্থক্য সম্পূর্ণ আলাদা। জীবন ভাবনায় 'গৃহদাহ'-এর অচলা নয়, কুমুদিনীই সমকালের তুলনায় প্রগতিশীল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'গৃহদাহ' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র অচলা পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে পরপুরুষ সুরেশের সঙ্গে সহবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। যে লোকলজ্জা ও সামাজিকতার ভয়ে সে সুরেশের শয্যায় রাত্রি যাপন করে এবং আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়, সেই একই কারণে আত্মগ্লানির কথা গোপন করে, আর নিজেকে স্বামী মহিমের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখে। সমস্ত লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে অচলা তার একান্ত আপনজন মহিমের কাছে ফিরে যেতে পারে না। তাকে একটু আশ্রয় বা আশ্রমের ঠিকানার জন্য স্বামীর কাছে কাতর আবেদন জানাতে হয়। উপন্যাসের পরিণতিতে শরৎচন্দ্র অচলার কোনো উত্তরণের ছবি দেখাতে পারেন নি। তাই সুরেশের বিছানায় রাত্রি যাপনের পরদিন ভোরে অচলার মুখ দেখে পিতৃপ্রতিম পরম হিতাকাঙ্ক্ষী রামবাবু আঁৎকে ওঠেন। তিনি দেখলেন, অচলার "মুখ মড়ার মতো সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনই দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।"[১০৮]

অন্যদিকে আমরা দেখি, কুমুদিনী অনিচ্ছাকৃত স্বামী সহবাসকেই অপবিত্র বলে মনে করেছে। আর সে জন্য স্বামীর সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত সহবাসের "পরের দিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্য একবাটি দুধ নিয়ে এল, দেখলে কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, মুখের রঙ হয়েছে পাঁশের মতো।"[১০৯]

তবে কুমু গ্লানিকেই জীবনের চরম সত্য বলে মনে করেনি। তার কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা-ই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সম্ভোগের গ্লানি-ই তাকে উত্তরণের পথ

দেখিয়েছে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছে — দৈব নির্দেশের চেয়ে নিজস্বতা ও স্বাধীনতা অনেক বড়ো। কুমুর এই উত্তরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় তলস্তয়ের (Leo Tolstoy — 1828-1910) 'রেজারেকশন' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র মাসলোভার নবলব্ধ মূল্যবোধ তথা উত্তরণের কাহিনিকে। কুমু এক সময় তার শিক্ষাগুরু দাদা বিপ্রদাসকে বলেছিল, ''তুমি যাকে মুক্তি বলো, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাঁধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও, কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে''[১১০]। এই কুমুই আবার দাম্পত্য-সম্পর্কের শৃঙ্খলে কিছুদিন বন্দী জীবন যাপন করে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে দাঁড়ায়। অন্তঃসত্ত্বা কুমুকে বিপ্রদাস যখন বলে,— ''তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করবো কোন স্পর্ধায়?''[১১১] তখন কুমু দৃঢ়তার সঙ্গে জানায় যে, এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না। তার পরম উপলব্ধি — যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী তাই অশুভ।

জীবন অভিজ্ঞতা কুমুকে প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাস, আবেগ-কল্পনার জগৎ থেকে নামিয়ে এনে যুক্তিবাদের দৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, বিপ্রদাসের ইচ্ছায় কুমু স্বামীর সংসারে ফিরে যায়। কুমুর এই প্রত্যাবর্তনকে অনেকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেন নি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের কটাক্ষ সুবিদিত —''যোগাযোগ যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিল আমি তো ভেবেই পেতুম না। এই দুর্ধর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ অফ ওয়ারের শেষ হবে কী করে? কিন্তু কে জানত সমস্যাও এত সহজ ছিল — লেডী ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে।''[১১২]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জনরায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ মনস্বী সমালোচকগণও কুমুর পরিণামকে অসংগত বলে মনে করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপধ্যায়ের মতে কুমুর স্বামীগৃহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হলে উপন্যাসের 'গঠন সৌষ্ঠব' ও 'সমন্বয় কৌশল' উন্নততর হত। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য —''পঙ্কিল-লালসাময় সম্পর্কের স্থিতিকালের মধ্যেই উপন্যাসের

যবনিকাপাত হইয়াছে। এই পাপ-কলুষিত সংসারে কুমুদিনী কিভাবে ও কিরূপ মর্যাদা লইয়া ফিরিয়াছে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। মধুসূদন তাহাকে নিজ ভাবী বংশধরের জননী-হিসাবেই ডাক দিয়াছে এবং বিপ্রদাসের সমস্ত উচ্চ সমাজ-নীতি-মূলক বক্তৃতা সত্ত্বেও, নারী-স্বাধীনতার সীমানির্দেশ-প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াই কুমুদিনীকে সে ডাকে সাড়া দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার সংসারের এই নূতন ও অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনের মধ্যে তাহার স্থান কোথায় — এই প্রশ্ন আমাদের কল্পনা ও অনুমান শক্তিকে পীড়িত করিতে ছাড়ে না। মধুসূদন কি শ্যামার কলুষিত আসনের এক পার্শ্বেই তাহার অবহেলার স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, না, স্ত্রী অপেক্ষা সন্তানের জননীকে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ? যে অবিনাশ ঘোষালের জন্মতিথি রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র ও পুষ্প-মাল্য-সম্ভারের দ্বারা ভারাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সে তাহার পিতা-মাতার মর্মান্তিক বিচ্ছেদকে কীরূপ যোগসূত্রে বাঁধিয়াছে, তাহাদের বিরোধ-বিড়ম্বিত সম্পর্কের মধ্যে কিরূপ স্থায়ী আপস-সন্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে, এই সমস্ত অনুচ্চারিত কৌতূহলপ্রশ্ন নীরবে উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়াই উপন্যাসটির অতর্কিত পরিসমাপ্তি আর্টের দিক্ দিয়া একটা গুরুতর ত্রুটি বলিয়াই ঠেকে।''[১১৩] কিন্তু আমাদের মনে হয় সময়ের নিরিখে বিচার করলে অন্য উপসংহারই অবাস্তব হত।

রবীন্দ্রনাথ আসলে কুমুদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন, শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি সংস্কারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকলে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' তাদের মনের মিলনকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। কুমু ও মধুসূদনের কয়েক মাসের দাম্পত্য জীবনে তাদের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল তা এতই গভীর ও ব্যাপক যে, সন্তান তাদের সেই বিরাগ ও ব্যবধান দূর করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তার প্রত্যাবর্তনকে পুনর্মিলন ভাবা ঠিক নয়। স্বামীর সঙ্গে মানসিক বিচ্ছেদ যখন অমোচনীয়, তখনও পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে পড়ে বাঙালি মেয়েদের বুকের যন্ত্রণা বুকে চেপে রেখে যান্ত্রিকভাবে স্বামীর সংসার করে যেতে হয়। প্রেমহীন সংসার করার দুঃখ শুধু কুমুর একার নয়, আরও অনেকের। উপন্যাসে তার দুঃখের মধ্য দিয়ে যেমন

ধরতে পারা যায় বৃহত্তর সামাজিক দুঃখের স্বরূপকে, তেমনি তার বলিষ্ঠ ঘোষণায় নারীর আত্ম-জাগরণ ও মুক্তির সংকেত পাওয়া যায়।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন থেকে ১৩৩৫ সালের চৈত্র পর্যন্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'তিনপুরুষ' নাম দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল। প্রথম দুই কিস্তি প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই গল্পের নাম পরিবর্তন করে রাখেন'যোগাযোগ'। উপন্যাসের সূচনা হয়েছে ঘোষাল বংশের তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্ম দিন পালনের কথা বলে — ' আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্ম দিন। বয়স তার হল বত্রিশ।' উপন্যাস যেখানে সমাপ্ত হয়েছে, গল্পের শুরু হয়েছে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে সেখান থেকে, ৩২ বছর কয়েক মাস পূর্বে। কিন্তু উপন্যাসে ঐ সময়কালের সমগ্র ইতিহাস বিবৃত করা হয় নি। বিশেষ করে মধুসূদনের পুত্র অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের কোন ইতিহাসই জানা যায় না। তার জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে কাহিনির সূচনা ধরেই রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে গেছেন তার পিতামহ আনন্দ ঘোষালের আমলে। উপন্যাসটিতে মোট ৫৮টি পরিচ্ছদ রয়েছে। প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে আছে বংশ পরিচয় ও ঘোষাল-চাটুজ্জেদের বিরোধের ইতিহাস ও তার পরিণতি। এরপর সাতটি পরিচ্ছদ জুড়ে রয়েছে চাটুজ্জে পরিবারের ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র এবং ঐ পরিবারের কন্যা কুমুকে মধুসূদন ঘোষালের বিবাহের প্রবল ইচ্ছার কথা। দশম থেকে দ্বাদশ এই তিনটি পরিচ্ছেদে কুমুর বিবাহের সম্বন্ধ, কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ বিষয়ে বিপ্রদাসের আপত্তি, কুমুদিনীর প্রবল ইচ্ছা— ইত্যাদি বিষয়গুলি রয়েছে। তেরো থেকে উনিশ পরিচ্ছেদে মধুসূদন-কুমুদিনীর বিবাহের উদ্যোগ, বিবাহ, বিপ্রদাসকে অপদস্থ করার বিষয় রয়েছে। কুড়ি থেকে আটান্ন পরিচ্ছেদ অর্থাৎ উপন্যাসের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে মধুসূদন-কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা-সংকটের অসংখ্য চিত্র। ১৯ বছরের ব্যক্তিত্বময়ী কুমুদিনীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে নারী চরিত্র সম্পর্কে আনাড়ী মধুসূদন প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খায়। তার এই ব্যর্থতার জন্য কুমুর দাদা বিপ্রদাসকেই দোষী বলে মনে হয়। কুমুর জীবনে একমাত্র আদর্শ দাদা, দাদাই তার শিক্ষাগুরু।

বিপ্রদাসের প্রতি মধুসূদনের প্রতিশোধস্পৃহা যত বেড়েছে। কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের মানসিক দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পেয়েছে।

চাটুজ্জে পরিবারের মেয়ে কুমুদিনীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ঠিক হয় ঘোষাল বংশের সফল ব্যবসায়ী রাজবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের। প্রজাপতির নির্বন্ধ তাদেরকে দাম্পত্য সম্পর্কের শৃঙ্খলে বাঁধে। কিন্তু বিবাহের দিন থেকেই স্বামী সম্পর্কে কুমুদিনীর মনে অনীহা ও ঘৃণা তীব্র হতে থাকে। তার অশান্ত মন বলে ওঠে —

"..স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছিনে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্ম সমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।"[১১৪]

এই কুমুদিনীই বিয়ের আগে মনে মনে সুখী দাম্পত্য জীবনের এক রঙিন স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন বিবাহ-সংস্কারে বিশ্বাসী কুমু মনে করত তার পতিদেবতা হবে শিবতুল্য। তার প্রত্যাশা যে অপূর্ণই থাকবে তা বিবাহ মুহূর্তের শুরুতেই বোঝা যায় — "বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দু চোখ দিয়ে কেবল জল পড়েছে। বরের হাতে যখন হাত দিলে সে হাত ঠান্ডা হিম, আর থর থর করে কাঁপছে। শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেছে? হয়তো দেখেনি। এদের ব্যবহারে সবসুদ্ধ জড়িয়ে স্বামীর উপর তার ভয় ধরে গেছে। পাখির মনে হচ্ছে তার জন্য বাসা নেই, আছে ফাঁস।"[১১৫]

ঘোষাল ও চাটুজ্যেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল পুরুষানুক্রমিক বিরোধের সম্পর্ক। তাই শত্রু পরিবারের মেয়েকে অঙ্কশায়িনী করবার এক ধরনের সুখ-বাসনার জন্য মধুসূদন হয়তো বলেছিল — 'ওই চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই'। প্রতিহিংসার বাসনা থাকলেও কুমুর সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যবোধ মধুসূদনের মনকে দুর্বল করে তোলে। কুমুর মন পাবার জন্য মধুসূদনের মনের গভীরে একটা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের রুচি ও প্রবণতার ধারাবাহিক মিলহীনতা এবং কুমুর আজন্ম লালিত স্বামী-সংস্কার। তাদের জীবন "জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে — জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে নারে"[১১৬]। মিলহীন মিলনের বেদনা ও গ্লানি কুমুর দাম্পত্য-জীবনকে বিধ্বস্ত করে তোলে। সবার অলক্ষ্যে ঝরতে থাকা গোপন রক্তপাত তার মনকে ক্লান্ত থেকে ক্লান্ততর করে তোলে।

দাম্ভিক হলেও মধুসূদন মানুষটা খুব যে খারাপ এমন নয়, নিজের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের জোরে সমাজে তার প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব সময় দাম্পত্যে সুখ-শান্তি এনে দিতে পারে না। আমাদের সমাজে স্ত্রীকেই স্বামীর যোগ্য হয়ে উঠতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয়, তার বিনিময়ে দাবী করে সেবা-যত্ন। স্ত্রীকে সে সহধর্মিণী বা সহকর্মিনী হিসেবে দেখে না, দেখতে চায় পরিচারিকা হিসেবে। তাই ভাবে-স্বভাবে নারীর যোগ্য হয়ে ওঠবার জন্য কোনো চেষ্টা পুরুষ করতে চায় না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মনুষ্যত্বকেই গুরুত্ব দিতেন। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র হিসেবে তিনি মানুষের গুরুত্ব বিচার করতেন না। তাই এক সময় কুমুদিনীকে বলতে শোনা যায় — 'আমি ওদের বড় বউ, এর কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই'। দাদা বিপ্রদাসের কাছে কালোচিত শিক্ষা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দীক্ষায় দীক্ষিত কুমুদিনী বিবাহ-সম্পর্ককে প্রজাপতির নির্বন্ধ জেনেও স্বামীর সংসারের সব অত্যাচার -অনাচার মুখ বুজে সয়ে যাওয়াকে জীবন বলে মনে করেনি। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

মধুসূদন কুমুকে মানসিক আঘাত দেবার জন্য ঠেস দিয়ে যখন বলে —

'' আবার তোমার সেই নুরনগরি চাল ? ' কুমু বলে — 'আমি যে নুরনগরেরই মেয়ে।'

ক্রোধে অন্ধ মধুসূদন বলে — '' যাও তাদের কাছেই যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলাম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।''

কুমু কাঠ হয়ে বসে রইল, কোনো উত্তর করলে না। কুমুর হাত ধরে অসহ্য একটি ঝাঁকানি দিয়ে মধুসূদন বললে, ' মাপ চাইতেও জান না ?'

' কিসের জন্য ?'। তুমি যে আমার এ বিছানার উপর শুতে পেরেছ তার জন্য।' কুমু তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।''[১১৭]

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখি, মধুসূদন কুমুকে তার দাদা বিপ্রদাসের কাছ থেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে যায় এবং কুমুকে তার নিজের ঘর অর্থাৎ স্বামীগৃহে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করে। এই ঘরে ফেরা প্রসঙ্গে তাদের যে পারস্পরিক কথোপকথন হয় তা তাদের তীব্র মানস-সংঘাতকেই ব্যক্ত করে —

''আমাকে তোমার দরকার নেই'।

মধুসূদন বুঝলে শ্যামা সুন্দরীর খবরটা কানে এসেছে। এটা অভিমান। অভিমানটা ভালই লাগল। বললে ' কী যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে?'

এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে কুমুর প্রবৃত্তি হল না। সংক্ষেপে আর একবার বললে —

''আমি যাব না।''

''মানে কী? বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না—''

কুমু সংক্ষেপে বললে — ''না!''[১১৮]

— কুমুদিনীর এই প্রতিবাদকে অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা যেতে পারে, পুরুষতন্ত্র ও সমাজ-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যে বিবাহ-প্রথা নারীর মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের কৌতূহল — কুমু নিজের ইচ্ছায় মধুসূদনকে দাম্পত্য সম্পর্কের সুতোয় আন্তরিক ভাবে বাঁধতে চেয়েও কিছুদিন পর কেন বলতে বাধ্য হল — 'আমাকে তোমার দরকার নেই।' অথবা 'আমি যাব না।' আমাদের পর্যালোচনা ঐ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে।

মধুসূদন-কুমুদিনীর দাম্পত্য-সম্পর্কের সমস্যার সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ ঃ

সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে কুমুদিনী স্বেচ্ছায় মধুসূদনকে স্বামীত্বে বরণ করে নেয়। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই তাদের সম্পর্ক ভ্রষ্ট বা নষ্ট দাম্পত্যে পর্যবসিত হয়। এর কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে কুমুদিনীর উপর মধুসূদনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার দিকে। মধুসূদনের ঐ আধিপত্যবোধ বা প্রভুত্ব বাসনার মূল প্রোথিত রয়েছে একটি মনস্তাত্ত্বিক সূত্রের মধ্যে। যাকে ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় বলা হয় inferiority complex বা হীনমন্যতাবোধ। — এই হীনমন্যতাবোধ মধুসূদনের চরিত্রের

একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মুন্সীয়ানায় তার চরিত্রের ঐ প্রবৃত্তির বিচিত্র রূপকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিয়ের আগে প্রায় সব মেয়েরাই স্বামীর আচার-আচরণ কেমন হবে ভেবে বা অজানিত যৌন-জীবন নিয়ে একটু চিন্তিত থাকে। বিয়ের পর তাই ঘনিষ্ঠ মিলনের পূর্বে স্বামীর উচিৎ মানসিক নৈকট্য তৈরীর জন্য স্ত্রীকে একটু সময় দেওয়া। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদেরই যেহেতু পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে স্বামীর সংসারে গিয়ে নতুন ঘরানায় মানিয়ে নিতে হয়, তাই তাদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করাও স্বামীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু উপন্যাসে আমরা দেখি, ফুলশয্যার রাতে কুমুদিনী অচৈতন্য হয়ে পড়লে মধুসূদন তার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায়নি। বাড়িয়ে দেয় নি সহমর্মিতার হাত। তার সঙ্গে নিষ্ঠুর, অমানবিক ব্যবহার করে। একটু সুস্থ হয়ে কুমু মধুসূদনের ঘরে ঢোকা মাত্রই সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে — ''বাপের বাড়ি থেকে মূর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চলতি নেই। তোমাদের ঐ নুরনগরি চাল ছাড়তে হবে।''[১১৯]

বিয়ের পূর্বে কুমু কল্পিত স্বামীর যে রূপ মনের মধ্যে ধ্যান করতো বিয়ের পর সে যাকে বাস্তবে পেল সে ঠিক উল্টোটি। ভাবনা আর বাস্তব যে সব সময় মেলে না তা বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও ফুলশয্যার রাত থেকেই কুমু বুঝতে পারে। এ সব সত্ত্বেও কুমু ভারতীয় নারীর প্রাচীন স্বামী সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য ও রুচিগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করে সে মধুসূদনকে ভালবাসতে চেয়েছিল, তাঁর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরী করতে চেয়েছিল। এই জন্য তার প্রয়োজন ছিল একটু সময়ের। সে মন তৈরীর জন্য মধুসূদনের কাছে সময় চেয়েও পায় নি। মধুসূদন কুমুকে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করেনি কেন? দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ভূমিকাই তো সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, শত্রু পরিবারে মেয়েকে অঙ্কশায়িনী করার সুখ-বাসনা পুরণের জন্য মধুসূদন কুমুকে বিয়ে করেছিল ঠিকই, কিন্তু কুমুর রূপ-সৌন্দর্য সত্য সত্যই তাকে মুগ্ধ করেছিল। কুমুর সামগ্রিক সৌন্দর্য তার মধ্যে যে বোধের সঞ্চার ঘটায় তা হল 'হায়রে, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য সুন্দর।'

আসলে শিক্ষা দীক্ষা, রুচিবোধ ও আভিজাত্যে মধুসূদন কুমুর প্রাধান্য মনে মনে স্বীকার করলেও সত্যটিকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে চায় নি। তাই সচেতন মনের

ভাবনাকে দমন করে পাঠিয়ে দিয়েছে অবচেতনের গহ্বরে। কারণ, কুমুদিনীর কাছে, চাটুজ্জে পরিবার, নিজ পরিবার-পরিজন ও কর্মস্থলে আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার ভয়। কুমু মিলনের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হবার পূর্বেই তাকে দেহদানে বাধ্য করা, আশ্রিত ভাই নবীনকে সামান্য কারণে দেশে পাঠিয়ে দেবার ভয় দেখানো, বিধবা ভ্রাতৃবধু শ্যামাসুন্দরীকে ভর্ৎসনা করা, কুমুর অনুপস্থিতিতে তাকে সম্ভোগ করা, বিপ্রদাসের প্রতি তার ক্রোধ — এ সব কিছুর মূলেই রয়েছে মধুসূদনের অবচেতন মনে নিজের সম্বন্ধে এক ধরনের হীনতাবোধের ধারণা।

মধুসূদন ঘোষাল বংশের দ্বিতীয় পুরুষ। সে ভুলতে পারে নি চাটুজ্জেদের শত্রুতায় তার বাবার এলাকা ছাড়ার ইতিহাস এবং রজবপুরে আড়তদারের মহুরি হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের কথা। সে ছাত্রাবস্থা থেকেই ভয়ংকর দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। তার স্কুলের বন্ধু কানাই গুপ্তের বাবার সাহায্য পেয়ে এবং ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সে প্রভূত অর্থ সম্পত্তির মালিক হয়েছে। কুমুকে বিয়ের পর তার রূপ-সৌন্দর্য, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ মধুসূদনকে ভিতরে ভিতরে তার দুঃসহ দারিদ্র্য ও জীবন সংগ্রামের কথাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। আর সে তখন মধুপ্রাসাদের সাফল্যের জয়পতাকা উড়িয়ে তার হীনতাবোধকেই ঢাকতে চেয়েছে।

নারী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং হীনতা বোধের জন্য মধুসূদন দাম্পত্য-জীবনের প্রথম দিন থেকেই স্ত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে একজন দক্ষ ব্যবসায়ীর মতো।

রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের অবচেতন মনের হীন প্রবৃত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন — "মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল। সেই জন্য 'পয়সার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করতো, সে গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল।"[১২০]

মধুসূদনের চরিত্রের আধিপত্যবোধ, নিষ্ঠুরতা, অসংকোচ লালসা, অনমনীয় দম্ভ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি হীনমন্যতাবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আর হীনতাবোধ থেকেই যে প্রভুত্বস্পৃহার সৃষ্টি হতে পারে তা মনোবিজ্ঞান-স্বীকৃত।

কুমুদিনীর ভাগ্যবাদী মন পাতিব্রত্যের প্রাচীন সংস্কারবশত দাদা বিপ্রদাসের আপত্তি সত্ত্বেও মধুসূদনকে স্বামী হিসাবে বরণ করেছিল। সে বিয়েকে জন্মান্তরের বন্ধন এবং পতি হবে পরম গুরু — এই ধারণা পোষণ করত। শুধু তাই নয়, সামাজিক বিবাহে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সুচয়নের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে — এ কথা সে বিশ্বাস করত না। কুমুর রোমান্টিক মনে স্বামী সম্পর্কে যে ধারণা ও মনোভাব ছিল রবীন্দ্রনাথ অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তা ফুটিয়ে তুলেছেন— "যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ বেদনার পূরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ সে কাছে পেত তা হলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জুরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোন পথিকও দ্বারে এসে দাঁড়াল না। ... তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে তার নিরুদ্ধ ভালবাসা পূজার ফুল আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ্যে খুঁজছে। সেই জন্য ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল তখন কুমু তার ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে — জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবার তোমাকেই তো পাব ? অপরাজিতার ফুল বললে এই তো পেয়েইছ।"[১২১] তার বিশ্বাস ছিল যে, মা যেমন সন্তানকে বেছে নেয় না, মেনে নেয়, তেমনি কে স্বামী হবেন তা বিধাতাই ঠিক করে রাখেন। স্বামী নামক ভাব পদার্থটি তার কাছে নির্বিকার নিরঙ্কুশ ! এখন স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন ওঠে — কুমুদিনী কেন স্বামীর কাছে সহজে আত্মনিবেদন করতে পারে নি ? অথবা, স্বামীর মানসিকতার সঙ্গে একদিনের জন্যেও খাপ খাইয়ে চলতে না পারার কারণ কী ?

কুমু মধুসূদনের পারস্পরিক বোঝা পড়ার অভাব বা দাম্পত্য-দ্বন্দ্বের মূল কারণ তাদের স্বভাব-প্রকৃতির বৈপরীত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। উপন্যাসে কুমুর পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মনের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চেতন, অবচেতন এবং অচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ বলে আমাদের মনে হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা শহরে। দীর্ঘক্ষণ তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলেচনাও হয়েছিল। তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে 'যোগাযোগ' রচনার পূর্বেই ফ্রয়েডের মন-সম্পর্কিত চিন্তা-

ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে গেছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে তিনি 'অবচেতন মন' শব্দটি ব্যবহারও করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে তো দেখাই যায়, তিনি কুমুর মনের আবেগ ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে কুমুদিনীর মানসিক দূরত্ব সৃষ্টির কারণগুলি হল —

দাদা বিপ্রদাসকে কুমু জীবনের একমাত্র আদর্শ পুরুষ ভাবে — তার এ ভাবনার গভীরে রয়েছে ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা (Electra Complex)। যা স্বামীকে একান্ত আপন করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

স্বামী সম্পর্কে কুমুর রোমান্টিক ধারণা, নারী সম্পর্কে মধুসূদনের স্থূল ভাবনা।

প্রেমের পাত্রের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা বা Sex repulsion।

কুমুর আধ্যাত্মিক আবেগ।

স্বামী-স্ত্রী-দুজনের চেহারা ও মানসিকতার ব্যবধান — স্নিগ্ধতার বৈপরীত্যে রূঢ়তা ; মার্জিত রুচি, আভিজাত্যবোধ, ধৈর্য, সংযম, শোভনতা, শালীনতার বিপরীতে — হৃদয়হীনতা, রুচিহীনতা, অসংযম, লালসা, স্বৈরীচারী মনোভাব ইত্যাদি।

কুমুর আত্ম সচেতনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, অধিকার বিষয়ে অতিমাত্রায় স্পর্শ কাতরতা।

শ্যামাসুন্দরী প্রসঙ্গ — লেখকের বর্ণনায়, 'শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়েছিল।' — ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করলেই স্বামীর সঙ্গে আত্মিক-সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কুমুর মানস-জটিলতা ও দ্বন্দ্বের স্বরূপটি স্পষ্ট ধরা পড়বে।

পিতৃহীন কুমুদিনী দাদা বিপ্রদাসের স্নেহ ভালোবাসায় বড় হয়েছে। সে দাদার কাছেই সমস্ত রকম শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে। দাদার উন্নত জীবনাদর্শ, শিল্প-সাহিত্য সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। কুমুর বিবাহ-পূর্ব জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল দাদা। আশৈশব দাদার সান্নিধ্যে থাকার জন্য নিজের অজ্ঞাতেই দাদা বিপ্রদাসের প্রতি তার মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ না করলেও আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, দাদার প্রতি কুমুর ঐ আকর্ষণ বা অনুরাগ হল হল 'ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা বা ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় যাকে বলে Electra

Complex । দাদার প্রতি সুগভীর আকর্ষণবোধ থেকেই যে কুমুদিনীর মন স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের মন্তব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় —

"আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ওই যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হল, আমার যথেষ্ট ধন নেই — মনে হল, যদি রাজ চক্রবর্তী সম্রাট হতুম তা হলেই ওকে এ ঘরে মানাত। যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে এর স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশ মর্যাদার মধ্যে — অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে। সেখানে বাইরে থেকে যে সে প্রবেশ করতেই পারে না — সেখানেই আপন স্বাভাবিক স্বত্ব নিয়ে বিরাজ করছে বিপ্রদাস — তাকেও ওই কুমুর মতোই একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব সর্বদা ঘিরে রয়েছে।

মধুসূদন এই কথাটাই কিছুতে সহ্য করতে পারে না। বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব।... বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কী রকম খাটো হয়ে থাকে, সেইটেতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরে মধুসূদন জোর করতে পারছে না — আপন সংসারে যেখানে সবচেয়ে তার কর্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সবচেয়ে হটে গিয়েছে।"[১২২]। অথবা ,"সেই দাদার আংটি শনির সিঁধকাঠি — এ ঘরে আনা চলবে না। কিন্তু তার চেয়েও ওকে এইটেই খোঁচা দিচ্ছে যে, এখনও কুমুদিনীর কাছে ওর দাদাই সবচেয়ে বেশী। সেটা স্বাভাবিক বলেই যে সেটা সহ্য হয় তা নয়। পুরনো জমিদারের জমিদারি নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে থাকে, তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালা ধরে, এও তেমনি। আজ থেকে আমিই যে ওর একমাত্র, এই কথাটা যত শীঘ্র হোক ওকে জানান দেওয়া চাই।"[১২৩]

'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' ইত্যাদি উপন্যাসে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিই দাম্পত্যে সমস্যা-সৃষ্টির মূল কারণ। কিন্তু 'যোগাযোগ' উপন্যাসে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ মধুসূদন কুমুদিনীর দাম্পত্যের মাঝে শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাবের ফলেই দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে —এমনটি নয়। শ্যামাসুন্দরীর আখ্যান মধুসূদন

কুমুর দাম্পত্য-সম্পর্কে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির একেবারে বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের জৈবিক সম্পর্কের বিষয়টি মধুসূদন-চরিত্রের রুচিবোধের স্থূলতার দিকটি স্পষ্ট রেখায় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হলেও উপন্যাসে তা অপরিহার্য কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে নি। ভিন্ন আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠার জন্য মধুসূদন ও কুমুর রুচিবোধের পার্থক্য তো ছিলই, এর সঙ্গে কুমুর মনের গভীরে প্রোথিত সনাতন ভারতীয় নারীর স্বামী-সংস্কার ও দাদা বিপ্রদাসের কাছ থেকে শিক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত স্বাতন্ত্র্য-পরায়ণ শিক্ষিত মার্জিত রুচিবোধের দ্বন্দ্বের ফলেই তাদের সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিন্ন আর্থসামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার জন্য মধুসূদন ও কুমুদিনীর চরিত্র-প্রকৃতি আলাদা হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উভয়ের চারিত্রিক বৈষম্য এতোটাই বেশি যে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের যোগসূত্রটাকেই মহাভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। দেখা যায়, দাম্পত্যে প্রেমের-সম্পর্ক তৈরি হবার পূর্বেই মধুসূদন সামাজিক সম্পর্কের সূত্র ধরেই কুমুর দেহ-মনের উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু কুমুর মন কিছুতেই স্বামী মধুসূদনের বশ্যতা স্বীকার করতে চায় নি। কুমু তার মনের বদ্ধমূল প্রাচীন স্বামী-সংস্কার ও মার্জিত রুচির প্রেম ধারণার সমন্বয়ে ভাবী স্বামীর রূপটি মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিল। সেই সঙ্গে বিবাহিত জীবনে সতীত্বের আদর্শকেও আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল। দাদার সান্নিধ্য, মীরাবাঈয়ের কাহিনী ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রভাবে তার প্রেম-ধারণা ও সতীত্বের আদর্শ রোমান্টিকতায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, সফল ব্যবসায়ী রাজাবাহাদুর মধুসূদনের মনে বিবাহ, নারী বা স্ত্রী সম্পর্কে কোনো রোমান্টিক আগ্রহ ছিল না। বিবাহ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বলেছেন, 'যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই।' আত্ম-বিকাশের জন্য সমাজ-শাস্ত্র যে বিবাহ বন্ধনের কথা বলে তার মূল প্রেরণা প্রেম। কিন্তু মধুসূদনের হিসাব শাস্ত্রে আত্মার বিকাশ, মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ, প্রেম ইত্যাদির স্থান কোন কালেই ছিল না। স্ত্রীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা অর্জনের জন্য যে ধৈর্য, যত্ন বা একটা কলানৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় তা তার অজানা ছিল। নারী তার কাছে শুধুমাত্র কামনার সঙ্গিনী, তার বেশি কিছু নয়। নারীর প্রতি মধুসূদনের মনোভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, " মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বৌঝিদের মধ্যে।

তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানা কানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের এই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষ চালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে একথা তার হিসাব দক্ষ সতর্ক মস্তিস্কের এক কোণেও স্থান পায়নি, বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।''[১২৪]

বিবাহের পূর্বে কুমুর মনে শিবতুল্য স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণের যে রঙিন স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল, বিবাহের আয়োজন পর্ব থেকেই সেই স্বপ্নের রঙ ফিকে হতে শুরু করে। কারণ বিবাহের উদ্যোগ-পর্ব থেকেই কুমুর বাস্তবের স্বামী মধুসূদন ঘোষালের দাম্ভিকতা, চারিত্রিক রূঢ়তা ও রুচির স্থূলতার দিকটি প্রকাশ পেতে থাকে। মধুসূদন শ্রম ও প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় রাজাবাহাদুর খেতাব পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু প্রাচীন আভিজাত্যের উদারতা ও আত্মসম্ভ্রমবোধ তার মধ্যে কিছু মাত্র ছিল না। তাই প্রাচীন আভিজাত্যের ছত্র-ছায়ায় বর্ধিত কুমুর আধুনিক রুচিবোধ স্বামীকে মন থেকে আত্মার আত্মীয় বা জীবন সঙ্গী হিসেবে ভাবতে বাধা দিয়েছে। এক্ষেত্রে আরো একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বিপ্রদাসের প্রতি স্বামীর রূঢ় ব্যবহার ও প্রতিশোধ পরায়ণ মানসিকতার বিষয়টি। দাদার প্রতি কুমুর সুগভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা। দাদা বিপ্রদাস তার হৃদয়ের একটা দুর্বলতম স্থান। মধুসূদন এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই কুমুর কাছে বিপ্রদাসের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যত বেশি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, কুমুর দৃষ্টিতে ততোই তার চারিত্রিক হীনতা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'মুর্ছো' যাবার প্রসঙ্গ তুলে মধুসূদন কুমুকে অপমান করলে কুমু তাকে বলে —''হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।''[১২৫] এই কথায় মধুসূদনের ক্রোধ বেড়ে যায়, বক্রোক্তি করে বলে —'' তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারি।''....কুমু বললে,

''দেখো নিষ্ঠুর হও তো হয়ো, কিন্তু ছোটো হয়ো না।''...কর্কশ কন্ঠে মধুসূদন বলে উঠল, ''কী ! আমি ছোট ! আর তোমার দাদা তোমার চেয়ে বড়ো'' কুমু বললে, ''তোমাকে বড় জেনেই তোমার ঘরে এসেছি।'' মধুসূদন ব্যঙ্গ করে বললে, বড়ো জেনেই এসেছ, না টাকার লোভে ? ''[১২৬] তখন কুমু সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে খোলা ছাদে মেঝের উপর গিয়ে বসল।''

মধুসূদনের দিক থেকে যত বেশি আঘাত এসেছে, কুমুর মন ততো মধুসূদনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এই দূরত্বের ব্যবধান বাড়তে বাড়তে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মতো একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অথচ কুমু মধুসূদনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল। মার্জিত রুচির কুমুর প্রত্যাশা ছিল ঐ আত্মসমর্পণ হবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার। এজন্য দাদা বিপ্রদাসের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মধুসূদনকেই স্বামীত্বে বরণ করেছিল— ''নিজেকে দেব বলেই তৈরী হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না।''[১২৭] মধুসূদনের কাছে ধরা দিতে গিয়ে কুমুর পিছিয়ে আসার কারণকে মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় বলে Sex repulsion বা প্রেমের পাত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা জনিত.. তীব্র প্রতিক্রিয়া। মধুসূদনের আচার ব্যবহারে কুমুর মন তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। তাই কামার্ত মধুসূদনের প্রেম নিবেদনের প্রতি তার মনে প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়। এরফলে রাতের শয্যায় স্বামী মধুসূদন তাকে অন্তরঙ্গ মিলনের আহ্বান জানালে সে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। তার মুখ রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তখন স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়ায়। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের প্রতি কুমুর মনের এই বিরূপতাকে যেন একজন মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন —'' অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল — একেবারে ঠন করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল এক মুহূর্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় দেবে তার ফুল! থলিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠলো! তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে, 'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কহি।''[১২৮]

স্বামী অথবা স্ত্রীর Sex repulsion বা কামশীতলতা-কে দাম্পত্য দ্বন্দ্বের একটি বড় কারণ বলা যায়। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় প্রেমহীন দাম্পত্যেও

শরীরী-মিলনের সুঁড়িপথ ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার একটা বাতাবরণ তৈরী হয়। এরপর প্রেমহীন দাম্পত্য এক সময় বোঝাপড়ার সন্ধি-পথ ধরে প্রেমের-রাজপথে গিয়ে মেশে। কুমু এ ধরনের কোনো সন্ধি-পথ অনুসন্ধান না করে কামার্ত মধুসূদনের কাছ থেকে নিজেকে সব সময় দূরে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। মধুসূদনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পূর্বাপর বিচার না করে, তার চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বাস্তব সম্মত কোনো পন্থা অবলম্বন না করে কুমু দৈবের শরণাপন্ন হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে মিলনের জন্য আরাধ্য দেবতা গিরিধারীলালের নির্দেশের অপেক্ষা করেছে। দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে চায়। দৈবের অজুহাতে কোনো স্ত্রী যদি নারী -মনস্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ মিলনোদ্যত স্বামীকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে তবে তার ব্যবহার যে রুষ্ট থেকে রুষ্টতর হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কুমু ও তার দাদার প্রতি রাজাবাহাদুর মধুসূদনের বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করলে কুমুর কামশীতলতা জনিত রোগ এবং তার ফলে সৃষ্ট দাম্পত্য-সমস্যার জন্য কুমুকে যতটা দায়ী করা যায়, মধুসূদন তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী বলে আমাদের মনে হয়। কেননা, মধুসূদন কখনোই কুমুর হৃদয়ের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেনি, করলে হয়তো সমস্যা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত। কখনোই তাকে কুমুর ব্যথার পরশ সমবেদনার সঙ্গে অনুভব করতে দেখা যায় নি। কুমুর ব্যবহার যখনই তার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে, তখনই সে কুমুকে ধমক দিয়েছে। গায়ের জোরে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। ভালবাসা দিয়ে নয়, অর্থ-মূল্যে কুমুর হৃদয় জয় করার স্বপ্ন দেখেছে। দাদার দেওয়া আশীর্বাদী নীলার আংটি কুমুর কাছ থেকে 'চুরি করে নিয়ে' তাকে হীরা, চুনি, পান্নার আংটি উপহার দিতে চেয়েছে। 'বড়ো বউ ' আমার উপর রাগ করো না।'— এ ধরনের কথা দাম্ভিক মধুসূদনের মুখে বেশ কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে। রূঢ় ব্যবহারের জন্য কুমুর কাছে মাপ চেয়ে তার পদপ্রান্তে-তাকে বসতেও দেখা গেছে। ''কিন্তু প্রতিটি ভালকথা, অধিকাংশ মিনতি সে করেছে রাত্রে, আরও বিশেষভাবে বললে, শয্যাসময়ে। তার এই ভালোমানুষি, আসলে ছদ্মবেশ, নাকি, অনুশোচনা, স্থূল যৌনতাগিদ, নাকি, আত্ম সংশোধনের আন্তরিক চেষ্টা, বোঝা যায় না। কুমুর মতো পাঠকও ভরসা পায় না, ঘটনাচক্রে সেও অসহায় বোধ করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে যদিও আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত

রেখেছেন, ইদানীং দিনের মধুসূদনের সঙ্গে রাতের মধুসূদনের সুরের কিছু একটা তফাত ঘটে আসছে — এক বীণার দুই তারের মতো। ... মধুসূদন কি কিছু পরিমাণ স্কিজোফ্রেনিক ছিল? তার আচরণের অসঙ্গতি কিন্তু তেমন সন্দেহকে উস্‌কে দেয়।''[১২৯] — সমালোচকের এই মন্তব্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। তবে একাধিক কারণে মধুসূদনের প্রতি বিতৃষ্ণার ফলেই কুমুদিনীর Sex repulsion নামক মনোরোগটির সৃষ্টি হয়েছে — একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কুমুর আধ্যাত্মিক আবেগ, অধিকার সচেতনতা, স্পর্শকাতর মনোভাব প্রভৃতি ঐ রোগের আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র। মধুসূদনের কাছে কুমুর ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য-বোধের ধারণা কখনোই মান্যতা পায় নি। কুমু তার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হাবলুকে একটি কাগজচাপা (পেপার ওয়েট) দিয়েছিল স্বামীর অনুমতি ছাড়াই। সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে মধুসূদনকে উদ্দেশ্য করে কুমুকে বলতে শোনা যায়, ''তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে, আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না ?'' এর উত্তরে মধুসূদন কুমুকে জানায়, ''এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।'' এর পর কুমুর প্রতিক্রিয়া, ''কিছু নেই ? তবে রইল তোমার এ ঘর পড়ে।''[১৩০] দাদা বিপ্রদাসের সাহচর্যের ফলেই যে কুমুর মনে স্বাতন্ত্র্য-বোধের ধারণা বিকশিত হয়েছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, নারীর এই ধরণের বিদ্রোহের প্রকাশ রবীন্দ্র সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে দেখা যায়। 'স্ত্রীর পত্র'-এর (১৩২১ শ্রাবণ) মৃণালও নারীর স্বাধীন সত্তার অবমাননার জন্য স্বামী-সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছিল। তার অভিযোগ, 'আমাকে খুশি না করলেও চলে, আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, নারী জীবনের সার্থকতা সেবায়, ত্যাগে, দাসীত্বে নয়। দাসীত্ব নারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের অন্তরায় স্বরূপ। 'মহুয়া'র 'সবলা' কবিতায় নারী বলেছে — 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার।'
কুমুদিনী, মৃণালের মতো 'পয়লা নম্বর' (১৩১৪ আষাঢ়) -এর অনিলা, 'অপরিচিতা'-র (১৩২১ কার্তিক) কল্যাণীর কণ্ঠেও বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এরা কেউ-ই শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে আপোষ-রফা করেনি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আপোষ করাও

তো এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। স্থূলতার সঙ্গে সূক্ষ্মতার, শিল্পের সঙ্গে শিল্পহীনতার, সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের, সত্যের সঙ্গে মেকি-র সহাবস্থান জল-তেলের সহাবস্থানের মতোই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে — রবীন্দ্রনাথ এমনটিই মনে করতেন। তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসেও দেখা যায়, অনুভূতিশীল আনার মানসিকতার সঙ্গে কারেনিনার স্থূল চিন্তার পার্থক্যের জন্যই তাদের মধ্যে দুস্তর মানস-ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। আনা কারেনিনার স্থূল মানসিকতাকে মেনে নিতে পারেনি বলেই ভ্রন্স্কির প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে এর ঠিক উল্টোটি ঘটেছে। মধুসূদন কুমুর সংবেদনশীল মনের সূক্ষ্মভূমিতে পৌঁছতে না পেরে স্থূল রুচির শ্যামাসুন্দরীর কাছে গিয়ে সান্ত্বনা লাভ করতে চেয়েছে।

কুমুদিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি বা পক্ষপাতিত্বের কথা সর্বজন বিদিত। আর মধুসূদন যে কবির সহানুভূতি থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হয়েছে, সেকথাও আমাদের অজানা নয়। মধুসূদন চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে কবির সহানুভূতির পরিচয় ধরা পড়েছে কুমুকে সম্পূর্ণ করে পাবার জন্য মধুসূদনের ব্যাকুলতা ও শ্যামাসুন্দরী-কাহিনিকে কেন্দ্র করে কুমুর প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশের গভীরতার ক্ষেত্রে। কুমুকে মধুসূদন মন্ত্রপড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে করত, তাকে যে শুধুমাত্র শয্যাসঙ্গিনী হিসেবেই পেতে চায়নি — উপন্যাসে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন। কুমুর ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্য ও স্বভাবের বৈপরীত্য মধুসূদনকে দূর্বার গতিতে আকর্ষণ করত। লেখকের বর্ণনায় — "সিঁড়ির তলা থেকে মধুসূদন ফিরল, বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল। একটা কোন্ রুদ্ধ ঘরের সামনে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছিল। সেইটে তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেলবাতির কুঠিরের বাইরে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজা ভেজানো, দরজা খুলে গেল। সেই মাদুরের উপর গায়ে একখানা চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন — বাঁ হাতখানি বুকের উপর তোলা। দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ করে বাঁ পাশে এসে বসল। এই মুখটি যে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তার কারণ, মুখের মধ্যে তার একটি অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা। কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনদিন বিরোধ ঘটে নি। দাদার সংসারে অভাবের দুঃখে সে পীড়িত হয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থা

ঘটিত ব্যাপারে, সেটাতে তার প্রকৃতিকে আঘাত করে নি। যে সংসারে সে ছিল সে সংসার তার স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল। এই জন্যেই তার মুখভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্ন সরলতা, তার চলাফেরায় তার ব্যবহারে এমন একটা অক্ষুন্ন মর্যাদা। যে মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে, প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাকতে হয়, তার কাছে কুমুর এই সর্বাঙ্গীন সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয়। সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মত সহজ। তার সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টানছে।''[১৩১]

তাই মধুসূদন কুমুর মনপ্রাণ সম্পূর্ণ করে পাবার প্রত্যাশায় তার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে এক সময় অনুনয়ের সুরে কুমুকে বলে ওঠে, ''বড় বউ, তোমার মন কি পাথরে গড়া ?'' কুমুর মন পাবার বিভিন্ন প্রয়াস ব্যর্থ হলেও মধুসূদনের মনের গভীরে কুমুর প্রতি তেমন কোনো বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হয় নি, তৈরী হয়েছে দুর্বলতার ক্ষেত্র। তাই নবীনের মুখে যখন শুনলো, '' বউরাণী তোমার জন্য হয়তো জেগে বসে আছেন।''[১৩২] তখন কুমুর ভালোবাসার কাঙাল কর্মব্যস্ত মধুসূদন সমস্ত রকম দরকারী কাজকর্ম ফেলে মধ্যরাত্রে কুমুর কাছে ছুটে যায়। কুমুর প্রতি তার অন্তরের অনুরাগকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ উপমার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন — ''ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টল্‌মল্‌ করতে করতে চলেছে, একটি ছোট ডাঙার পাখি উড়ে এসে যেন মাস্তুলে বসল, ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্য মনে এনে দিল শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি।''[১৩৩] — এই বর্ণনাগুলি মধুসূদনের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভকে কিছুটা পরিমাণে হলেও উদ্ভাসিত করে চরিত্রটিকে বাস্তবের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করাতে চায়।

শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ায় পৌঁছে মনকে শীতল করার অপ্রতিরোধ্য প্রত্যাশা পূরণের আকাঙ্ক্ষাই মধুসূদনকে যান্ত্রিক জীবনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করেছিল। কখন কুমুর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে ? — তার মনের এই উদ্বেগ, ব্যাকুলতা তার খাওয়া-শোওয়া, অফিস যাওয়া ইত্যাদি রুটিন ওয়ার্কগুলিকে

এলোমেলো করে দেয়। ঔপন্যাসিক তার ঐ অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, — ''কখনও কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যবসার প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয় নি, এখন সেই দুর্লক্ষণও দেখা দিল। নিজের মার পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি এ কথা সকলেই জানে। তখন তার অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেছে। মধুসূদন আজ হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, বাঁধা-পথের বাইরে যে শক্তি তাকে এমন করে টানছে সে যে তাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছে না।

রাত্রের আহার সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এল। যদিও বিশ্বাস করে নি, তবু আশা করেছিল আজ হয়তো কুমুকে শোবার ঘরে দেখতে পাবে। সেইজন্যেই নিয়মিত সময় অতিক্রম করেই মধুসূদন এল। সুস্থ শরীরে চিরাভ্যাসমত একেবারে ঘড়ি-ধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত দেরী হয় না। পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার পর কুমু ঘরে আসে তার পরে চলে যায়, এই ভয়ে বিছানায় শুতে গেল না। সোফায় খানিকটা বসে রইল, ছাদে খানিকটা পায়চারি করতে লাগল। মধুসূদনের ঘুমোবার সময় নটা — আজ একসময়ে চমকে উঠে শুনলে তার দেউড়ির ঘন্টায় এগারোটা বাজছে। লজ্জা বোধ হল। কিন্তু বিছানার সামনে দু-তিনবার এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতে শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না।''[১৩৪]

বিবাহ পরবর্তীকালে মধুসূদনের আচার-আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কুমুর সাবেক কালের স্বামী-সংস্কার ও প্রাক্-বিবাহ পর্বের ভাবনা-চিন্তা যেমন ছিল তার সঙ্গে সমাজ-সংসার সম্পর্কে কিছুমাত্র বাস্তবতা বোধ থাকলে স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলাটা খুব একটা কঠিন ছিল না। কুমু একটু ধৈর্য ও ঔদার্যের সঙ্গে স্বামী যে আর্থ সামাজিক অবস্থার মধ্যে থেকে বড়ো হয়েছে সেই দিকটি এবং তার রূঢ়-নিষ্ঠুর আচার -ব্যবহারের স্বরূপটিকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বোঝার চেষ্টা করলে মধুসূদনকে যতটা হীন বা ছোটো বলে মনে হয়েছে, ততোটা হয়তো সে নয়। কিন্তু কুমু যে পরিবেশে যে ভাবে বড়ো হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তব জগতের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আশাভঙ্গের কোনো সংযোগ ছিল না। কুমুর কথায়, ''আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে।''[১৩৫] এক্ষেত্রে

স্বামীর সঙ্গে কুমুর বয়সের পার্থক্য, তার Superiority Complex ইত্যাদি বিষয়গুলি মধুসূদনের সঙ্গে বোঝা পড়ার ক্ষেত্রে তাকে একটা সন্তোষজনক প্লাটফর্মে দাঁড়াতে দেয় নি। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিবাহ ব্যবস্থায় পাত্র-পাত্রীর বয়সের বেশ খানিকটা ব্যবধান থাকাটাই স্বাভাবিক বলে গণ্য হত। কিন্তু কুমুর ক্ষেত্রে আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত বিপ্রদাস কুমু-মধুসূদনের বয়সের পার্থক্য বেশী হওয়ায় তাদের বিবাহের বিষয়ে আপত্তি করেছিল। দৈবে বিশ্বাসী স্নেহের বোন কুমুর কাছে শেষ পর্যন্ত তাকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

পাত্র পাত্রীর বয়সের সামঞ্জস্য ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলে বিবাহিত জীবন প্রেমহীন হয়ে পড়ে কিনা, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—" বিবাহ থেকে ইচ্ছাকে যদি সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয়, তা হোলে দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের স্থান হয় কী করে ? এ দেশের সঙ্গে যাদের যথার্থ পরিচয় নেই এবং যাদের বিবাহপ্রথা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরূপ তারা গোড়াতেই ধরে নেয় যে, আমাদের বিবাহ প্রেমহীন। কিন্তু সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। খাঁটি প্রেম নরনারীর স্বেচ্ছাসম্মত বিবাহেও- যে সুলভ নয়, তার অনেক প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যায়। বিবাহকে যদি মানতে হয়, তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ এমন কোন ব্যবস্থাই করতে পারে না, যাতে বিবাহের পূর্বে যা স্থির করা যায়, স্ত্রী পুরুষের সুদীর্ঘ বিবাহিত কালে তা অক্ষুণ্ণ সত্য হয়ে টিকতে পারে। এই জন্যেই বাইরের দিক থেকে এত লোকলজ্জা, এত আইনের শাসন। অথচ যে-সম্বন্ধ পরস্পর প্রেমের উপরেই সত্য, যখনই তাকে বাহিরের বাঁধনে জোর করে বাঁধা যায়, তা অত্যন্ত অশুচি হয়, তার মতো দুঃখ অপমান মানুষের পক্ষে আর কিছুই নেই। সন্তানের দায়িত্ব চিন্তা করে মানুষ এ সমস্তই স্বীকার করে, কিন্তু আজও কোনো সমাজই বলতে পারে নি যে বিবাহ-সমস্যার নির্দোষ সমাধান সে করেছে। সর্বত্রই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তারপরে আকস্মিক সুযোগ দুর্যোগের ভিতর দিয়ে হয় তলায় তলানো, নয় ঘাটে পৌঁছনো হয়ে থাকে।

এই সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ বলেছে বিবাহের গোড়াতেই ইচ্ছার বেগকে স্বীকার না করাই নিরাপদ। কেননা ইচ্ছা কল্যাণ বিচার করতে অসমর্থ।

তা হোতে পারে, কিন্তু যে-ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই সেটা যে প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সৈনিক। যখন সে অস্ত্র উদ্যত করে তখন তাকে ঠেকাবে কে ? ভারত বলেছে, যে-ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব ঘটায় তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমত করাই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভালো। ভারতে অল্প বয়সে বিবাহের মূল কারণই হচ্ছে এই।''[১৩৬]

বয়সগত ব্যবধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন যে, বালিকা বা কিশোরী অর্থাৎ অপরিণত মনের কোনো পাত্রীর সঙ্গে পরিণত মনের (যুবক, প্রৌঢ়) পাত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হলে তেমন কোন ক্ষতি হয় না, কারণ অপরিণত মনের বালিকা বা কিশোরীদের ইচ্ছা শক্তির গতিবেগ প্রবল থাকে না। তারা অল্প বয়সে যে স্বামী ভাবের পূজো করতে শেখে বিবাহের পর তার কাছেই ধর্মবলে আত্মসমর্পণ করে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানস কন্যা কুমুদিনীর বয়স উনিশ। আট, দশ বা বারো বছর বয়সের সঙ্গে উনিশের ব্যবধান আশমান-জমিন। কুমুর পরিণত মনের গঠনের জন্যই তার ইচ্ছাশক্তির গতিবেগ অনমনীয় হয়ে উঠেছিল। আর ইচ্ছাশক্তির ঐ প্রাবল্য ও তার জেদি স্বভাবই মধুসূদনের সঙ্গে তার রুচিগত সংঘাতকে অনিবার্য করে তুলেছিল। দাদার কাছে বন্দুক চালনা, ছবি তোলা, এসরাজ বাজানো, ঘোড়ায় চড়ার প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ইত্যাদির ফলে কুমুর মনে হয়েছিল পুরুষের কর্মযোগের পাশাপাশি নারীরও কর্মধারার এক সমান্তরাল ক্ষেত্র থাকা উচিৎ। পুরুষের সহকর্মিণী, সহধর্মিণী হওয়ার মধ্যেই নারীর গৌরব, আর পুরুষের দাসীত্বেই তার অগৌরব। এ প্রসঙ্গে অবশ্য বলা প্রয়োজন, দাদার শিক্ষা-সাহচর্যে কুমুর মনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও সাবেক কালের সঙ্গে আধুনিক কালের শিক্ষা-রুচির সমীকরণ (assimilation) ঘটিয়ে ব্যবহারিক জীবনে তার সুফল সে ফলাতে পারে নি। কারণ, সে বসবাস করত দুইকালের ' আলো-আঁধারের' মাঝে।

অর্জিত গুণাবলী, স্বাধীন মনন ও রুচিশীলতার অধিকার বোধ নিয়ে কুমুর একধরনের আত্মগর্ব থেকে তার ব্যক্তিত্বে Superiority Complex বা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বাসা বেঁধেছিল। ফলে তার স্বামীর কোনোরূপ আচার ব্যবহারকেই সে দাম্পত্য সম্পর্ক-তৈরির অনুকূল বা ইতিবাচক বলে মনে করে নি। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা

না করে সে স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সদস্যদের রুচি ও আচরণগত বৈপরীত্যের মধ্যে হীনতার দিকটিই দেখতে পেয়েছিল। স্বামীর বাড়িতে গিয়ে সেখানকার সমাজ পরিবেশ বুঝে নেওয়ার পূর্বেই সে স্বামীর সংসারের নিয়ম-নীতি নিয়ে জা নিস্তারিণীকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক ?" — নিজের সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা না থাকলে সে ফুলশয্যার পরের দিনই উষ্মার সঙ্গে এই জাতীয় মন্তব্য করত না। নীলার আংটি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের সময়েও তার আত্মগর্বের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

মধুসূদন কুমুর দাম্পত্যের মাঝে ফুলশয্যার রাতেই মধুসূদনের বিধবা ভ্রাতৃজায়া একটা সূক্ষ্ম প্রাচীর তুলে দিতে চেয়েছিল। তার কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে ঐ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। কুমুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সূত্রে প্রথমেই সে জানিয়ে দেয় মধুসূদন-কুমুর বয়সের বিস্তর ব্যবধানের বিষয়টি। সেই সঙ্গে আরো জানায় যে, মধুসূদন কঠিন মনের মানুষ, অর্থের জোরেই সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে, অন্য কোন যোগ্যতা তার নেই। ফুলশয্যার রাতে স্বামীর শয়ন কক্ষে পৌঁছবার আগেই কুমু মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কুমু মূর্ছিত হলে শ্যামাসুন্দরীর মনে কোনো সহানুভূতি বা মমত্ববোধ জাগেনি। তার অতৃপ্ত যৌবনের অবদমিত কামনা-বাসনা ঐ রাতে জেগে উঠে কুমুর প্রতি তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তার মনের দূর্বলতম স্থানটিতে মধুসূদনের জন্য একটা আসন পাতা ছিল। কিন্তু তাকে আমন্ত্রণের তেমন কোনো সুযোগ তার ভাগ্যে কোনদিনই জোটে নি। তাই সুযোগের প্রত্যাশায় মধুসূদনের কাছে ছুটে গিয়ে সে জানায় — 'বউ মুর্ছো গেছে।' এরপর কুমুর কী হয়েছে মধুসূদন জানতে চাইলে সে বলে, " তা তো বলতে পারি নে, দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তা একবার কি দেখতে যাবে ? "[১৩৭] মধুসূদনের সুপ্ত পৌরুষে একটু খোঁচা দিয়ে শ্যামাসুন্দরী সংবাদ পরিবেশন করে, সে মেয়েদের সহজাত বুদ্ধি প্রয়োগ করে মধুসূদনের শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাকে উষ্ণ-সহানুভূতি দেখায়। শ্যামার সহানুভূতি এবং কুমুর প্রতি বিরূপ মনোভাবের ফলেই মধুসূদন ফুলশয্যার রাতেই কুমুর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কুমুর মূর্ছা যাবার ঘটনাটিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করলে বা বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখার জন্য মধুসূদনকে অনুরোধ করলে ঐ দিন হয়তো কুমুকে নির্মমভাবে মধুসূদনের কাছে অপমানিত হতে হত না। মধুসূদন-কুমুর দাম্পত্যে প্রেমের সম্পর্ক

গড়ে ওঠার আগেই এই ভাবে দ্বন্দ্বের বীজ বপন করার ক্ষেত্রে শ্যামাসুন্দরী পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। এরপর সে বিভিন্ন সময়ে নানা অছিলায় তার রূপ-যৌবনের প্রতি মধুসূদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। তার অতৃপ্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য মধুসূদনের যাতায়াতের পথে দক্ষ শিকারীর মতো ওঁৎ পেতে থেকেছে। ছলা কলায় পটিয়সী মধ্যবয়স্কা ঐ রমণী সহজাত বুদ্ধি বলেই ভেবে নিয়েছিল, মিলনের জন্য উন্মুখ মধুসূদন কুমুর কাছে যথাযোগ্য মর্যাদা না পেয়ে অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে দগ্ধ হৃদয়ে শয়নকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। শ্যামার অন্তরে মধুসূদনের প্রতি বিশেষ দুর্বলতার জায়গা ছিল। মধুসূদনের মনের কোণে অবশ্য শ্যামাসুন্দরীর কোনো জায়গা ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের দাম্পত্য-দ্বন্দ্ব যে রাত্রে চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে, কুমুর সমস্ত প্রকৃতি তার প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলে মনে হয় সেই রাত্রেই উত্তপ্ত হৃদয়কে ভালবাসার পরশে শীতল করার প্রত্যাশায় সে শ্যামাসুন্দরীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়। শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের ঐ রাতের যৌন-সম্পর্ক যে শুধুমাত্র অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ নয়, রবীন্দ্রনাথ ঐ ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন— "ভালবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরমমূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেই অনুভব করার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিল। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবনমন দিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্রে কাজের জোর পেলে, যে অমর্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলে।"[১৩৮] মধুমূদন শ্যামার ব্যাভিচারের ঘটনাটি কুমুর দাম্পত্যের দ্বান্দ্বিক পরিণতির অন্তিম পর্যায়ে ঘটেছে। মধুসূদনের জীবনে শ্যামার আবির্ভাবের পূর্বেই মধুসূদন-কুমুর স্বভাবের পার্থক্য তাদের দাম্পত্য সংকটকে জটিল করে তুলেছিল। ঐ ঘটনাটি তাই দাম্পত্য-সমস্যার ক্ষেত্রে কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি করে নি। কিন্তু দাম্পত্যে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিকে ঐ ঘটনার উত্তাপ এমনভাবে টলিয়ে দিয়েছে যে কুমুর দিক থেকে ভবিষ্যতে মধুসূদনের সঙ্গে প্রেমের-সম্পর্ক গড়ে তোলার সমস্ত সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যায়।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, সহজলভ্য শ্যামার দৈহিক সংসর্গে কুমুর অভাব না মিটলে মধুসূদন কুমুকে তার কাছে ফিরিয়ে আনতে যায়। কুমু দৃঢ়তার সঙ্গে

স্বামীগৃহে ফেরার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। " বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না — " মধুসূদনের এই প্রশ্নের উত্তরে কুমু একটি মাত্র শব্দই বলেছিল," না"। তৎকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাল একজন বধূর মুখে স্বামীগৃহে ফেরার প্রসঙ্গে ঐ ধরনের উত্তর শোনায় অভ্যস্ত ছিল না। আমাদের ভাবাবেগ নির্ভর বাংলা কথাসাহিত্যও সেসময় কুমুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার, বিবাহ নামক বাঁধনের ফাঁস থেকে মুক্ত হয়ে তার স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রত্যয়কে মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রেনেসাঁসের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ হয়েছিল। নারী-পুরুষে ভেদাভেদকে বড়ো করে না দেখে মানুষের মনুষ্যত্বকে তার পরিচয়ের মানদন্ড হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল— " মনে করা যাক লাথি মারা থেকে আরম্ভ করে দৌড় মারা পর্যন্ত কাজে পুরুষদের পায়ের শক্তি মেয়েদের চেয়ে বেশি, সেই তত্ত্বের উপর একান্ত জোর দিয়ে পুরুষ যদি বলে বিস্তারিতভাবে পদচারণা মেয়েদের অনাবশ্যক, অতএব সে সম্বন্ধে চিত্তবিক্ষেপ ও পদবিক্ষেপ নিবারণ করবার জন্যে তাদের পা দুটোকে কড়া শাসনে খর্ব করে দেওয়া যাক, তাহলে সেই চাপে পা খর্ব হয়েই আসে। .. যাই হোক মেয়ে পুরুষের সেই ভেদমূলক ব্যবস্থা অনেকদিন ধরে সহজে চলে এসেছে এমন সময় একটা যুগান্তকালের ভূমিকম্প পাশ্চাত্যদেশে সমাজকে প্রচন্ড নাড়া দিলে — সেই ধাক্কায় গন্ডির বাইরে মেয়ে পুরুষ এসে ভিড়ল। এই জায়গাটাতেই মেয়েদের স্বতন্ত্র আয়োজন নেই, এখানে ভেদের উপর থেকে স্বভাবতই ঝোঁক উঠে যাচ্ছে, ঝোঁক পড়ছে মেয়ে পুরুষের বিশেষত্ব উত্তীর্ণ হয়ে যে সাধারণ মানুষ আছে তারই মূলগত ঐক্যের উপর। মানুষের সমাজে এটা একেবারে নতুন সৃষ্টির চর্চা — এটা চিরকালের অভ্যাস-বিরুদ্ধ। অতীত কালের চিরসঞ্চিত মোহ যতদিন না কাটবে, ততদিন এই দেখাটা স্পষ্ট হবে না। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এই শ্রেণীবিভাগের অতীত মানুষকে স্বীকার করা চাই।"[১৩৯]

রবীন্দ্রনাথ নবজাগ্রত মূল্যবোধের ভিত্তিতেই তার উপন্যাসের বেশির ভাগ নারী চরিত্র সৃজন করেছেন। বিনোদিনীর মধ্য দিয়ে তাঁর উপন্যাসে নারী ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তারই পথ ধরে ললিতা, দামিনী, বিমলা, কুমুদিনীর আবির্ভাব ঘটেছে। কুমুদিনী 'না' শব্দটি উচ্চরণের মধ্য দিয়েই পুরুষতন্ত্র এবং দাম্পত্যের দমবন্ধ করা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, বাজিয়ে দিয়েছে নারী

মুক্তির শঙ্খধ্বনি। এরপর, মধুসূদন কুমুকে প্রেম বা সম্পর্কের জোরে নয়, আইনের ভয় দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলে — ''জান পুলিশ ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড় ধরে। 'না' বললেই হল।''[১৪০] দাম্পত্যজীবন কতটা প্রেমহীন হলে, সম্পর্কের বাঁধুনি কতটা শিথিল হলে আইনের শরণাপন্ন হতে হয় তা আমাদের অজানা নয়। আইনের ভয় কুমুকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। স্বামীগৃহে ফিরে যাবার প্রসঙ্গে দাদা বিপ্রদাস কুমুকে বলেছিল — '' যদি তোকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই জোর করে সামলাতে পারবি ? ''[১৪১] উত্তরে কুমু বলেছিল, ''তোমার উপর উৎপাত যদি না হয়তো খুব পারবো।''[১৪২] রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিবর্তনের ধারায় কুমুর উত্তরণ লক্ষ্য করা যায়, 'শেষের কবিতা'-র (১৯২৯ খ্রি) লাবণ্যের মধ্যে। অমিতের প্রতি লাবণ্যর গভীর ভালবাসা থাকলেও তাকে সে বিবাহ্ করে নি। তার ভালবাসাই এক সময় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল অমিতের সঙ্গে তার স্বভাবের পার্থক্যের দিকটি। তাদের চেতনার-স্বাতন্ত্র্য দাম্পত্যের অনুকূল হবে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে দু জনের আলাদা থাকাই শ্রেয়। লাবণ্য তাই অতি সহজে নির্দ্বিধায় বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। সেকালেও 'বিবাহ্ বিচ্ছেদ বিধি' স্বীকৃত ছিল। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বিশেষ বিবাহ আইন' গৃহীত হয়। এই আইনের ধারায় বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধি বা ডিভোর্স স্বীকৃত হয়েছিল। তারকনাথ পালিতের কন্যা লিলিয়ান ঐ আইন বলে তার স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনর্বিবাহ করেন। তার ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদ বাঙালি মহিলাদের মধ্যে প্রথম। কুমু কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সমস্তরকম সম্পর্ক ছিন্ন করার মানসিক জোর পেয়েছিল দাদার কাছ থেকেই। দাদা তাকে বলেছিল — ''দেখ্ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা সংকোচ ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে লোক সমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে, ঘরে-বাইরে চারিদিকে নিন্দার তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।''[১৪৩] এ কথার প্রেক্ষিতে কুমু বলে,'' দাদা তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না ? ''[১৪৪] বিপ্রদাস অনিষ্ট অশান্তিকে কোনো দিনই ভয় পায় নি। কুমুর অসম্মানেই তার ভয় —''তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে।''[১৪৫] কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। সন্তান-সম্ভবা কুমুকে

স্বামীগৃহে ফিরে যেতে হয়, আইনের ভয়ে নয়, সামাজিকতার চাপে, দাদাকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবার দায়ে। কুমুকে স্বামীগৃহে ফিরে যেতে হলেও প্রেম-ভালবাসা হীন দাম্পত্যের যে ফসল তার শরীরে, তার দায় সে বহন করতে চায় না। বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের দহনে দগ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও কুমুর তীব্র অনীহা, তাই সে ঘোষাল বংশের সন্তানকে তার নিজের বাড়িতে দিয়ে মধুসূদন ঘোষালের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছে। বাঁচতে চেয়েছে — পুরুষের পরিচয়ে নয়, নিজের পরিচয়ে, স্বাধীনভাবে। রবীন্দ্রনাথ কুমুদিনীর স্বাতন্ত্র্যের যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তার অসম-দাম্পত্যের প্রতিটি স্তরের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কুমুর দাম্পত্যকে কেন্দ্র করে প্রেমহীন মৃত-সম্পর্ক বহন করে চলার যন্ত্রণাকে তিনি অসামান্য সংবেদ্য বর্ণনায় চিত্রিত করেছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি তাই রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারা-য় কুমুর মতোই একক এবং অনন্য।

দুই বোন ঃ

'দুই বোন' উপন্যাসটি ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারেও উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৩৩৯ সাল। আকারের দিক দিয়ে রচনাটি একটি বড়ো গল্পের মতো। টেকনিকের দিক দিয়ে এটি অবশ্যই উপন্যাস — তবে অতি ক্ষুদ্র উপন্যাস। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী জাতির দুই রূপের কথা 'চিত্রা' (১৮৯৬ খ্রি.), 'বলাকা' (১৯১৬ খ্রি.) প্রভৃতি কাব্যে উপন্যাসটি রচনার বহুকাল পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আলোচ্য উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ নারী জাতির দুই রূপের কথা ব্যক্ত করেছেন — ''মেয়েরা দুই জাতের, ...এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।''[১৪৬] — নারীর দুই রূপের তত্ত্ব প্রকাশের জন্য উপন্যাসটি 'পঙ্গু ও পাণ্ডুর' হয়ে গিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন, ''লেখক যেন ঐ তত্ত্বকে প্রমাণ করার জন্য গল্পটা বানিয়েছেন ; ফলে পাত্র-পাত্রীরা হয়ে উঠেছে তত্ত্বের প্রতিমা, লেখকের অনুবর্তী।''[১৪৭]

অনেকে আবার মানুষের আদিম প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য শক্তির তান্ডব-ক্রিয়ার পরিচয় পেয়েছেন উপন্যাসটির মধ্যে— ''উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে-শক্তিকে স্বীকার করেছেন, তাকে আমরা বলতে পারি মানুষের স্বভাবের আদিম প্রবৃত্তির দুর্বার শক্তি। সেই শক্তির উদ্দামতা শশাঙ্ক আর ঊর্মি — দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেখানে সেখানে গৌরব নেই, লোকলজ্জা নেই, কর্তব্যবোধ নেই, রুগ্না সহধর্মিণীর জন্য সহানুভূতি পর্যন্ত নেই।''[১৪৮]

আমাদের সন্দর্ভের বিষয় দাম্পত্য-সমস্যাকেন্দ্রিক। তাই আমরা উপন্যাসটির পাতায় মনস্তত্ত্বের গভীর অনুসন্ধানী আলোক ফেলে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছি — নারী জাতির দুই রূপ, প্রবৃত্তির দুর্বার শক্তি নারী পুরুষের প্রেমের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি কীভাবে দাম্পত্যে ভাঙন সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে শর্মিলা সন্তানের জননী হতে পারে নি। উপন্যাসে তার প্রিয়া-সত্তা মাতৃসত্তায় রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। শর্মিলার মাতৃভাবের ছায়ায় ইঞ্জিনিয়ার শশাঙ্কের এক প্রকার সুখেই দিন চলে যাচ্ছিল। মনে শান্তি ছিল কিনা তার উত্তর হয়তো সে নিজেও জানত না। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানিয়েছেন যে, মানুষ তার নিজের ঘরেরও মালিক নয়। নিজের মনের সব খবরও সে জানতে পারে না। শশাঙ্কের মনের কোণে একটা অস্বস্তি, এক ধরণের অভাববোধ হয়তো ছিল ; যার ফলে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শুনি —'' দোহাই তোমার, চক্রবর্তী বাড়ীর গিন্নীর মতো একটা ঠাকুর দেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি।''[১৪৯] বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবনে শশাঙ্কের চাপা বিরক্তি মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হলেও ভয়ংকর কোনো বিস্ফোরণ বা দাম্পত্যের ছন্দপতন ঘটে নি। শর্মিলার অতিলালনে অভ্যস্ত শশাঙ্কের দিনগুলি নিরুদ্বেগে চলছিল মৃন্দু-মন্দ গতিতে। কিন্তু শশাঙ্কের চাকরি ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটায় তাদের দাম্পত্যে হঠাৎ সংকটের মেঘ নেমে আসে। কর্তৃপক্ষের অবিচারের প্রতিবাদে শশাঙ্ক বাঁধা মাইনের চাকরি ছাড়ে স্ত্রীর পরামর্শে ; শুরু করে শর্মিলার মথুরদাদার সঙ্গে কন্ট্রাকটারি ব্যবসা। পত্নী লালিত, চাকরিতুষ্ট মানুষটির পৌরুষ বিকীর্ণ হয় স্বাধীন ব্যবসার ক্ষেত্রে। পূর্ণ উদ্যমে সে ব্যবসা চালাতে থাকে। ব্যবসা দ্রুত ফুলে ফেঁপে ওঠে। লাভের টাকায় ভবানীপুরে সে মনের

মতন বাড়ি তৈরী করে। শশাঙ্কের জীবন যাত্রায় দেখা দেয় পরিবর্তন। ব্যবসার কাজে তার কর্মোন্মাদনা তাকে স্ত্রী শর্মিলার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

শশাঙ্কের জন্মদিন শর্মিলার জীবনে সবচেয়ে বড়ো পরব, দিনটির সঙ্গে তার ভালবাসার আবেগ জড়িয়ে আছে। কিন্তু জন্মদিনের উৎসবে শশাঙ্ক থাকে অনুপস্থিত। শর্মিলার শত অনুরোধকে উপেক্ষা করে জন্মদিনেও 'বিজনেস' করতে চলে যায়। যাবার আগে বলে যায়, ''দেখ শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা করো না।''[১৫০] শশাঙ্কের ভর্ৎসনায় শর্মিলার স্বপ্নভঙ্গ হয়, শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদে, তারপর ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্মধারার পারে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখে — তারপরপারে স্বামীর কর্মযজ্ঞের রথ দুর্বার গতিতে ধেয়ে চলছে।

শর্মিলা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তার দেহে ব্যাধির আবাস-গুহাটা খুঁজে বের করতে একের পর এক ডাক্তারের আগমন ঘটে। কিন্তু ব্যাধির কোন উপশম ঘটে না। রোগ অনির্ণীতই থাকে। দাম্পত্যের সুখ-শয্যা থেকে তার ঠিকানা বদল ঘটে রোগশয্যায়। শশাঙ্কের দিন কাটে দারুণ উৎকণ্ঠায় ; শর্মিলাও উৎকণ্ঠিত থাকে নিজের কর্তব্য-কর্ম নিয়ে। শর্মিলার সাজানো সংসারে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ছন্দপতন ঘটে। সংসারে ছন্দ ফেরানোর বাসনায় নিরুপায় শর্মিলা পিতৃগৃহ থেকে ডেকে আনে ছোট বোন ঊর্মিমালাকে। ঊর্মিমালা দিদির গৃহ-রাজ্যে এসে প্রতিনিধি পদ লাভ করে।

ঊর্মি বই-পড়া মেয়ে। ঊর্মির বাবা নীরদের সঙ্গে তার ভাগ্যকে জড়িয়ে দিয়ে যায়। নীরদের সঙ্গে ঊর্মির স্বভাবের বিস্তর ব্যবধান। তাই নীরদের সঙ্গে তার কোনো আত্মিক সম্পর্ক তৈরী হয়নি। তার সংস্পর্শে ঊর্মির মন হাঁপিয়ে ওঠে। নীরদের মাস্টারির হাত থেকে তার মন মাঝে মাঝে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু বাবার প্রতি ঊর্মির শ্রদ্ধাবোধ ও স্বামীত্বের ধারণা সম্পর্কে তার সনাতন সংস্কার ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঊর্মির বাধা অপসারিত হয় দিদির ডাকে। দিদি যখন তাকে

ডেকে পাঠায় নীরদ তখন বিলেতে। দিদির বাড়িতে এলে উচ্ছল স্বভাবের ঊর্মির মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার ইচ্ছা বসন্তের মৃদু মন্দ বাতাসের মতো তার মনে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। দিদির সংসারে শৃঙ্খলা ফেরানোর দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু কাজ করা মেয়ে সে নয়। তবে সংসারের কাজে তার আনন্দের-সীমা নেই। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, খেলাধূলায় ঊর্মির আগ্রহও অপরিসীম। এদিক থেকে ভগ্নীপতি শশাঙ্কের সঙ্গে তার স্বভাবের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। অবরোধ মুক্ত প্রিয়া স্বভাবের মেয়ে ঊর্মির কাছে দিদির সংসার মুক্ত-পৃথিবী বলে মনে হয়। এখানে সে নিজে আনন্দে মেতে ওঠে, ভগ্নীপতি শশাঙ্ককেও আনন্দ-আবেগে মাতিয়ে তোলে। দীর্ঘ কালের তাপিত দাম্পত্যে কীসের যেন একটা অভাব শশাঙ্কের মনকে আনন্দহীন করে রেখেছিল। ঊর্মি আসায় জীবনে আনন্দের ছোঁয়া লাগে। শশাঙ্কের কর্তব্যকর্মে নানা পরিবর্তন ঘটে। যে শশাঙ্ক ব্যবসার প্রয়োজন দেখিয়ে স্ত্রীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিল, সেই আবার সন্ধ্যা হলেই রেডিওর কাছে কান পাতবার জন্য অপরিসীম উৎসাহে ঘরে ফিরে আসত। শশাঙ্ক ঊর্মিলার সঙ্গে কোনোদিন নিউমার্কেটে শপিং করতে যায় নি। ঊর্মির সঙ্গে নিউমার্কেটে শপিং এ যেতে তার উৎসাহ অন্তহীন। আসলে শশাঙ্কের অবচেতনে প্রেয়সী নারীর যে সুপ্ত কামনা ছিল ঊর্মিলার মধ্যে সে পেয়ে যায় তার সেই প্রেয়সীকে। আবার নিরোদ ঊর্মির কোমল হৃদয়ের যে আবেগকে স্পর্শ করতে পারেনি, শশাঙ্ক বসন্তের রঙীন আবির ছঁড়িয়ে ঊর্মিক সেই আবেগকে রঙীন করে তোলে। ফলে দুজনেই নিজেদের অগোচরে জড়িয়ে পড়ে প্রেমের ফাঁদে। অফিস ঘরে বসে শশাঙ্ক ঊর্মির সঙ্গে বসে তাস খেলে। ঊর্মির সঙ্গে সময় নষ্ট করতে শশাঙ্কের সময়ের অভাব হয় না। শশাঙ্কের আহার-বিহার, বেশ-ভূষার নানা পরিবর্তন রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে শর্মিলা দেখতে থাকে, মনে ব্যথাও পায়। একরত্তি একটি মেয়ে এসে অল্প কদিনেই তার কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে সদা সচেতন স্বামীকে কর্মসাধনার আসন থেকে টেনে নামায় — এ দৃশ্য শর্মিলার হৃদয়কে তিলে তিলে দগ্ধ করে। শর্মিলা ব্যথা হজম করে নীরবে — ও যে মায়ের জাত। নিজের অক্ষমতা ও স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে সে স্বামী ও বোনের ঘনিষ্ঠতা মেনে নেয়। শর্মিলার প্রশ্রয়ে চলতে থাকে শশাঙ্ক-ঊর্মির ঘনিষ্ঠতা, স্বতন্ত্র সমান্তরাল জীবনযাত্রা।

শর্মিলা জানতে পারে শশাঙ্ক-ঊর্মির প্রেমের উন্মাদনায় তাদের ব্যবসা ডুবতে বসেছে। শর্মিলা খবরটা স্বামীর কাছে গোপন রাখে, জানায় শুধু বোনকে। ঊর্মির সম্বিৎ ফেরে। সে বুঝতে পারে কর্তব্য কর্মে তার বিচ্যুতির বিষয়টি। কর্তব্যবোধ জাগ্রত হলে দিদির সংসার ছেড়ে সে বাড়িতে ফিরে যায়। বাড়িতে গিয়ে নীরদের চিঠি তার হাতে আসে। চিঠিতে ছিল ঊর্মির মুক্তির সংবাদ — নীরদ মুক্তি দিয়েছে তাকে। মুক্তির আনন্দে ঊর্মি যখন উচ্ছ্বসিত তখন তাদের বাড়িতে শশাঙ্কের আগমন ঘটে। ঊর্মির অভাব শশাঙ্কের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। শর্মিলা তা জানতে পারে। তাদের আগ্রহেই ঊর্মি আবার ফিরে আসে। ঊর্মি নিজেকে সংযত রাখতে চায়। কিন্তু শশাঙ্কের উদ্দাম কামনার কাছে তার সংযমবোধ নতিস্বীকার করে। তাদের প্রেমের তুফান লজ্জা পায়, সংকোচ, কর্তব্য কর্ম সমস্ত কিছু ভেসে যায়। ব্যবসায়িক কাজকর্মে অবহেলার ফলে বাজারে শশাঙ্কের খ্যাতি নষ্ট হয়। শশাঙ্ক যখন সর্বনাশ সম্পর্কে সচেতন হয় তার আগেই তার বাণিজ্যতরী গভীর সমুদ্রে ডুবে যায়। স্বামীর দুরবস্থা দেখে শর্মিলার হৃদয়ের গোপন রক্তক্ষরণ তাকে শরীর মনে আরো দুর্বল করে তোলে। তার মনে হয় মৃত্যু আসন্ন। তার মাতৃসত্তা প্রবল হয়ে ওঠে। স্বামীকে ডেকে বলে, ''ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরও অনেক বেশী পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি।''[১৫১] এরপর ঘটনার আকস্মিক বাঁক পরিবর্তন ঘটে। ডাক্তার জবাব দিলেও কবিরাজী চিকিৎসায় সুস্থ ওয়ে ওঠে শর্মিলা ; মৃত্যুর কালোছায়া চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। দিদি সুস্থ হয়ে ওঠায় তার বাড়িতে ঊর্মির আর থাকা শোভা পায় না। চলে যেতে চাইল সে। শর্মিলা আপত্তি করে। কারণ সে বুঝতে পারে যার জন্য কাজ খোয়াতে খোয়াতে শশাঙ্কের ভাবনা নেই, 'তাকে সুদ্ধু খোওয়ানো ওর সইবে না'। শর্মিলা বোনকে বলে, ''হিন্দুসমাজে বোন-সতীনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনো দিন করে নি।''[১৫২] শশাঙ্ক মিনতি করে সবকিছু মেনে নেবার জন্য —''আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তাহলে কী দশা হবে ভেবে দেখো।''[১৫৩] ঊর্মিকে দিদি-ভগ্নিপতির মীমাংসা একপ্রকার মেনে নিতে হল। শর্মিলা শশাঙ্ক ও ঊর্মির লজ্জা-সংকোচের কথা ভেবে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। শশাঙ্ক ও ঊর্মিকে নিয়ে চলে যেতে চায় অপরিচিত জায়গা নেপালে। অপরিচিত

স্থানে কোনো লোক লজ্জা তাদের স্পর্শ করবে না। ঘটনা আবার বাঁক নেয়। শশাঙ্ক কলকাতার ব্যবসার পাট তুলতে গিয়ে তার সর্বনাশের চেহারা দেখতে পায়। তার সুপ্ত পৌরুষ আবার জেগে ওঠে। বাতিল হয় নেপাল যাওয়ার সিদ্ধান্ত। ডুবে যাওয়া ব্যবসা টেনে তুলবার সংকল্প গ্রহণ করে। দৃঢ়তার সঙ্গে শর্মিলাকে জানিয়ে দেয় — ''আমরা দুজনে ঊর্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব — ভ্রূকুটি কুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই।''[১৫৪] কিন্তু সব সমস্যার গ্রন্থিমোচন ঘটে ঊর্মির লেখা দুটি চিঠিতে। কাউকে কিছু না জানিয়ে ঊর্মি বিলেত যাত্রা করে। শশাঙ্ককে একটি চিঠিতে লিখে জানাল — ''আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলেতে বাবার আদেশমত ডাক্তারি শিখে আসব। ছয়-সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্য ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইল মনে।''[১৫৫] দিদির চিঠিতে লিখল — ''শতসহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি মাপ করো। যদি সেটা অপরাধ না হয় তবে তাই জেনেই সুখী হব। তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে। কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর, সুখ যদি না হয় তো নাই হল। ভুল করতে ভয় করি।''[১৫৬]

'দুই বোন' উপন্যাসের কাহিনী সরল, চরিত্র গুলি অতি সরল। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মতো চারটি অধ্যায়ে কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। অধ্যায়গুলিও চারটি চরিত্রের নামে নামাঙ্কিত — শর্মিলা, নীরদ, ঊর্মিমালা ও শশাঙ্ক। তবে এখানে চরিত্রের মুখ দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি বর্ণিত হয়। ঔপন্যাসিক নিজেই সহজ সরল বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলিও সমতল। তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তেমন কোনো প্রকাশ নেই বললেই চলে। শর্মিলা ও ঊর্মিমালা চরিত্র দুটিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ নারীর দুটি রূপের পরিচয় উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের দুটি চরিত্রকেই অসম্পূর্ণ এবং কৃত্রিম বলে মনে হয়। শর্মিলার চোখের সামনেই তার স্বামী ও বোন দিনের পর দিন প্রেম-লীলা চালিয়ে যায় অথচ তার কোন অন্তর্দাহ-ই সৃষ্টি হয় নি, হলেও তা প্রায় অনুচ্চারিত। চরিত্রটিকে একপ্রকার নিরুত্তাপ বলেই মনে হয়। মধুসূদন-কুমুদিনীর বোঝা-পড়ার গভীরে সমস্যাটা রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন 'যোগাযোগ'

উপন্যাসে। 'দুই বোন' উপন্যাসে শশাঙ্কর মন শর্মিলার কাছ থেকে ছিটকে চলে যায় ঊর্মিলার কাছে। অথচ শর্মিলার সঙ্গে শশাঙ্কর বোঝা পড়ার কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় নি। তাহলে তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার রহস্য কোথায় লুকিয়ে আছে? রবীন্দ্র উপন্যাসটিতে ঊর্মিমালার মধ্য দিয়ে নারীর প্রিয়ারূপের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। তাই যদি হয় তবে ঊর্মির ভালোবাসার গভীরতা উপন্যাসটিতে প্রকাশিত হয় নি কেন? দিদিকে চিঠিতে সে জানিয়েছে 'অজ্ঞানে অপরাধ' করেছে, আর 'ভুল করতে ভয় করি'। অর্থাৎ দিদির সংসারে যা কিছু অপরাধ করেছে তা সব অজ্ঞানেই হয়েছে, এখন সজ্ঞানে দিদির সতীন হয়ে ভুল করতে চায় না। তার চিঠির এই বক্তব্যই তার প্রিয়া রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরাধ স্বীকার করলেই কী সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? তাহলে শশাঙ্কের প্রতি তার যে ভালবাসা, তার গভীরতা কোথায়? আর শশাঙ্করে প্রতি তার ভালবাসা না থাকলে প্রিয়া রূপে সে অযোগ্য। ঊর্মি বনেদী ঘরের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে, সনাতন স্বামী সংস্কারেও তার বিশ্বাস আছে, তার উপর সে নীরদের বাগদত্তা বধূ। অন্তঃকরণেও সে বড়ো। অগ্রজ হেমন্তের রোগশয্যার পাশে দিনরাত্রি থেকে সে ভায়ের সেবা করেছে। বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি শিখে এসে বাবার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণের সংকল্পও তার মনে রয়েছে। এমন একজন বিদুষীর ভগ্নীপতির ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়া, দিদির দাম্পত্যে ভাঙচুর ঘটানো — সামাজিক দিক দিয়ে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন ঐ অস্বাভাবিকতার লক্ষণ ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যেই নিহিত থাকে। তাই তাঁরা ব্যক্তির অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আচার আচরণকেই অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন না, অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের উৎস সন্ধানেই তাঁরা অধিক আগ্রহী।

'দুই বোন' উপন্যাসটিতে শশাঙ্কের প্রতি শর্মিলার ভালবাসার মধ্যে বাৎসল্যের ভাবটাই অধিক প্রকটিত হতে দেখা যায়। শর্মিলা অক্লান্ত সেবার মধ্য দিয়েই স্বামীর প্রতি তার অন্তরের সুগভীর ভালবাসা জানিয়েছে। কিন্তু স্বামী শশাঙ্কের মন স্ত্রীর মাতৃভাবের সেবা-যত্নে পরিতৃপ্ত নয়। তার অবচেতন মনে প্রিয়ারূপের প্রতি যে আসক্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল সেই ক্ষুধার খাদ্য শর্মিলা যোগান দিতে পারে নি। বরং তার ভালোবাসার একঘেয়ে অত্যাচারে শশাঙ্কের প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচার সুযোগ তার

সামনে এসে উপস্থিত হয় চাকরি জীবনের বাঁধা গত পরিত্যাগ করে ব্যবসায় স্বাধীন ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিনরাত ব্যবসার কাজে ডুবে থাকার মধ্য দিয়ে। শর্মিলার প্রেমে কোনো উচ্ছ্বাস আবেগ না থাকায় সে তাকে এক প্রকার এড়িয়ে যেতে চেয়েছে ব্যবসা ক্ষেত্রে কাজের অজুহাতে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় — ''অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ তখনও ছুটো ছাটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস-ঘরে গিয়ে প্লান আঁকবার তোলা কাগজ কিম্বা খাতা পত্র নিয়ে বসে।''[১৫৭] শশাঙ্ক তার নিজের জন্মদিনের কথা ভুলেই গিয়েছিল কাজের ব্যস্ততায়। কিন্তু স্বামীর জন্মদিন শর্মিলার আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সে বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেছিল, ঘরদুয়ার ফুল পাতায় সাজিয়ে তুলে ছিল। সুসজ্জিত ঘর দেখে শর্মিলাকে শশাঙ্ক বললে, ''এ কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি।''[১৫৮]

— শশাঙ্কের এই তির্যক মন্তব্য তাদের স্নিগ্ধ-মধুর দাম্পত্যের পরিচায়ক নয় বলেই আমরা মনে করি। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের আরো কিছুটা অংশ (শর্মিলা ও শশাঙ্কের বক্তব্য) উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না — '' হায় রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ ? যাই বল, বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।''

''বিজনেস মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।''

''আর কখনো বলবো না। আজ লোকজন নেমতন্ন করে ফেলেছি।''

''দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করার চেষ্টা করো না। ''[১৫৯] এই বলে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলে।''

— আপাত দৃষ্টিতে শশাঙ্ক-শর্মিলার দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে জটিল কোনো সমস্যা চোখে না পড়লেও তাদের সম্পর্কের গভীরে যে সমস্যার চোরাস্রোত বহমান ছিল উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই তার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে উপন্যাসটিতে প্রেমের সমস্যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে দাম্পত্য সমস্যার বীজ।

পুরুষের মন বৈচিত্র্য পিয়াসী। পত্নীর ভালোবাসা তথা সেবা যত্নের মধ্যে নতুনত্ব না থাকলে তার আনন্দ হয় না। তাই দেখা যায় খেয়ালী মেয়েদের পিছনেই পুরুষের

প্রেমিক সত্তা ধাবিত হয়। তাদের খেয়ালের আবর্তে পড়ে প্রাণান্ত হতে পারে জেনেও পুরুষ তাদের ভালোবাসে। শর্মিলার নারী স্বভাবে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। দীর্ঘ দাম্পত্যে সন্তান লাভের সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। দাম্পত্য-জীবনে সন্তান লাভের সম্ভাবনা যত ক্ষীণ হয়েছে ততই সে তার নারী হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা মাতৃস্নেহে পরিবর্তিত করে স্বামীর সেবা-যত্নে নিয়োজিত করেছে। শর্মিলা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, ভারতীয় নারীর স্বামী-সংস্কারেই তার মন আচ্ছন্ন ছিল। এক্ষেত্রে নারী তার জীবনের সার্থকতা খোঁজে সন্তান লাভের মধ্য দিয়ে। নিঃসন্তান নারীকে তাই দেখা যায়, কখনো স্বামী বা আত্মীয় পরিজনের পুত্র-কন্যাকে কখনো বা পশু-পাখিকে কেন্দ্র করে সেবা-যত্নের বাড়াবাড়ি করছে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ বা প্রবৃত্তির এই রূপান্তরকে মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় Transference বা রূপান্তর বলে।

প্রতিটি নারীর মধ্যেই প্রেয়সী সত্তা বা জায়া সত্তা ও মাতৃসত্তা বা জননী সত্তা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। পুরুষের সংস্পর্শে এসে নারীর নির্জ্ঞান মনের মানস-প্রবৃত্তি কখনো জায়া, কখনো আবার জননী রূপ পরিগ্রহ করে। শর্মিলার চরিত্রে মনোবীক্ষণের রূপান্তর (Transference)- এর সূত্রটি কার্যকরী হওয়ায় জায়াত্বের অন্তরালে মাতৃত্বের প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার ঠাট্টা, তামাশা, গল্প-গুজব, উদ্যম-অধ্যবসায় ও খোলা-মেলা স্বভাবেই প্রকাশিত। তার অবচেতন মনে প্রিয়া বা জায়া স্বভাবের নারীকে পাবার আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। যে নারী তার চপল হাসির তরঙ্গে মনকে সম্মোহিত করবে। যার সান্নিধ্যে একঘেয়েমি কাজের ক্লান্তি দূর হবে। জীবন হয়ে উঠবে আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরপুর। শর্মিলার মধ্যে প্রেয়সী নারীর প্রমোচ্ছ্বাস না থাকায় তারমন তাই বহির্মুখী হয়ে উঠেছিল। তার বহির্মুখী মন যখন অন্তঃপুরের বাইরে কাজের জগতে ডুবে থেকে অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা থেকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তখন স্ত্রীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে তাদের দাম্পত্যের মাঝে আবির্ভাব ঘটে শর্মিলার বোন ঊর্মিলার। যার সঙ্গে শশাঙ্কের স্বভাবের মিল আছে বলে ঔপন্যাসিক আমাদের জানিয়েছেন। ঊর্মির বিবাহ ঠিক হয়েছিল নীরদের সঙ্গে। সেই হিসেবে ঊর্মি নীরদের

বাগদত্তা বধূ। কিন্তু নীরদের স্বভাবের সঙ্গে ঊর্মির অমিলটাই বেশী। নীরদ নিজে হাসতে জানে না, অপরকেও হাসাতে জানে না। ঊর্মির আবেগ-ভালবাসার মূল্য সে বুঝতে চায় নি। তার মনটা হচ্ছে ইস্কুল মাস্টারের। সে প্রিয়াকে উপদেশ দিতে এবং পরিচালনা করতেই আগ্রহী। ঊর্মির হৃদয়কে বুঝতে পারে নি নীরোদ, তার হৃদয়ের কোণে তিল মাত্র স্থানও অধিকার করতে পারে নি। আসলে মেয়েরা এমন ছেলেদের ভালোবাসে যারা প্রয়সীকে নতুন করে পাবার জন্য সাধনা করতে পারে। যার স্বভাবে কোনো কার্পণ্য থাকবে না। থাকবে না তার প্রেমের মধ্যে অবসাদ। এমন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য ঊর্মি ভিতরে ভিতরে হয়ে উঠেছিল অস্থির। ঊর্মির অস্থিরতা ও শশাঙ্কের অতৃপ্ত ক্ষুধার আগুনে ঘৃতহুতি পড়ে শর্মিলার নীরব প্রশ্রয়ে। তাদের কামনার আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। প্রমাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা শশাঙ্ক ও ঊর্মিমালাকে ভুলিয়ে দেয় লোকলজ্জা, কর্তব্যবোধ, ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা, এমনকি রুগ্না শর্মিলার মর্মবেদনার কথাও।

শশাঙ্ক ও ঊর্মিলা উভয়েই উচ্চশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত। দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত দিদির সেবা করতে এসে ভগ্নীপতিকে গোপনে ভালোবাসা আর অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে তার বোনকেই ভালবাসার জালে জড়িয়ে ফেলা — সমাজ ধর্মের বিরোধী। অনেক পাঠক-সমালোচকই তাই শশাঙ্ক-ঊর্মিমালার প্রেমকে অবাস্তব এবং রুচির পক্ষে পীড়দায়ক বলে মনে করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল — " কবি শর্মিলা ও ঊর্মিমালাকে দুই বোন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহার পর ঊর্মি ও শশাঙ্কের যৌথ উন্মদনার যে চিত্র দিয়াছেন তাহা রুচিবিগর্হিত। ...ঊর্মিমালা শর্মিমালার বোন — ইহার দ্বারা গল্পের কোন প্রয়োজন সাধিত হয় নাই, কিন্তু ইহা পাঠকের মনে অনাবশ্যক আঘাত দিয়াছে।"[১৬০]

কিন্তু সমাজ সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত কম নেই। দুর্বার প্রবৃত্তির তাড়নার ফলেই গোবিন্দলাল, মহেন্দ্রকে মনুষ্যত্বের গৌরব হারাতে হয়। ভ্রমর, আশালতা এদের সোনার সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

মানবমনের গহন প্রদেশে মনস্তত্ত্বের আলোক ফেলে মনস্তাত্ত্বিকেরা দেখেছেন যে, মানুষের মনে যত রকম উত্তেজনা আছে, তার মধ্যে নারী-পুরুষ-পরস্পরের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনা-ই প্রধান। নারী চায় পুরুষকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করতে, পুরুষ চায় তাকে তার কঠিন বাহুর মধ্যে ধরে রাখতে। আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত না হলে উত্তেজনা প্রশমিত হয় না। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতেই নারী পুরুষের স্বাভাবিক আনন্দ। দেবত্বে অধিষ্ঠিত হবার চেয়ে প্রবৃত্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে আনন্দ লাভের প্রতিই মানবমনের আগ্রহ সমধিক। আনন্দের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগকেই মনস্তত্ত্বে সুখ সন্ধানী প্রবৃত্তি বা Pleasure Principle বলে। এই সুখ সন্ধানী প্রবৃত্তির দ্বারাই শশাঙ্ক-ঊর্মিমালা পরিচালিত হয়েছিল। শর্মিলার সঙ্গসুখ শশাঙ্কের জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে রাখলে অথবা নীরদের সাহচর্যে ঊর্মির আনন্দলাভের সম্ভাবনা থাকলে এই অপ্রীতিকর সম্পর্কের দহন জ্বালায় শর্মিলাকে জ্বলতে হত না। অথবা, শশাঙ্কের যদি অহং বুদ্ধি (ego instincts) বা চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রবল হত তাহলে সে রুগ্না স্ত্রীর ভগ্নীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত না। 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে' অথবা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নৈপুণ্য 'দুই বোন' উপন্যাসটিতে নেই একথা সত্য। কিন্তু মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতেই যে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের প্রেম জীবনের সমস্যা রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অহংবুদ্ধি (ego instincts)-র সঙ্গে যৌন-ক্ষুধার (sexual instincts)-র সংগ্রামে শশাঙ্কের অহংবুদ্ধি পরাজিত হয়। ঊর্মির মধ্যেও ঐ প্রবৃত্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এরপর দেখা যায় তার অহংবুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করে।

দিদির দাম্পত্যে ভাঙন ঘটানোর কোনো রকম সচেতন অভিপ্রায় ঊর্মির মনের কোণে কোনদিনও স্থান পায় নি। অথচ সেই দুর্ঘটনাটাই ঘটে গেল। ঊর্মির মনের চেতন সত্তা একসময় বুঝতে পারে যে ভগ্নীপতি শশাঙ্ককে সে ভালবেসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঊর্মির মনের ভাবকে অপরূপ ভাষায় উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন — ''জানালার কাছে ঊর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছেনা কিছুতেই। বুকের ভিতর রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার সজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর ভিতর উৎসুক করেছে।

ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না।... প্রাণের এই কান্না — ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা।''[১৬১] — ঊর্মির কান্না তথা শশাঙ্কের প্রতি তার ভালবাসার উৎস যে মনের নির্জ্ঞান স্তর থেকে — ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তা স্পষ্ট।

মানুষের আচরণ যে তার অবচেতন মনের দ্বারা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় মনোবিজ্ঞানের এই সার সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন 'দুইবোন' উপন্যাসটি রচনার সময়। শশাঙ্ক-শর্মিলা, ঊর্মিমালা প্রত্যেকের আচরণেই সবচেয়ে বেশি বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। নির্জ্ঞানে প্রিয়া রূপের প্রতি অত্যাধিক আসক্তিই তাকে ঊর্মির প্রেমে উন্মত্ত করে তোলে। লজ্জা-সংকোচ বিসর্জন দিয়ে তাই শশাঙ্ক ঊর্মিকে বলে —''তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালবাসি। আর, তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।''[১৬২]

নারী প্রেমের মাতৃরূপের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রিয়ারূপের প্রতি আসক্তিই তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অহংবুদ্ধি (ego instincts) দুর্বল হওয়ায় শশাঙ্ক অপ্রতিরোধ্য প্রেমপ্রবৃত্তির উন্মাদনায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ভুলে গিয়েছিল তার সাংসারিক দায়-দায়িত্ব, পণ্ড হয়েছিল তার কাজ — ''কয়দিন শশাঙ্কের সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনের ভিতরে ভিতরে সে বুঝেছে যে, এটা ভালো হচ্ছে না। কাজের ক্ষতি খুব গুরুতর হওয়া অসম্ভব নয়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনা দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার সে স্বাধিকার প্রমত্ত, মেঘদূতের যক্ষের মতন। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।''[১৬৩] শশাঙ্কের প্রেম প্রবৃত্তি শর্মিলাকে নয়, ঊর্মিমালাকেই প্রবলভাবে কামনা করেছে। ঊর্মিকে তার চাই-ই চাই। তাকে ছাড়া তার জীবন আনন্দহীন, অর্থহীন বলে মনে হয়। কিন্তু সমাজে বাস করে সব কামনা বাসনা যে মেটানো সম্ভব নয় — এ বোধ তার মধ্যে আমরা প্রেমের প্রথম পর্যায়ে দেখতে পেয়েছি। সে (reality Principle) দ্বারা চালিত হয়েছে। সমাজ-

বাস্তবতাকে সরাসরি সে উপেক্ষা করে নি। তাই ঊর্মিকে প্রেয়সী রূপে সরাসরি স্বীকার করে শর্মিলাকে ত্যাগ করে নি। সে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সব সময়ের জন্য ঊর্মিকে নিজের কাছে রেখে দিয়ে ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজনের কাজটা সম্পন্ন করেছে। বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হলে মানুষের অহং (ego) যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে মীমাংসা করে নিতে চায়। শশাঙ্কের অহং বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের প্রয়োজনে তার অন্তর্নিহিত সুখসূত্র বা (Pleasure Principle)-কে অনেকটাই পরিবর্তিত করে নেয়। ঊর্মিলার আবেগ, ভালবাসা, স্বভাবের চাঞ্চল্য যে শশাঙ্কের মানসিক বিকৃতি বা প্রেমপ্রবৃত্তির বিকৃতির মূলে উত্তেজক (Seduction) হিসেবে কাজ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শিশু-সুলভ স্বার্থপরতা বা বহুবল্লভতার কামনা (Polymorphous perverse) শশাঙ্কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত থাকায় ঊর্মির সান্নিধ্যে তার বিস্ফোরণ ঘটে। তার প্রেমজীবনের সমস্যাই তাই তার জীবনের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আর তার সমস্যার সঙ্গেই আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে শর্মিলা ও ঊর্মিমালার প্রেম-সমস্যা ও সংকটের চিত্র। এ প্রসঙ্গে শ্রী সত্যব্রত দে বলেছেন — ''শর্মিলার মা-রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রিয়ারূপিনী ঊর্মিমালার উপস্থিতি এবং তার প্রিয়ারূপের বিকাশ প্রেমের বিচিত্র লীলায়, অন্যদিকে পত্নীর ঐকান্তিক মাতৃরূপতায় শশাঙ্কর প্রমাকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তি — এই সূত্র ধরেই লেখকের অজ্ঞাতেই কাহিনীর মধ্যে সমস্যার কেন্দ্রটি স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। অর্থাৎ সমস্যাটি মা ও প্রিয়া রূপের দ্বন্দ্ব থেকে সরে এসে প্রেমের একটি সমস্যারূপেই দেখা দিয়েছে।''[১৬৪] আমরাও মনে করি, উপন্যাসটির বিষয় শুধুমাত্র নারী জাতির দুই রূপের তাত্ত্বিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এর বিষয়বস্তু প্রসারিত হয়েছে মানবজীবনের প্রেম-সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে।

মালঞ্চ ঃ

'দুই বোন' রচনার কয়েক মাস পরেই 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি ১৩৪০ সালের আশ্বিন মাস থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে, ইংরেজী ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। 'দুই বোন' উপন্যাসটির মতো 'মালঞ্চ' উপন্যাসটিও আয়তনে ক্ষুদ্রাকৃতি। এখানেও রবীন্দ্রনাথ প্রেমতত্ত্ব ও প্রেম সমস্যার চিত্রকে তুলে ধরেছেন। অনেকে মনে করেন 'চতুরঙ্গ'

(১৯১৫ খ্রি.) পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে কাহিনির দীর্ঘ বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছা-ই উপন্যাসের স্বল্পায়তনের কারণ। অনেকে আবার বৃদ্ধ বয়সের ক্লান্তিকে উপন্যাসের আয়তন হ্রস্বতার কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা তা মনে করি না। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটিতে রোগজীর্ণা নীরজার ঈর্ষাকে কেন্দ্র করে পাত্র-পাত্রীদের গহন মনের গভীর প্রদেশের চিত্র যেভাবে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তাতে উপন্যাসটির বাংলা সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বৃহৎ আকৃতির উপন্যাস রচনার পরিবর্তে একটি সংক্ষিপ্ত ও সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যই এখানে প্রতিফলিত। তাছাড়া উপন্যাস বলতে রবীন্দ্রনাথ যে বিশালাকৃতির কিছু প্রস্তুত করা আবশ্যকীয় বলে মনে করতেন না তা আমরা জানি।

'মালঞ্চ ' উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে রোগশয্যায় শায়িত নীরজার অন্তরশায়ী হিংসার কারণ রূপে তার ব্যর্থ প্রেম ও তার ফলে সৃষ্ট অভিমান, নিদারুণ মর্মযন্ত্রণার কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন একজন মনস্তাত্ত্বিকের মতো। 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চের' মধ্যে আখ্যানগত সাদৃশ্য আছে। প্রথমটিতে নারীর মাতৃস্বরূপের পরিচয় রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে প্রিয়া স্বভাবের। তত্ত্বের দিক অনুরূপতা থাকলেও শিল্পসার্থকতার দিক দিয়ে বিচার করলে ' মালঞ্চ'-র শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই স্বীকার্য — '' 'দুই বোন' উপন্যাসের সঙ্গে 'মালঞ্চ'-র আখ্যানগত সাদৃশ্য আছে — উভয় উপন্যাসেই এক বিবাহিত পুরুষ অন্য রমণীতে আসক্ত হইয়াছে এবং উভয় গ্রন্থেই এই রমণীর অভ্যাগমের পূর্বে নায়কের স্ত্রীর অসুস্থতার কথা আছে। কিন্তু উপখ্যানে সাদৃশ্য থাকিলেও শিল্পকলার দিক দিয়া 'মালঞ্চ', 'দুই বোন' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।''[১৬৫]

'মালঞ্চ' উপন্যাসের শুরু নীরজার রোগশয্যায় — ''পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়।''[১৬৬] এরপর ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে আদিত্য-নীরজার মধুর দাম্পত্যের স্মৃতি পেরিয়ে কাহিনি ফেরে বর্তমানের রিক্ততায়, তিক্ততায়। আদিত্য ও নীরজা — স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাদের ফুলের বাগান পরিচর্যা করে। ফুলের ব্যবসায়ে নাম হয় আদিত্যর।

আদিত্য স্ত্রী নীরজাকে তার নন্দন- বনের ইন্দ্রানী বলে মনে করে। বিয়ের পর 'অবিমিশ্র সুখে' তাদের টানা দশ বছর কাটে। কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায় না। দশ বছর পর সন্তান সম্ভবনা ঘটে নীরজার। ধাত্রী সন্তান প্রসব করাতে গিয়ে সন্তানের প্রাণের মূল্যে মাকে কোনোক্রমে রক্ষা করে। কিন্তু নীরজা সংকট তথা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরলেও স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা খুইয়ে বালু-শয্যা-শায়িনী বৈশাখের নদীর মতো স্বল্পরক্ত দেহে ক্লান্ত হয়ে রোগ শয্যায় পড়ে থাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে সে দেখে স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত সৃষ্টি সখের বাগানটিকে, ভাবে এক দশকের দাম্পত্য-সুখের কথা। মাঝে মাঝে অবশ্য মৃত্যু চিন্তায় তার মনে বিষাদ ঘনিয়ে ওঠে— জীবন কখনো কখনো হয়ে ওঠে অসহ্য। এমন সময়ে আদিত্য-র আকৈশরের বন্ধু সরলাকে আদিত্য তাদের সংসারে নিয়ে আসে। সরলার আগমন ঘটেছিল মূলত বাগানের কাজে আদিত্যকে সাহায্য ও অসুস্থ নীরজার সেবার জন্য। কিন্তু বাগানের কাজে আদিত্যকে সাহায্য করতে গিয়ে সরলা তার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠল। নীরজার শূণ্যস্থানে সরলাকে বসানোয় নীরজা নিজে যেমন ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হয় তেমনি ঐ আগুন আদিত্য ও সরলার মনেও সঞ্চারিত করে। সরলা ও আদিত্যর সহজ বন্ধুত্বের সম্বন্ধের তলায় যে গভীর ভালবাসা চাপা পড়ে ছিল তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ছেলেবেলা থেকেই আদিত্য ও সরলা একই গুরুর কাছে দীর্ঘদিন থেকে বাগানের কাজ শিখেছে। তাই পরস্পরের প্রতি একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণ উভয়ের মনেই তখন গড়ে উঠেছিল। সে ইতিহাস গহন মনের গভীরে রক্ষিতও ছিল। তাই নীরজার ঈর্ষার সামান্য খোঁচাতেই তাদের অবদমিত বাসনা যা বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা প্রেমে পরিণত হয়। আদিত্য ও সরলা দুজনেই তাদের প্রেমের সম্পর্ক আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়। সরলার কথায় ''আমার উপর বৌদির রাগ দেখে প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়েনি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে।''[১৬৭]

আদিত্য বলে — ''কেন আমি ছিলুম অন্ধ। কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে।''[১৬৮] তাদের 'ছেলে বেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালবাসা নাড়া খেয়ে' ভেসে ওঠে উপরের তলায়। স্ত্রীর ঈর্ষাগ্নি এবং প্রেমের তীব্র

অন্তঃস্রোতে অস্থির আদিত্য তেইশ বছরের ভালোবাসার মর্যদা দিতে সরলাকে আন্তরিক ভাবে বরণ করে নিতে চায় — ''অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যার কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।''[১৬৯] সরলা নীরবে আদিত্যর প্রেমকে স্বকৃতি জানায়। কিন্তু নীরজার জীবদ্দশায় বাহ্যিক কোন সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে রাজি হয় না। মৃত্যুপথযাত্রী নীরজার চোখের সামনে থেকে সরলা তার মর্মযন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিতে চায় না। তাই আদিত্যর কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে থাকার বা সাময়িক বিচ্ছেদের জন্য সে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যায়। সরলা মনে করেছিল এর ফলে নীরজা শান্তি পাবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। অসুস্থ নীরজার হীনম্মন্যতাবোধ, অসপত্নতার কামনা এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, সরলার সবকিছুই তার কাছে কটুগন্ধী বলে মনে হত। সরলার কারাবরণের মধ্যে তাই নীরজা দেখতে পায় তার অহংকারকে — ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।''[১৭০] নীরজা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পায়। তাই হয়তো তার জীবন-তৃষ্ণাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দেয়। বাড়িয়ে দেয় প্রেমিকের প্রতি প্রেয়সী নারীর একাধিপত্য বজায় রাখার বাসনাকে। আদিত্য আর নীরজার ভালবাসায় মালঞ্চ প্রাণময়তায় ভরে উঠত। প্রেমময় মালঞ্চে নীরজার প্রেমশক্তি ছিল স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত। তাই জীবনের দাবী সে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সে মালঞ্চের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আদিত্যর কাছে তাই নীরজার কাতর আবেদন — ''আমাকে দয়া করো, দয়া করো। তোমাকে এত ভালবাসি সেই কথা মনে করে আমাকে দয়া করো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনই করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুটবে তেমনই করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তাহলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তাহলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব ?... আমি আর কিছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। ...কিন্তু আমাকে ভালবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।''[১৭১] জীবনাসক্তিতে ভেঙে পড়া নীরজাকে আদিত্য তেমন কোনো সান্ত্বনার

বাণী শোনাতে পারে না। আদিত্যর প্রতিক্রিয়া নীরজার কাছে নিরুত্তাপ বলেই মনে হয়। এরপর দেওর রমেনের পরামর্শে সে সর্বস্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়। মৃত্যুর আগে আত্মাকে দুঃখের জটে জড়িয়ে না ফেলে মুক্ত রাখতে চায়। তাই সরলাকে সে আপন বোনের মতো বুকে টেনে নিতে চায়। সরলা জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসলে তাকে 'সাদা মনে' দিয়ে যেতে চায় নিজের স্থানটা। কিন্তু জীবনের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত হলে দেখা যায় হিংস্র ঈর্ষায় ভেসে যায় নীরজার সংকল্প। ভাঙ্গা গলায় সে বলে ওঠে — ''পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।''[১৭২]

সরলার হাত চেপে ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাকে আরো বলে — ''জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।''[১৭৩] হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুদ গলায় বললে, পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।''[১৭৪] এরপর নীরজা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তার কণ্ঠ চির দিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

'চোখের বালি' উপন্যাসে মায়ের ঈর্ষাগ্নিই বিনোদিনীকে ঠেলে দিয়েছিল আশার দাম্পত্য-সুখে ভাঙন ধরাতে, মহেন্দ্রের রিপুকে 'দাঁত-নখ' বের করার 'কুৎসিত অবকাশ' এনে দিয়েছিল। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে দেখা যায়, নীরজার ঈর্ষার ফলেই আদিত্য ও সরলা জানতে পারে পরস্পরের প্রতি তাদের সংগুপ্ত ভালবাসার কথা। যার ফলে ভাঙনের গান শোনা যায় আদিত্য নীরজার মধুর দাম্পত্যেও।

ড. নীহার রঞ্জন রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ঈর্ষাকে মেনে নিলেও সমালোচকগণ তার অন্তিম পরিণতি তথা মৃত্যুর বীভৎসতাকে মেনে নিতে পারেন নি। তারা মনে করে রবীন্দ্রনাথ নীরজার প্রতি অবিচার করেছেন। লেখকের অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতাকেই তারা নীরজার মৃত্যুর কারণ বলে মনে করেছেন। এই প্রসঙ্গে ড. নীহার রঞ্জন রায়ের অভিমত — ''রবীন্দ্রনাথ নীরজাকে ভালবাসিতে পারেন নাই, তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ত নাই-ই, দয়াও নাই, অনুকম্পাও নাই ; অথচ, নীরজা নিরপরাধা। যে ঈর্ষা নীরজার চিত্তে, এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে-ঈর্ষা শেষ পর্যন্তও সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই,

সে-ঈর্ষা নীরজার কিছু অপরাধ নয় ; তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং শুধু ক্ষমা নয়, দয়া এবং অনুকম্পারও যোগ্য ! সহজ মানবিক করুণার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ নীরজাকে দেখেন নাই। নীরজাকে তিনি ভাল না বাসিতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষ সহজ মানবিক দৃষ্টিতে কেন তিনি তাহাকে দেখিতে ও দেখাইতে পারিলেন না, এ দুঃখ মনকে পীড়িত করে। নীরজার বঞ্চিত জীবনকে ঘিরিয়া একটি গভীর দুঃখ সঞ্চরমাণ; সেই গভীর দুঃখের মহিমা রবীন্দ্রনাথ তাহার চরিত্রে লাগিতে দিলেন না! যে বিশুদ্ধ গভীর দুঃখ, যে মহিমাময় ট্রাজিক্ পরিণতি নীরজাকে আমাদের হৃদয়ের নিকটতর করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে নীরজাকে একটি প্রমত্তা প্রেতিনীর মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া, আমাদের চিত্তে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার সঞ্চার করিয়া তাহার উপর শেষ যবনিকা টানিয়া দিলেন, হৃদয়বান কবির হাতে বঞ্চিতা, নিরপরাধা, অনুকম্পনীয়া একটি নারীর প্রতি এই নির্মম অবিচার চিত্তে ক্ষোভের সঞ্চার না করিয়া পারে না।''[১৭৫]

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন — ''মালঞ্চ' দুঃসহরকম নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। যেহেতু তিনি কারোরই মানসক্রিয়া উদ্‌ঘাটন করেননি, তা কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো পরিস্ফুটভাবে, ভাবখানা দাঁড়িয়ে গেছে যেন মুমূর্ষ নীরজাই অপরাধী, আদিত্য আর সরলাই অনুকম্পার পাত্র। নীরজার যদি কোন অপরাধ থাকে, সে অন্য কিছু নয়, তার স্বাস্থ্যহীনতা। আদিত্যের সঙ্গে তার দশ বছরের বিবাহিত জীবন উভয়তই পরিপূর্ণরূপে সুখের ছিলো, সেখানে কখনো সংশয়ের একটু ছায়াও পড়েছে এমন কোনো আভাস লেখক দেননি। ''[১৭৬]

সমালোচকদের এই অভিমত সর্বার্থে সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা মনে করি 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনো চরিত্রের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চিত্তে মনস্তাত্ত্বিক সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'Stream of Consciousness' বা 'চেতনাপ্রবাহ' রীতির ব্যবহার। আত্মকথন, স্মৃতিচারণ, স্বপ্নালুতা ও লিরিকতা, তির্যক বাক্যবিন্যাস, স্বগতোক্তি, অনুচ্চারিত আত্মকথন, একটি বা দুটি চরিত্রকে মাধ্যম করে তাদের মানসলোকের আলোকে সমস্ত জগৎকে স্বীকরণ ও প্রকাশ ইত্যাদিকে

চেতনা প্রবাহ মূলক উপন্যাসের বৈশিষ্ট হিসাবে ধরা হয়। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি মালঞ্চ উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। আত্মকথন, স্মৃতিচারণ, অনুচ্চারিত আত্মকথন — ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত নীরজাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে বার বার উঠে এসেছে। 'নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই।'— আয়া নীরজার সগত উক্তি প্রকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। নীরজা চরিত্রকে কেন্দ্র করে তার চেতনার আলোকে সমস্ত জগতকে প্রকাশের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিতে 'নববাস্তবতা'-র চারা রোপণ করেছেন। রোগশয্যায় ইর্ষাগ্নি ও নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণায় নীরজা যত দগ্ধ হয়, জীবনের প্রতি আসক্তি ও তার তত তীব্রতর হয়ে ওঠে। জীবনকে তীব্র ভালবাসায় আঁকড়ে ধরতে গিয়ে নীরজা বুঝতে পারে সংসার বড়ো নির্মম। কঠিন সংসারক্ষেত্রে কোনো এক মনের অভাব বা শূন্যতা এখানে অপূর্ণ থাকবে না — 'পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেম জালে। রমেনের পরামর্শে সে বৌদ্ধিক মুক্তিকে বরণ করতে চাইলে মন তার বশ্যতা তো কিছুতেই স্বীকার করে না। হৃদয়ের আগুন কোনো প্রবোধেই প্রশমিত হয় না বরং ঘুণপোকার মতো সন্দেহ কুরে কুরে খায় তার বিশ্বাসকে। সরলা কারাগারে গেলে বিশ্বাস-বিশ্বাসভঙ্গের পর আদিত্য নীরজা যখন একটু কাছাকাছি আসে তখন একদিন 'পেট্যুনিয়া' ফুলের পরিচয়কে কেন্দ্র করে আদিত্য হেসে নীরজাকে বলে যে সহধর্মিনীর সঙ্গে কারবার আধাআধি ভাগে চলছে। এর প্রতিক্রিয়ায় নীরজার উক্তি — ''সে-কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ওই যে দারোয়ানটা ওইখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ওই যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয় যন্ত্রটা। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি, মনে রেখো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে।''[১৭৭]

নীরজার চেতনার আলোকে জগতের ছবি যেন আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'নববাস্তবতা প্রবর্তন' এখানেই শেষ হয় না, নীরজার সাধের মালঞ্চ অন্য মালিনীর হাতে পড়বে — এই অসহ্য বাস্তবতার বিরুদ্ধে তার শরীর মনের সর্বশক্তি দিয়ে বিদ্রোহ জানিয়ে লুটিয়ে পড়ে ভূমিতে। তার ঐ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সে যেন

আদিত্য ও সরলার মিলনের বাস্তবতাকে ছারখার করে দিয়ে যায়। রুগ্না নীরজার মৃত্যু দৃশ্য আপাত দৃষ্টিতে বীভৎস বলে মনে হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যায়ে তার মনোবিকারের তীব্রতার ভিত্তিতে বিষয়টিকে দেখলে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। মানুষের মন রহস্যময়। মনের রহস্যময়তা একমাত্র গভীর সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনীয়। তাই ঘটনাগত বাস্তবতার নিরিখে মানব চরিত্রের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না — "বহুশত বছরের নৈতিক উত্তরাধিকার সত্ত্বেও মানুষ শেষ পর্যন্ত স্বভাবত অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট। হাজারগন্ডা নীতিকথায় তাকে সভ্য-ভব্য করে তোলার চেষ্টা আজও ক্ষান্তিহীন, তবু তার অহংকার, স্বার্থপরতা, নীচতা ইত্যাদি পুরাবৃত্ত হয়ে যায় নি। আদিত্য, সরলা, রমেন — সকলেই নীরজার মৃত্যুকে আসন্ন ও সুনিশ্চিত ধরে নিয়ে যে-সব কথা বলেছে, সেগুলি শুনতে খারাপ লাগে, তাতে আমাদের নীতিবোধ ক্লিষ্ট হয়, মনে হয় মানুষগুলি বড়ো নিষ্ঠুর। কিন্তু কী করা যাবে, সংসার তো আমাদের মর্জিতে চলে না! তাই এমন মুহূর্তও জীবনে আসে যখন জননী রোগগ্রস্ত সন্তানের মৃত্যু প্রার্থনা করেন।...যে প্রবল মনোবিকারে নীরজা দিনের পর দিন উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে তা যদি রমেনের মন্ত্রণায় প্রশমিত হত, তবে বরং খট্‌কা লাগত। বীভৎস হলেও নীরজার মৃত্যু 'ট্র্যাজিক'। ক্রন্দনপরায়ণ অনেক ঔপন্যাসিকের মতো রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে অশ্রুতে আপ্লুত হয় নি এবং পাঠকের অশ্রু আকর্ষণের চেষ্টা যে তিনি করেন নি, এটা খুব উল্লেখযোগ্য মনে হয়। আদিত্য নীরজাকে ক্ষমা করতে না পারলেও আমরা পারি এবং তার প্রতি সহানুভূতি ছাড়া অন্য কোনো বোধ আমাদের মনে জাগে না। আমরা মর্মে মর্মে বুঝি যে, সরলার প্রতি তার বিষোদ্‌গার এমন এক মানুষের মনোবিকার যার বাঁচবার সাধ ছিল প্রবল — কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। আমরা অনুভব করি, মৃত্যু যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, মরবার তার সময় হয় নি ; সে বাঁচতে চেয়ে নিদারুণ মুত্যুর কাছে নিরুপায় বলে হেরে গেল।"[১৭৮]

মৃত্যুপথযাত্রিনী নীরজা সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বামীকে অন্য নারীর হাতে সমর্পণ করতে চাইলেও তা সম্ভব হয় নি তার অবচেতন মনের অতৃপ্ত প্রেম বাসনার জন্য। এক্ষেত্রে মনকে ত্যাগের যে উচ্চগ্রামে বাঁধতে হয়, তা মুমূর্ষু অবস্থাতে যে কোনো

নারীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া নীরজা চরিত্রে প্রিয়া স্বভাবের পরিচয়ই প্রকট। 'দুই বোন'-এর শর্মিলা নারীর মাতৃ-স্বভাবের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে নীরজার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। প্রিয়া স্বভাবের নারীর স্বামীর প্রতি অধিকার বোধের মূলে থাকে আত্মাদর বা নিজের মূল্য সম্পর্কে এক ধরণের সচেতনতা। নীরজার এই আত্মাদর থেকেই জাগ্রত হয় সরলার প্রতি প্রবল ঈর্ষা। অসুস্থ নীরজার মনে যেটুকু আনন্দ ছিল তা তার স্বামী এবং সখের মালঞ্চকে ঘিরে। সেখানে সরলার আবির্ভাবে স্বামীর কাছে তার মূল্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা জন্মে। আদিত্য সরলা ও তার কাজকর্মের উপর যত বেশি নির্ভরশীলতার কথা ব্যক্ত করেছে নীরজার বেদনা ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। নীরজার মনের চেতন সত্তা যে ঈর্ষাকে দমন করার চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু তার প্রচেষ্টা বিফল হয়। তার কথা ও আচার-আচরণে ঐ দ্বন্দ্ব-মথিত মনের অভিব্যক্তিই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে — "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।"[১৭৯] — এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যেই তার হৃদয়-দ্বন্দ্বের স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে।

অসুস্থ নীরজার সরলার প্রতি ঈর্ষাবোধ পাঠকের স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। কেননা বিয়ের পর যেদিন নীরজা জেনেছে বাগান আদিত্যর প্রাণের মত প্রিয়, সেদিন থেকেই সে বাগানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। কিন্তু নীরজার সন্দেহ ও ঈর্ষা, অভিযোগ ও অভিমান আদিত্যর কাছে ছিল অভাবনীয়। কেননা আদিত্য-নীরজাকে 'নন্দন বনের ইন্দ্রানী' তার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী হিসেবেই দেখেছে। দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে নীরজা স্বামীর সহকর্মিণীর আসন থেকে সরে গিয়ে চির দিনের মতো রোগশয্যা গ্রহণ করলেও আদিত্যর পত্নী প্রেমে ভাঁটা পড়ে নি। স্ত্রীর নীরজার প্রতি তার মনোযোগের কোনো অভাব ঘটে নি। হাজার ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সে স্ত্রীকে প্রতিদিন পুষ্পার্ঘ উপহার দিয়েছে আন্তরিকতার সঙ্গে। এক্ষেত্রে কিছুমাত্র বিলম্ব কোনো দিন ঘটলে স্ত্রীকে অকপট আবেগে স্নাত ও স্নিগ্ধ করেছে। সরলার আগমনেও স্ত্রীর প্রতি আদিত্যর ভালবাসায় কিছুমাত্র মালিন্য স্পর্শ করে নি। কিন্তু নীরজার অবিশ্বাস ও সন্দেহবাতিকতায় তাদের দাম্পত্যে ভাঙন ধরায়। আদিত্য সরলার সুপ্ত প্রেমকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেয়। আদিত্য নীরজার প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে। তার বিমুখতার প্রধান

স্ত্রীর মিথ্যা সন্দেহ, অবিশ্বাস। স্ত্রীর প্রবল অবিশ্বাস আদিত্যর দীর্ঘ দশ বছরের আত্ম নিবেদনকে অর্থহীন করে দেয়, জাগিয়ে তোলে অন্তরের অন্তস্থলে সুপ্ত থাকা সরলার প্রতি তার প্রেমবাসনাকে। বাল্যের অবদমিত প্রেমই অনুকূল পরিবেশে আদিত্য ও সরলাকে দুর্বার বেগে পরস্পরের কাছে টেনেছে। নীরজার ঈর্ষার আগুনে সরলার নির্জ্ঞান মনের সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। ''বউদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে।''[১৮০] আদিত্যও বুঝতে পারে সুপ্ত প্রেমের অস্তিত্ব— ''বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। সেই সহজ সম্বন্ধে তলায় গভীর ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমার দোষ।''[১৮১]

আদিত্য সরলার বাল্যপ্রেম সামাজিক নিয়ম-নীতি তথা সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু বাল্যপ্রেমের বিনাশ ঘটে না। ঐ প্রেম অবদমিত হয়ে মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় নেয়। পরে অনুকূল পরিবেশে তা স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই বাল্যকালে ছেলেমেয়েদের মনের যৌনজীবন নিয়ন্ত্রিত করার বিষয়ে যেখানে আমরা উদাসীন থাকি সেখানে শৈবলিনীর জীবন ব্যর্থ হয়, বিফল হয়ে যায় দেবদাসের জীবন; আর আদিত্যর প্রেমের জীবনকে আবার শুরু করতে হয় নতুন করে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়, আদিত্যর অবদমিত প্রেম অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তার চেতন স্তরে উঠে আসায় সরলার প্রতি তার ভালবাসা একমুখীন হয়ে উঠেছে। নীরজার দিক থেকে এইজন্য সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সরলার প্রতি প্রবল সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে আদিত্য ও সরলা চরিত্রের মানসিক অবস্থানকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন ; মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচিত হয় নি। আঙ্গিকের এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই উপন্যাসটির বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। এখানে ঘটনার পটে চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ ও সজীব হয়ে উঠেছে। নীরজার হৃদয়স্পন্দন তো প্রতি মুহূর্তেই সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করা যায়। ইঙ্গিতে সংলাপে উপন্যাসটিতে প্রতিটি চরিত্রের সমস্যা-সংকটের চিত্র, নির্জ্ঞান মনের রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়।

উৎস সূত্র

১। বউ ঠাকুরাণীর হাট (সূচনা), রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড,
জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৩।

২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী
প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ.১৪৯।

৩। রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৫, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৮৩, পৃ. ১০-১১।

৪। পথে ও পথের প্রান্তে, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড,জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৩।

৫। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৭২।

৬। অচৈতন্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৫৯৮।

৭। পঞ্চভূত, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৬৬৬।

৮। শেষ সপ্তক, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ১৬৩।

৯। সাহিত্যের প্রাণ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৮৪৮।

১০। তদেব ; পৃ. ৮৪৮।

১১। সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ২৯২।

১২। সাহিত্য (পত্রোত্তর), রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৮৪১-৪২।

১৩। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, দশম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃঃ ৪৯৭।

১৪। আত্ম পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ১৮৮-৮৯।

১৫। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ১১২।

১৬। তদেব ; পৃ. ৩।

১৭। বউ-ঠাকুরানীর হাট, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ১০৯।

১৮। রাজর্ষি, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ১৯৭-১৯৯।

১৯। নৌকাডুবি (সূচনা), রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৪৯৮।

২০। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃঃ ১৪১।

২১। চোখের বালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৪৯৮।

২২। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য, বুদ্ধদেব বসু, নিউএজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ মে ২৯৫৫, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৮৩, পৃঃ ১৩।

২৩। তদেব ; পৃ. ১৩-১৪।

২৪। গোরা, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৩৪৯।

২৫। তদেব ; পৃ. ৩৫০।

২৬। তদেব ; পৃ. ৩৫০।

২৭। তদেব ; পৃ. ৩৪৯।

২৮। শেষের কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৭১৮।

২৯। দুইবোন, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৭৯৭।

৩০। রবীন্দ্র উপন্যাসঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, শ্রী ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০১, পৃ. ৮৮

৩১। চার অধ্যায়, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৯১৮।

৩২। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, সত্যব্রত দে, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১০, প্রজ্ঞা বিকাশ, পৃঃ ৫৩।

৩৩। চোখের বালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ২১২।

৩৪। তদেব ; পৃ. ২১৫।

৩৫। তদেব ; পৃ. ২৩৭।

৩৬। তদেব ; পৃ. ২১৩।

৩৭। তদেব ; পৃ. ৩০৭।

৩৮। তদেব ; পৃ. ২৪৬।

৩৯। তদেব ; পৃ. ২৭৮।

৪০। তদেব ; পৃ. ২৩০।

৪১। তদেব ; পৃ. ৩১১।

৪২। রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, বুদ্ধদেব বসু, চতুর্থ মুদ্রণ, মাঘ, ১৩৮৯, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৯৭।

৪৩। চোখের বালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ২৬৮।

৪৪। তদেব ; পৃ. ২৬৮।

৪৫। তদেব ; পৃ. ২৬৯।

৪৬। রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, পৃ. ২৯৭-৯৮।

৪৭। রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩ চৈত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, পৃ. ৮৩।

৪৮। নারীর মনুষ্যত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ২৮।

৪৯। চোখের বালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ২৬১।

৫০। তদেব ; পৃ. ২৩৬।

৫১। তদেব ; পৃ. ৩০৯।

৫২। তদেব ; পৃ. ৩৭৩।

৫৩। রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩ চৈত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, পৃ. ৮৪।

৫৪। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নীহার রঞ্জন রায়, ষষ্ঠ সংস্করণ, অঘ্রাণ,১৪১০, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ৪২৫।

৫৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৬২।

৫৬। চতুরঙ্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৩৫৬।

৫৭। তদেব ; পৃ. ৩৬৫।

৫৮। তদেব ; পৃ. ৩৬২।

৫৯। তদেব ; পৃ. ৩৬৪।

৬০। তদেব ; পৃ. ৩৬৫।

৬১। তদেব ; পৃ. ৩৬৫।

৬২। তদেব ; পৃ. ৩৫৬।

৬৩। তদেব ; পৃ. ৩৫৬।

৬৪। তদেব ; পৃ. ৩৬৫।

৬৫। তদেব ; পৃ. ৩৬০।

৬৬। তদেব ; পৃ. ৩৬৬।

৬৭। তদেব ; পৃ. ৩৮৮।

৬৮। তদেব ; পৃ. ৩৮৮।

৬৯। তদেব ; পৃ. ৩৭২।

৭০। তদেব ; পৃ. ৩৭৩।

৭১। তদেব ; পৃ. ৩৭৩-৭৪।

৭২। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, সত্যব্রত দে, তৃতীয় সংস্করণ, প্রজ্ঞা বিকাশ, জুলাই ২০১০, পৃ. ২০৮।

৭৩। তদেব ; পৃ. ২০৮।

৭৪। চতুরঙ্গ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৩৯২।

৭৫। তদেব ; পৃ. ৪০৪।

৭৬। তদেব ; পৃ. ৪০৪।

৭৭। তদেব ; পৃ. ৪০১।

৭৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, চতুর্থ খন্ড, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩৪৮ ।

৭৯। রবীন্দ্র উপন্যাসঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, ভূদেব চৌধুরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭২।

৮০। ঘরে-বাইরে, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৪০৭।

৮১। তদেব ; পৃ. ৪০৯ ।

৮২। তদেব ; পৃ. ৪১৩ ।

৮৩। তদেব ; পৃ. ৪১০ ।

৮৪। তদেব ; পৃ. ৪৩৫ ।

৮৫। তদেব ; পৃ. ৪৩৫ ।

৮৬। তদেব ; পৃ. ৪৫৮ ।

৮৭। তদেব ; পৃ. ৫১০ ।

৮৮। তদেব ; পৃ. ৫৪৭ ।

৮৯। তদেব ; পৃ. ৫৪৬ ।

৯০। তদেব ; পৃ. ৪১৬ ।

৯১। তদেব ; পৃ. ৪১৪ ।

৯২। তদেব ; পৃ. ৪৪৬ ।

৯৩। তদেব ; পৃ. ৪৯৫ ।

৯৪। তদেব ; পৃ. ৪৬২ ।

৯৫। তদেব ; পৃ. ৫৩২ ।

৯৬। তদেব ; পৃ. ৪০৭ ।

৯৭। তদেব ; পৃ. ৪১০ ।

৯৮। তদেব ; পৃ. ৪৩৫ ।

৯৯। মধ্যাহ্নে থেকে সায়াহ্নে, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩১ ।

১০০। ঘরে বাইরে, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৫৩৭।

১০১। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ নবমূল্যায়ণ, অমরেশ দাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২, পুস্তক বিপনি, পৃ. ৯৯-১০০ ।

১০২। ঘরে বাইরে, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৪২৯।

১০৩। তদেব ; পৃ. ৪২৮ ।

১০৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৬৬-৬৭ ।

১০৫। যোগাযোগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৭১০।

১০৬। তদেব ; পৃ. ৭১০।

১০৭। তদেব ; পৃ. ৭১০।

১০৮। গৃহদাহ, শরৎ রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, শ্রাবণ, ১৩৮৩, পৃ. ৩৬৯।

১০৯। যোগাযোগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৬৩৪।

১১০। তদেব ; পৃ. ৬৯২।

১১১। তদেব ; পৃ. ৭০৯।

১১২। সাহিত্যের মাত্রা , শরৎ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, শ্রাবণ, ১৩৮৩, পৃ. ৪৯৫।

১১৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃঃ ১৭৫-৭৬।

১১৪। যোগাযোগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৬৬০।

১১৫। তদেব ; পৃ. ৫৮০।

১১৬। গীতাঞ্জলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ২৯৬।

১১৭। যোগাযোগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৬৬৯।

১১৮। তদেব ; পৃ. ৭০৩।

১১৯। তদেব ; পৃ. ৫৯৮।

১২০। তদেব ; পৃ. ৭০৮।

১২১। তদেব ; পৃ. ৬০৬।

১২২। তদেব ; পৃ. ৬৩১।

১২৩। তদেব ; পৃ. ৫৮৯।

১২৪। তদেব ; পৃ. ৫৮৭-৮৮।

১২৫। তদেব ; পৃ. ৫৯৮।

১২৬। তদেব ; পৃ. ৫৯৮।

১২৭। তদেব ; পৃ. ৬০০।

১২৮। তদেব ; পৃ. ৬০৬-০৭।

১২৯। কুমুদিনী কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপসী বাংলা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৫, পৃ. ৬৯।

১৩০। যোগাযোগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৬০১।

১৩১। তদেব ; পৃ. ৬১৬।

১৩২। তদেব ; পৃ. ৬৬৭।

১৩৩। তদেব ; পৃ. ৬৬৭।

১৩৪। তদেব ; পৃ. ৬১৪।

১৩৫। তদেব ; পৃ. ৬৭৪।

১৩৬। ভারতবর্ষীয় বিবাহ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ১৩-১৪।

১৩৭। যোগাযোগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৫৯৭।

১৩৮। তদেব ; পৃ. ৬৭০।

১৩৯। নারীর মনুষ্যত্ব , রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ২৪।

১৪০। যোগাযোগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৭০৩।

১৪১। তদেব ; পৃ. ৭০৫।

১৪২। তদেব ; পৃ. ৭০৫।

১৪৩। তদেব ; পৃ. ৭০৫।

১৪৪। তদেব ; পৃ. ৭০৫।

১৪৫। তদেব ; পৃ. ৭০৫।

১৪৬। দুই বোন, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৭৯৭।

১৪৭। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ নবমূল্যায়ণ, অমরেশ দাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২, পুস্তক বিপনি, পৃ. ১১৭-১৮।

১৪৮। রবীন্দ্রনাথ, বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশঃ মে ১৯৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৯০।

১৪৯। দুই বোন, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৭৯৮।

১৫০। তদেব ; পৃ. ৮০৩।

১৫১। তদেব ; পৃ. ৮৩১।

১৫২। তদেব ; পৃ. ৮৩১।

১৫৩। তদেব ; পৃ. ৮৩২।

১৫৪। তদেব ; পৃ. ৮৩৩।

১৫৫। তদেব ; পৃ. ৮৩৪।

১৫৬। তদেব ; পৃ. ৮৩৪।

১৫৭। তদেব ; পৃ. ৮০৩।

১৫৮। তদেব ; পৃ. ৮০৩।

১৫৯। তদেব ; পৃ. ৮০৩।

১৬০। রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, পৃ. ৩২২।

১৬১। দুই বোন, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৮২৪-২৫।

১৬২। তদেব ; পৃ. ৮৩০ ।

১৬৩। তদেব ; পৃ. ৮২৭ ।

১৬৪ । রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, সত্যব্রত দে, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১০, প্রজ্ঞাবিকাশ, পৃ. ৩০৯।

১৬৫। রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, পৃ. ৩২৪।

১৬৬। মালঞ্চ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৮৩৭।

১৬৭। তদেব ; পৃ. ৮৫৭ ।

১৬৮। তদেব ; পৃ. ৮৫৯ ।

১৬৯। তদেব ; পৃ. ৮৫৯ ।

১৭০। তদেব ; পৃ. ৮৬৯ ।

১৭১। তদেব ; পৃ. ৮৭২ ।

১৭২। তদেব ; পৃ. ৮৭৪ ।

১৭৩। তদেব ; পৃ. ৮৭৪ ।

১৭৪। তদেব ; পৃ. ৮৭৪ ।

১৭৫। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নীহার রঞ্জন রায়, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগ্রাণ, ১৪১০, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ৪৫৯-৬০।

১৭৬। রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৫, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৮৩, পৃ. ১০৫।

১৭৭। মালঞ্চ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৮৭১-৭২।

১৭৮। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসঃ নবমূল্যায়ণ, অমরেশ দাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২, পুস্তক বিপনি, পৃ. ১২৫।

১৭৯। মালঞ্চ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৮৭৪।

১৮০। তদেব ; পৃ. ৮৫৭।

১৮১। তদেব ; পৃ. ৮৬৪।

চতুর্থ অধ্যায়

শরৎ -উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ

'যোগাযোগ' বা 'ঘরে বাইরে' বা 'মালঞ্চ' নিবিড় পাঠের প্রেক্ষিতে বলা যায়, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রের তুলনায় কিঞ্চিৎ আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ব্যক্তির নিজস্ব সংকট ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় দূরত্বকে বৃহত্তর আর্থ সামাজিক ভিত্তির নিবিড় অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠা দেন, শরৎচন্দ্র সেখানে নির্ভর করেন ভাবাদর্শ ও আবেগ-বাহুল্যের ওপর। অবশ্য বাঙালি সমাজের বর্ণাভিমান ও তজ্জনিত দূরত্বও শরৎসৃষ্টি চরিত্রের মূলে সক্রিয় থাকে। আর সক্রিয় থাকে সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের নানা স্তর। শরৎচন্দ্র ব্যক্তি-পাত্রের আবেগ ও তার বিশেষ ধর্মীয় আদর্শকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিতে গোটা মানুষটাকে যুক্তি পরম্পরায় দেখেছেন, শরৎচন্দ্র সেখানে বন্দী হয়ে পড়েছেন ব্রাহ্ম-বিদ্বেষের ঘেরাটোপে। ফলে, বর্ণভেদের সামাজিক সমস্যা বা সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারী রূপ শরৎ-উপন্যাসে যতটা বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত হয়েছে, দাম্পত্য-সমস্যা ততখানি নয়। 'চরিত্রহীন' বা 'শেষপ্রশ্ন'— কোনো উপন্যাসেই দাম্পত্য-সমস্যার মতো একান্ত নিবিড় ব্যক্তিগত সমস্যাকে তিনি গভীরভাবে ভেতর থেকে দেখেননি, দেখেছেন বাইরে থেকে। ফলে আরোপ-জনিত সমস্যা এবং জীবনবোধের ঘাটতি এসবক্ষেত্রে শৈল্পিক ত্রুটি রূপে দেখা দিয়েছে। সাহিত্য সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন—

''রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস বিংশ শতকের সূচনায় অনেক বেশি সামাজিক ও জাতীয় জীবন-নির্ভর হয়ে উঠেছে। শিল্পজাত ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, সামাজিক সমস্যা এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা বঙ্কিমের যুগের তুলনায় তীব্রতর হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপারে একথা যতটা সত্য, সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে হয়তো ততটা সত্য নয়। কারণ, যে পতিতা ও বিধবার সমস্যা, সতীত্বের সমস্যা এবং দাম্পত্যের সমস্যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বিষয়বস্তু হয়েছে সেগুলি বঙ্কিমের আমলেও ছিল, তবে তাদের দুঃসাহসিক ও গভীরতর উপস্থাপন-পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব। সমকালীন বিভিন্ন দেশের ঔপন্যাসিকদের রচনা-পদ্ধতি ও মোহমুক্ত বিচারবুদ্ধি নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ ও

শরৎচন্দ্রকে এই পূর্ব-প্রচলিত সমস্যাগুলিকে মোহমুক্তি দৃষ্টিতে বিচার করতে সাহায্য করেছে। অন্যান্য কতকগুলি সমস্যা — যেমন, দাম্পত্য জীবনের নতুন অধিকার-ভিত্তিক সম্পর্ক, নারী মুক্তির সমস্যা, দেহসম্পর্কহীন সতীত্ব, যৌন সমস্যা, মুক্ত প্রেম, বোহেমিয়ান উচ্ছৃঙ্খলতা... পরিবার ভাঙনের স্বরূপ ইত্যাদি নানা সামাজিক সমস্যা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিকদের বিশেষভাবে যে আলোড়িত করেছে তা বিংশ শতকের সমাজচিন্তা ও সামাজিক পরিবর্তনেরই ফল।''[১]

দাম্পত্য সমস্যা, স্বামী-স্ত্রীর দূরত্বজনিত বা বোঝাপড়ার ঘাটতি-জনিত সমস্যা ও তজ্জনিত চরিত্রের সঙ্কট শরৎচন্দ্রের তিনটি উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে — 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' ও 'শেষপ্রশ্ন'। এর মধ্যে 'গৃহদাহ' উপন্যাসটিই শ্রেষ্ঠ। অচলার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তার অভাব, দুই পুরুষের প্রতি তার নারী হৃদয়ের টানাপোড়েন এ উপন্যাসে সমস্যার মূল। পাশাপাশি নায়ক মহিমের অতিরিক্ত শীতলতা ও নিষ্ক্রিয়তা ও সুরেশের অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-বাহুল্যও এ উপন্যাসের দাম্পত্য-সমস্যাকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু চরিত্র চিত্রণের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, আকস্মিকতা তথা নাটকীয় পরিস্থিতি সৃজনের দিকে শরৎচন্দ্রীয় ঝোঁক লেখককে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে দেয়নি। সমালোচকগণ অচলাকে 'অস্থিরমতি' চরিত্র বলেছেন। আবার শেষপ্রশ্ন উপন্যাসটি যতটা তর্কবহুল, ততটা প্রাণবন্ত নয়। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের নায়িকা কমল প্রচুর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, অনেক তর্ক করেছে, কিন্তু প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কমল ও কিরণময়ী যেসব সমস্যা বা প্রশ্ন পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছে, তার মূলগত ভিত্তি হল যৌনতায় নারীর অধিকার এবং সে অধিকার প্রতিষ্ঠায় বা সম্ভোগে পুরুষ আধিপত্যের চাপিয়ে দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার। নারী-স্বাধীনতা বলতে কমল ও কিরণ দুজনেই প্রধানতঃ যৌন-স্বাধীনতাকে বুঝেছে। সামন্ত তান্ত্রিক সমাজে, নারীর আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্ন থেকে যৌন স্বাধীনতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়। ফলে, এই দুটি উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের অবস্থান সাহসী হলেও তাঁর পর্যবেক্ষণ নিবিড় ও ত্রুটিহীন একথা বলা যায় না। তবে, কমলের তুলনায় কিরণময়ী অনেক বলিষ্ঠ চরিত্র, একমাত্র কিরণকেই প্রানধর্মে প্রতিষ্ঠিত চরিত্র বলা যায়। কমল যতখানি তার্কিক, ততখানি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাণবন্ত চরিত্র নয়।

দাম্পত্যের ভিত্তি হল বিবাহ। হিন্দু বিবাহ-ঐতিহ্যে দেখা যায়, বিশেষতঃ প্রাক-স্বাধীনতা যুগে, দুটি অপরিচিত নর-নারীর মধ্যে বিবাহ নামক লোকাচারের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন। বোঝাপড়া ভালোভাবে গড়ে ওঠার আগেই শারীরিক সম্পর্ক, তারপর বোঝাপড়া তথা সমন্বয় ও একত্রবাসের পরিসর তৈরি হয়। পাশ্চাত্য বিবাহ-আদর্শের একেবারেই যা পরিপন্থী ; এমনকি, বাংলাদেশে ব্রাহ্ম আন্দোলন জনপ্রিয় হওয়ার যুগে ব্রাহ্ম সমাজে প্রাক-বিবাহ মেলামেশা এবং প্রাপ্তবয়স্কা ব্রাহ্ম নারীর স্বামী-নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। 'গোরা' উপন্যাসে ললিতা ও বিনয়ের মেলামেশা এবং পানুবাবুর বাগদত্তা হওয়া সত্ত্বেও সুচরিতার গোরার সঙ্গে মেলামেশার ছবি এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। শরৎচন্দ্র বিধবা নারীর সমাজ-নিষিদ্ধ মেলামেশাকে কিছুটা পরিসর দিলেও প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী নারীর স্বামী নির্বাচনের অধিকার বা প্রাক বিবাহ মেলামেশাকে ঔপন্যাসিক হিসেবে উদারচিত্ত ছাড়পত্র দেননি। এ জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র নির্বাচন 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলা এবং অচলা ব্রাহ্ম-হিন্দুঘরের প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়ে, শরৎচন্দ্রের যুগেও খুব সুলভ ছিল না, বিশেষত গ্রামীন সমাজে। নাগরিক জীবনে দু একটি বিরল ক্ষেত্রে হয়তো হিন্দু ঘরের আঠারো বছর বয়স্কা কুমারী মেয়ে দেখা যেত, কিন্তু তাদেরকে সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে আসার কথা শরৎচন্দ্র ভাবেননি। নাগরিক জীবন নিয়ে তিনি খুব কমই লিখেছেন।

সে যাই হোক, দাম্পত্য-সম্পর্ক নির্মানের যে মূল ভিত্তি, সেই বিবাহ-প্রথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ ছিল হিন্দু বিবাহের আদর্শ। তাঁর চরিত্ররা এই পথেই হেঁটেছে। এমনকি ব্রাহ্ম অচলাকেও তিনি এই পথ অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন মৃণালের মারফত। একমাত্র কিরণময়ী এবং কমল এই হিন্দু বিবাহ নির্ভর দাম্পত্যের আদর্শকে প্রস্থবানে বিদ্ধ করেছে। এরা হয়তো সমগ্র শরৎ উপন্যাসের ধারায় ব্যতিক্রম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র হিন্দু বিবাহ আদর্শ তথা দাম্পত্যের আদর্শকে মান্যতা দিয়েছেন।

বিবাহ যেহেতু সমাজ-অনুমোদিত, তাই বিবাহ-প্রথাকে মান্য করা বিবাহিত নর-নারীর কাছে প্রায় বাধ্যতামূলক। এই মান্যতার মূল্যবোধ কালক্রমে একটা সংস্কারে

পরিণত হয়েছে। সুতরাং বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী যেখানে নানা কারণে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারেনি, সেক্ষেত্রেও তারা প্রথা বা সংস্কারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে চায়। বিয়ে ভেঙে দেওয়া বা দাম্পত্যের বিচ্ছেদ অতি আধুনিক যুগের অতিশায়িত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলশ্রুতি।

আধুনিক কালের লেখক হওয়া সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে নারীর অমর্যাদা বা অবমূল্যায়ণ সম্পর্কে প্রতিবাদ মুখরিত হলেও দাম্পত্য বা বিবাহ-আদর্শের ক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহের সংস্কার থেকে তাঁর চরিত্ররা মুক্ত হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মনের মধ্যেই যে প্রচুর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তার প্রতিফলন তাঁর কথা সাহিত্যে পাওয়া যায়, আর এরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হলো তাঁর আধুনিকোচিত দৃষ্টিভঙ্গির অস্পষ্টতা; এই অনাধুনিকতা তথা অস্পষ্টতার জন্যই তাঁর দাম্পত্য-সংশ্লিষ্ট চরিত্রেরা আপন যুগকে অতিক্রম করতে পারেনি। যেমন, 'দত্তা' উপন্যাসের ধনী ব্রাহ্মকণ্যা বিজয়া ব্রাহ্মসমাজেরই আর এক নিষ্ঠাবান কর্মী বিলাসবিহারীর বাগদত্তা ছিল, কিন্তু নরেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে সেই পুরাতন প্রস্তাব নাকচ করেছে এবং হিন্দু নরেনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘটা করে নরেনদের কুলপুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শুনে রীতিমত পিঁড়িতে বসে বিয়ে করেছে। এক্ষেত্রে তার যেমন কোন মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেননি লেখক; তেমনি নরেনেরও ব্রাহ্মকন্যাকে হিন্দু-বিবাহের প্রথা মান্য করাতে বাধ্য করানোর ক্ষেত্রে কোনোরকম মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা যায়নি।

শুধুমাত্র অন্ধ প্রথানুগত্য ও সংস্কারকে মান্যতা দিতে গিয়ে শরৎ-উপন্যাসের অনেক দাম্পত্য সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও শেষ পর্যন্ত ভাঙনে পর্যবসিত হয়নি। স্বামী হীন চরিত্রের, স্ত্রীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না, তবুও স্ত্রী প্রাণপন স্বামীর সেবা করে দাম্পত্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, শরৎ-উপন্যাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন, 'শুভদা' উপন্যাসে স্বামী হারান দুশ্চরিত্র, নেশাগ্রস্থ, মনিবের টাকা তছরূপ করে কারাবাসকে বরণ করতে বসেছে, কিন্তু শুভদা সব জেনেশুনেও, গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও স্বামীকে বাঁচাবার জন্য মনিবের হাতে পায়ে ধরেছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অন্নদাদিদি

(প্রথম পর্ব) এবং অভয়ার (দ্বিতীয় পর্ব) মধ্যে এ ব্যাপারে মৌলিক সাদৃশ্য আছে। অবশ্য কাহিনির শেষদিকে অভয়াকে বিদ্রোহিনীরূপে দেখিয়ে শরৎচন্দ্র তাকে হিন্দু বিবাহ সংস্কারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাহিনির অন্তিমে এইরকম বিদ্রোহ করবার আগে অভয়া হীনচরিত্র স্বামীর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়ে মিলিত হবার প্রভূত চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ শুভদার মতো অভয়াও প্রথমদিকে অসুখী দাম্পত্যকে মেরামত করবার ও টিকিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছে। আবার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথমপর্বের অন্নদাও বারম্বার সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রমাণে ব্রতী হয়েছে। অন্নদার স্বামী সাহজীও কাপুরুষ ও দুশ্চরিত্র, শ্বশুরালয়ে অধিষ্ঠানকালেই সে বিধবা শ্যালিকার ওপর বলপ্রয়োগ করে এবং তাকে হত্যার পর প্রাণে বাঁচতে ধর্ম পাল্টে মুসলমান হয়। এসব সত্ত্বেও অন্নদাদিদির সতীত্ব অটুট ও নিষ্কলঙ্ক। কারণ, বিধর্মী অমানুষ স্বামীর সেবাযত্নে মহীয়সী হিন্দু কুলবধূ হিসেবে অন্নদাদিদি প্রভূত দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন। 'দেনা পাওনা' উপন্যাসেও মদ্যপ অত্যাচারী স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনবার জন্য ষোড়শী অনেক নির্যাতন, অনেক কৃচ্ছ্রতা সহ্য করেছে।

একটা আনুপাতিক সমীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, শরৎউপন্যাসে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ বা সঙ্কটের তুলনায় দাম্পত্য টিকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টাই বেশি। বিদ্রোহিণী বা গৃহত্যাগিনী স্ত্রী-চরিত্রের তুলনায় মেনে-নেওয়া বা মানিয়ে-নেওয়া স্ত্রী-চরিত্রই শরৎ-সাহিত্যে সমধিক।

বিদ্রোহিনীদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়বে 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের কমলকে। কমল তো বিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বস্তুত এটাই তার বিদ্রোহ! একদা শিবনাথ নামক যুবকের সঙ্গে কমলের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু শিবনাথ কমলকে ত্যাগ করে এবং মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পাল্টা দান হিসেবে কমলও শিবনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কমলের স্পষ্ট যুক্তি, দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাই যখন আর নেই, ভালবাসা নেই বলে দায়বদ্ধতাও নেই; তাহলে শুধুমাত্র সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শিবনাথের স্ত্রী পরিচয়ে বেঁচে থাকা অর্থহীন! এরপর কমল, মানসিকভাবে শিবনাথ-বৃত্ত অতিক্রম করে নতুন করে ঘর বাঁধতে এগিয়ে গেছে অজিতের দিকে। এবার কিন্তু কমল আর আচার-সর্বস্ব বিবাহ-প্রথাকে

মান্যতা দিতে চায়নি। যেভাবে সে বিবাহ-প্রথার পরিচিতিকে অস্বীকার করে অজিতের সঙ্গে একত্র জীবনযাপন করে দাম্পত্যের নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে একালের ভাষায় 'লিভ-টুগেদার' বলাই যায়। অজিত বারম্বার অনুরোধ করেছে বিবাহের জন্য, সে বিবাহিত দাম্পত্যই চেয়েছিল প্রথাকে মান্যতা দিয়ে, কিন্তু কমল আর নতুন করে কোন বিবাহের বন্ধনে নিজেকো জড়াতে চায়নি। কমল মনে করেছিল বিবাহ একটা আনুষ্ঠানিক আচার মাত্র, তার চেয়ে ভালবাসার মন্ত্রের জোর বেশি! এই নবলব্ধ উপলব্ধির দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই কমল বারম্বার অজিতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। অভয়াও এইভাবে রোহিণীদাদার সঙ্গে বার্মায় পালিয়ে যায়। তার সঙ্গে একত্র বসাবস করে প্রথা-উত্তীর্ণ দাম্পত্যের নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে। কমল ও অভয়া দু'জনেরই বিবাহিত জীবন ব্যর্থ, তাই বিবাহ-ব্যতিরিক্ত ভালোবাসার জীবনকে তারা জীবনের চূড়ান্ত পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই চরিত্র দু'টিতে শরৎচন্দ্রের আধুনিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য কমলের বিপরীতে আশুবাবুর চরিত্রটি সৃষ্টি করে এবং তাঁর মুখে কমলের বক্তব্যের স্নিগ্ধ বিরোধিতা উপস্থাপন করে শরৎচন্দ্র প্রথাগত হিন্দু দাম্পত্যকেও স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক আশুবাবুর বক্তব্যের মধ্যেই বিবাহ-প্রথা ও দাম্পত্য-আদর্শ সম্পর্কে শরৎ-মানসের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করেন।

আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্র হিন্দু বিবাহ-প্রথার, তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতার পুরোপুরি অবসান চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রথাটির কিছু সংশোধন করে প্রথাটিকে টিকিয়ে রাখতে। প্রসঙ্গত বলা যায়, শরৎচন্দ্র বিশিষ্ট দার্শনিক বার্টাণ্ড রাসেলের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। বার্টাণ্ড রাসেলও প্রচলিত বিবাহ-প্রথাকে টিকিয়ে রাখতেই চেয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ছিলেন একটু বেশিরকম বিশুদ্ধতাবাদী বা Puritan। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মহিম ও অচলার দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যত গভীর ও ব্যাপক অন্য উপন্যাসগুলিতে ততটা নয়। ছোটো বড়ো, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ধরলে শরৎচন্দ্রের মোট উপন্যাসের সংখ্যা আটাশ টি। মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার দিক থেকে দেখতে গেলে চরিত্রহীন (১৯১৭ খ্রি.) শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (১৯১৭ খ্রি.), শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৮ খ্রি.) গৃহদাহ (১৯২০ খ্রি.),

দেনাপাওনা (১৯২৩ খ্রি.) শ্রীকান্ত, তৃতীয় পর্ব (১৯২৭ খ্রি.) এবং শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩ খ্রি.) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম পর্বে লেখা 'বিরাজ বৌ' রচনাটিত বিরাজের দাম্পত্যের দ্বন্দ্বময়তায় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভবনা ছিল। কিন্তু শিল্পীমনের নিরপেক্ষতার অভাবে সেই সম্ভবনা ক্ষুন্ন হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের রচনা 'বিরাজবৌ'। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে দাম্পত্য সমস্যার ছিবি চিত্রিত হয়েছে। এখানে দাম্পত্য সমস্যার চিত্রনের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক সচেতনতার পরিচয় স্বল্পাভাসে ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেও 'চোখের বালি' উপন্যাসটির মতো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এখানে দেখা যায় না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিরাজ বৌ' রচনাটিকে তাঁর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে 'শ্রেষ্ট গল্প' বলে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, বিরাজবৌ এবং নীলাম্বরের দাম্পত্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বময়তার আভাসও পেয়ে ছিলেন। ''তাহার (বিরাজ) সম্বন্ধে কুৎসিত সন্দেহ-পোষন শুধু দাম্পত্য প্রেমের অবমাননা নহে, ঐকান্তিক সাধনার নির্মল পবিত্রতায় কলঙ্ক-লেপন। কাজেই বিরাজের রোগজীর্ণ, পরিচর্যা ক্লান্ত, আত্মনিপীড়নে বিপর্যস্ত মনে একটা অস্বাভাবিক, অকল্পনীয় সংকল্প মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া খুবই সম্ভব। এক মুহূর্তের রোষন্ধতায় আত্মহত্যার প্রেরণা অতর্কিতভাবে অকৃতজ্ঞ স্বামীর প্রতি সমুচিত দন্ডবিধাণের সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হইয়াছে।''[২]

শরৎচন্দ্র ভারতীয় সনাতন দাম্পত্যের সতীত্বের সংস্কার সামনে রেখেই বিরাজের চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয়। নীলাম্বরের স্ত্রী বিরাজের মধ্যে ছিল ভারতীয় হিন্দু নারীর সতীত্বের সংস্কার। সে তার রুগ্ন-স্বামীকে শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তার ভালোবাসায় নারীর মাতৃরূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাসের শশাঙ্কের প্রতি তার স্ত্রী শর্মিলার ভালোবাসায় মাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরাজের দাম্পত্য জীবনেও দেখা যায় —— স্বামীর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে নিরন্তর দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়েই সে তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেছে।

মাতৃভাবের ভালোবাসায় শশাঙ্কের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়নি। তাই শর্মিলার সহোদরা ঊর্মিলার প্রিয়াভাবের ভালোবাসার প্রতি তার আদিম প্রবৃত্তি অপ্রতিরোধ্য বেগে ধাবিত হয়েছে। নীলাম্বরের ক্ষেত্রে এমন কোন অবদমিত আকাঙ্ক্ষা তাদের দাম্পত্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেনি। 'বিরাজবৌ' রচনাটিতে নীলাম্বর বিরাজের কোন আকাঙ্ক্ষাকেই পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। উপরন্তু তাদের স্বভাবের মধ্যে ছিল প্রবল বৈপরীত্য। এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অবদমনের গহ্বর থেকে একদিন বেরিয়ে এসে জমিদারের লম্পট পুত্র রাজেন্দ্র প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে চলে আসে।

সংসারের দায়দায়িত্বের প্রতি নীলাম্বরের ছিল একপ্রকার ঔদাসীন্য। বিরাজ তা সহ্য করতে পারতো না। তবুও সন্তানহীন দাম্পত্যে স্বামীর যাবতীয় অক্ষমতা মেনে নিয়েও বিরাজ তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে যায় হিন্দু নারীর সতীত্বের সংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে। নীলাম্বর বিরাজের যত্ন-আত্তি এবং দৈব সংস্কার-উপোস ইত্যাদিকে তার পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। উপন্যাসটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় সন্তানহীনা বিরাজের যে সংস্কারকে স্বামীর-পাগলামি বলে মনে করে তার মূলেও রয়েছে স্বামীর কল্যাণকামনায় সতী নারীর বদ্ধমূল স্বামী সংস্কার — "পাগলামি নয় ? আসল পাগলামি! মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাতে বুঝতে, স্বামী কি বস্তু! তখন বুঝতে, এমন দিনে তার জ্বর হলে বুকের ভিতরে কি করতে থাকে।"[৩]

নীলাম্বরের বেশ কয়েকদিনের জ্বর ভোগের পর স্ত্রীর নিষেধ অমান্য করে মতি চাঁড়ালের মিনতি মেনে তার ছেলে ছিমন্তের প্রাণ বাঁচাতে যায়। বিরাজ স্বামীর কাছে একটু সমাদর একটু গুরুত্ব প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ বিরাজ বলে "তার কান্না দেখলে — কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি ?"[৪] এমনকি তৃতীয় পরিচ্ছেদে তার ভালোবাসার আরও মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে বিরাজের স্বামীর করুণ স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের মৃত্যুকে যাচতে স্বামীকে উপায় বাৎলাতে বলে —"... কি খেলে মরণ হয় বলে দিতে পার ?... হয় বলে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল, কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছ।"[৫] আসলে একমাত্র বোনের বিয়ে উপলক্ষ্যে সাধ্যাতীত ব্যয়ের জন্য ধার করায় তাদের সুখের দাম্পত্য দাঁড়িয়ে পড়ে

বালির বাঁধের উপর। একের পর এক স্বামীর অপমান সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু স্বামী তার ঋণ মুক্তির প্রস্তাবে তেমন একটা সাড়া দেয় না। ক্রমে তাদের অম্ল-মধুর দাম্পত্যে শীতলতা দেখা দেয়। যার অনিবার্য পরিণাম এক দূরতিক্রম্য দূরত্ব। টলতে থাকে বিরাজের যাবতীয় বিশ্বাস সংস্কার। বিরাজ একদা স্বামীর পা ছুঁয়ে জীবনের শেষ দিনের বিদায়ের ভাবনা ভেবেছে। সেই স্বামীর প্রতি অচলাভক্তি ধরে রাখতে পারেনি। একাদশ পরিচ্ছেদে নেশা করে দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি গোপাল চক্রবর্তীর মৃতদেহ সৎকার করে ফিরে নীলাম্বর অসুস্থ জ্বর-তপ্ত স্ত্রী বিরাজের অভিমান-অভিযোগে বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয়নি। পরন্তু তাঁর চরিত্র নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করতে ছাড়েনি। সেই নেশার ঝোঁকে মনের অবচেতনে ঘুরপাক খাওয়া বিরাজের সযত্নে লালিত সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয় অকৃতজ্ঞ বিবেকহীন নীলাম্বর —

"নীলাম্বর বলিল, কার চোখে ধুলো দিতে চাস বিরাজ ? আমার ? আমি অতি মূর্খ, তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোটভাই, যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নইলে কেন তুই বলতে পারিসনে কোথা ছিলি ? কেন মিছে কথা বললি — তুই ঘাটে ছিলি ?"[৬]

নীলাম্বরের আচরণ শুধু স্ত্রীর চরিত্রে কালিমা লেপনেই ক্ষান্ত হয়নি। তার বাস্তব পরিণতি বা অভিঘাতে এই পরিচ্ছেদেই নীলাম্বর হাতের কাছে পাওয়া পানের শূন্য ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। বিরাজ রক্তাক্ত হয়। শরীরের আঘাত থেকে বড় হয়ে ওঠে মর্মপীড়া। সে মেনে নিতে পারে না স্বামীর এইরূপ নির্বিবেচকের মতো ব্যবহার। তবু নেশায় মত্ত স্বামীর হুঁশ ফেরে না। সে আরো ঝাঁঝালো বাক্যবাণের খোঁচায় স্ত্রীর সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেয় —

"...না, মারিনি। কিন্তু দূর হ সুমুখ থেকে — ও মুখ আর দেখাস নে— অলক্ষ্মী, দূর হয়ে যা! "[৭]

তবে বিরাজও আর কোন অপেক্ষা করল না। নীলাম্বরের এহেন কটূবাক্যে তার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করলো। তার মুখ ফুটে বেড়িয়ে এল অত্যাচারিতের মনের নিদারুণ ভাবনা —

"'...এই এক বছর যাই-যাই করছি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। চেয়ে দেখ, দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এক পা চলতে পারিনে আমি। যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপাবদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না।'"[৮]

বিরাজ নিজে আত্মঘাতী হবার সংকল্প নিয়ে সরস্বতীর জলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে হঠাৎ-ই তার জেদ চেপে গেল। সে যা কখনও ভাবতে পারেনি তাই করল। সে তার বাড়ির পরিচারিকা সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করল। এই চাকরানী সুন্দরীকেই তার বাড়ি থেকে সে কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছিল চরিত্রহীনতার জন্য। ঘটনার বাস্তব অভিঘাতে বিরাজকে বাধ্য করা হল জমিদার পুত্রের আদিম প্রবৃত্তির কাছে ধরা দিতে। একদা এই জমিদার পুত্রের স্নানের পুকুর ঘাটে লম্পটের মত নারীশরীর ভোগের দৃষ্টি সে মেনে নিতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিল। আর সেই পাপ ভয়ে ভীত, স্বামীর মঙ্গলের ভাবনায় সদা তটস্থ বিরাজই কিনা নিজের অসতীত্ব অপবাদকে মেনে নিতে না পেরে চৌদ্দ পরিচ্ছেদে বলেছে — "... সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!"[৯]

স্বামীর কাছে গায়ে হাত তোলা সতীত্ব নিয়ে কটু কথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তার অপূরণীয় কামনা-বাসনার আদিম রিপু এর পর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নি। আর এতদিনে সযত্নে চর্চিত যাবতীয় সংস্কারের মুন্ডপাত ঘটিয়ে বিরাজ যেন নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অপবাদকেই প্রমাণ করে নিজের জীবনের মধ্যে তার সমুচিত জবাব দিতে চেয়েছে।

বিরাজ এই চৌদ্দ পরিচ্ছেদেই জমিদারের সুশ্রী বজরায় সওয়ার হয়েছে। জমিদার পুত্র নেশায় উন্মত্ত চরিত্রহীন রাজেন্দ্রের সামনে বসে বিরাজের মনের অবস্থাকে শিল্পী শরৎচন্দ্র বেশ সুন্দরভাবে এঁকেছেন। দ্যোতনা দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বিবর্তিত নতুন বিরাজের সতী ধর্ম, ন্যায়নীতি আদর্শের দুর্বার প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের দিক কে তুলে ধরে—

"তাহার এত কাছে পরপুরুষ বসিয়া, অথচ মুখে তাহার আবরণ নাই। মাথায় এতটুকু আঁচল পর্যন্তও নাই। এই সময়ে বজরা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই

দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া হাত দিয়া ডালপালা সরাইতে ব্যস্ত হইল। নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাঁটার টানও এখানে অত্যন্ত প্রখর। ওরে সাবধান বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়ীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশ্যে — লাগবে, — ভিতরে আসুন— বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। বিরাজ মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্রচালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ 'মাগো' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।''[১০] শেষ পর্যন্ত নিজের কৃতকর্মের পর হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অতল জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জয়ী হয়েছে তার মধ্যে চলা সতীত্বের আজন্মলালিত সংস্কার। সে কোন মতেই মেনে নিতে পারেনি ক্ষণিকের আবেগের বা জেদের বশে করে বসা ভুলকে। তার সংস্কার-বিশ্বাস আর পাপবোধ তাকে শেষ পর্যন্ত আদি রিপু চরিতার্থ করার সুযোগকে গ্রহণ করে নি। শরৎচন্দ্র বিরাজকে দাম্পত্যজীবনের আশাভঙ্গের বেদনার থেকে তৃতীয় পক্ষের দিকে ঝোঁকার একটি সংকেত দিয়েছেন মাত্র। সম্ভবনাকে জিইয়ে রেখেও রক্ষনশীল শরৎচন্দ্রকে জয়ী করেছেন সেই চিরন্তন পারিবারিক নীতি ও আদর্শকেই। তিনি পরিস্থিতির পুরো সুযোগ-সম্ভাবনাকে কাজে লাগালে এই রচনার পরিণতি কি হতে পারতো তার একটা ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই।

চরিত্রহীনঃ

শরৎচন্দ্রের বিতর্কিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) অন্যতম। সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম এবং নারীর অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষার বেআব্রু প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসটিতে। বিবাহিত নারীর দুর্বার অপ্রতিরোধ্য প্রেম ও পর-পুরুষের সঙ্গে দেহ-মিলনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সেকালে আলোচক, সমালোচক এবং পন্ডিত মহলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। উপন্যাসটিতে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্রের সমধিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সাবিত্রী ও কিরণময়ী-চরিত্র দুটির মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক যৌন জীবনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও সৃজনমুখী আদিম প্রবৃত্তির দিকটিকেই রূপায়িত করেছেন। মানব মনের অন্তগূঢ় প্রদেশের সুপ্ত যৌনতাবোধ (Sexuality) যাকে যৌন মানস শক্তি বা 'Psychic energy' বলে প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য অবদমিত হয়ে মনের নির্জ্ঞানস্তরে আশ্রয় নিলেও তা বিলুপ্ত

হয় না। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ছদ্ম রূপের আশ্রয়ে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা চেতন স্তরে এসে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

শরৎ সাহিত্যের জটিল-মনস্তত্ত্বিক চরত্রগুলির মধ্যে কিরণময়ী অন্যতম। স্বামী হারাণপন্ডিতের রুগ্নতা এবং জ্ঞানতন্ময়তার কিরণময়ীর ক্ষুধিত যৌবনের পিপাসা অতৃপ্তই থেকে যায়। কিরণময়ীর রূপ সৌন্দর্য অনঙ্গ ডাক্তারকে মুগ্ধ করেছিল। অনঙ্গ ডাক্তারের লালসার শিকার হয়েছিল কিরণময়ী — আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই কেননা বিনা পয়সায় স্বামীর চিকিৎসা করিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তার শাশুড়ীর ও প্রশ্রয় ছিল। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে দেখা যায় বিনা পয়সায় স্বামীর চিকিৎসার বিষয়টি উপলক্ষ্য মাত্র। মূল লক্ষ্য অনেক বছরের 'দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালায় তার আদিম প্রবৃত্তি (Id) অপ্রতিরোধ্য শঙ্কিতে বেরিয়ে এসে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজতে চেয়েছে।

সে বিবাহিত তাই তার ইগো বা অহংবোধ অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে অবাধ অসামাজিক প্রেমে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারকে প্রশ্রয়ের বিষয়টি তার অহংবোধ বা ইগো (ego) মেনে নিয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর কিরণময়ীর প্রেম-প্রবৃত্তি উপেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তৃপ্ত হতে চেয়েছে। কিন্তু উপন্দ্রে কিরণময়ীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। তার ঐ প্রত্যাখানে কিরণময়ীর প্রবৃত্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন কিরণময়ীর অসাধারণ শক্তি, দৃপ্ত তেজস্বিতা। তার শক্তি ও তেজের প্রকাশ দেখা যায় যখন উপেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনঙ্গ ডাক্তারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের সমস্ত গয়না ডাক্তারের পায়ে উজাড় করে দিয়েছিল।

স্বামীকে হারানোর পর কিরণময়ীকে বিকারগ্রস্থ হতে দেখা যায় যখন উপেন্দ্র তার প্রেম প্রত্যাখান করে। উপেন্দ্রের মৃত্যুর আঘাত তাকে উন্মাদিনী করে তোলে। কিরণময়ীর বিকারের চিত্র শরৎচন্দ্র নৈপুন্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিরণময়ীর অসঙ্গত উক্তি আচরণের মূল নির্জ্ঞান মনের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। উপেন্দ্রের স্ত্রী সুরবালার

সুখী দাম্পত্যের চিত্র তার মনে ঈর্ষাবোধকে জাগ্রত করেছিল। এর সঙ্গে উপন্দ্রের উপেক্ষা তার মনে প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে। তেত্রিশ পরিচ্ছেদে শাশুড়ী অঘোরময়ীর মিথ্যা অভিযোগে কিরণময়ীর আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে উপেন্দ্র তাকে 'নাস্তিক', অপবিত্র , ভাইপার বলে নিন্দা করে চলে গেলে সে মর্ম-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়, মানসিক ভারসাম্য হারায়। কিরণময়ীর মনোব্যাধি এবং জটিল মানসিকতার জন্য পরিবেশের একটা বড় ভূমিকা ছিল। ফ্রয়োডোত্তর মনোবিজ্ঞানী পাভলভের মতে মানুষের মানসিকতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কিরণময়ীর স্বামীর কাছ থেকে বিবাহিত জীবনে শুধু বঞ্চনাই পেয়েছে। শাশুড়ীও পুত্রবধূর প্রতি একপ্রকার উদাসীন ছিল। অসুখী গৃহপরিবেশ তার আবেগ অনুভূতি নিরুদ্ধ হওয়ায় বিকারের মাধ্যমে তার বহিপ্রকাশ ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসগুলি অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বাহী 'গৃহদাহ' তাদের মধ্যে অন্যতম। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র, ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন,অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন,১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৬ সালের আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।'' (৪র্থ পৃ. ৬০১) শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে নারী মনের প্রেম-বাসনা, তার ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিষিদ্ধ প্রেমের দিকটি চিত্রিত হয়েছে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে এসব কিছুর পরিচয় তো আছেই অধিকন্তু আছে নারীর গহন মনের গভীরতার পরিচয় যা শরৎচন্দ্রের অন্য উপন্যাসে বিশেষ দেখা যায় না। এখানে পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'জন পুরুষের দোটানায় পড়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অচলার দাম্পত্যে যে সমস্যা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন- করেছেন। বিবাহিত রমণীর জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির বা বিবাহিত নারীর উপস্থিতির ফলে দাম্পত্য-সমস্যার সৃষ্টি বা বিবাহিত নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি —— নতুন কোন বিষয় নয়। কিন্তু 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলার অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তির দিকটিই শুধু প্রকাশিত হয় নি, অন্য পুরুষকে নিয়ে সারাজীবন চলার বাসনার দিকটিও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দু'জন পুরুষকে নিয়ে সারা জীবন চলার বাসনাই তার চরিত্রটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

মহিম ও সুরেশ — এই দুই বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণে অচলার মনোলোকে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ঔপন্যাসিক তা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গৃহদাহ' উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম — মহৎ-চিত্তে অনচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়ানক তাহা ইহাতে সুনিপুণ বিশ্লেষণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।''[১১]

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর 'গৃহদাহ' উপন্যাসের রচনা শুরু হয়। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বিমলার দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল সন্দীপের আবির্ভাবের পর। দাম্পত্য জীবনের প্রবেশের পূর্বেই অচলার জীবনে সুরেশ এসে উপস্থিত হয়েছে। বিবাহের পূর্বেই শুরু হয়েছে তার হৃদয়-যুদ্ধ — '' যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু কাহাকে ? কে সে ?''[১২]

উপন্যাসে দেখা যায় অচলা দুই বন্ধুর মধ্যে মহিম-কেই স্বামী হিসেবে নির্বাচিত করে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ব্রাহ্ম পরিবারের শিক্ষিতা অচলা স্বাধীন-নির্বাচনের মাধ্যমে মহিমকে বেছে নিলেও সুরেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ তাকে দাম্পত্য-জীবনে স্থিতি দেয়নি। স্থিতি হয়তো তার কাম্যও ছিল না; নইলে একের আশ্রয়ে থেকে অন্যের জন্যে মন কেমন-কেমন করতো না। যে ইচ্ছা কোন কোন নারীর জীবনে সত্য, অথচ তা সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে প্রকাশের সুযোগ বা সাহস দেখাতে পারে না, সেই সুযোগ ও সামর্থ তৈরী করে নিয়েছে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলা তার একক প্রয়াসে। অচলার জীবন সমস্যা রূপায়ণে শরৎচন্দ্র যে শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে সে প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—''গৃহদাহ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের শিল্পনৈপুন্য চরমে উপনীত। ভাবালুতা, অতিকথন, ভাষাগত শৈথিল্য ও মুদ্রাদোষ এখানে অনুপস্থিত। প্লটের বাঁধুনি ও সংযম

যুক্ত হয়েছে বক্তব্যের ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে। কয়েকটি দৃশ্য সুনির্বাচিত। প্রায় একই ধরণের দৃশ্য পর্বান্তরে নতুন তাৎপর্য অন্বিত হয়ে দেখা দিয়েছে।''[১৩]

চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসটির ঘটনা-সংঘটন ও চরিত্র-পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বামী মহিমের প্রতি অচলার ভালোবাসা ছিল গভীর ও আন্তরিক। অচলা ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে হলেও তার মনের গভীরে একটা সতীত্বের সংস্কার ছিল। কাহিনির মধ্যে তার এমন সব উক্তি, সংলাপ আছে যাতে স্বামীপ প্রতি তার শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদের শেষে মহিমের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে অচলা বলেছিল —''তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করার জন্য রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছো কি বলে? ...আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান হাতটি। বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণহস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙ্গুল হইতে সোনার আংটিটি খুলিয়া তাহার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারি নে। এইবার যা করবার তুমি করো। বলিয়া গড় হইয়া পায়ের কাছে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।''[১৪]

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে শুভদৃষ্টির সময় মহিমের পদতলে মাথা রেখে মনে মনে বলেছিল —'' প্রভু, আর আমি ভয় করি নে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরেই আমার রাজপ্রসাদ।''[১৫] এই অচলা বিবাহের কিছুদিন পরেই স্বামীর সামনেই স্বামীর বন্ধু সুরেশকে বলেছে—''সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও— যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর-করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।''[১৬]

অচলা-মহিমের অসুখী দাম্পত্যের মূলে যে অচলা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ক্রিয়াশীল ছিল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শুধু অচলা নয়, মহিম, সুরেশ

— এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও দাম্পত্য-সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট প্রধান নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মাতৃরূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অচলা প্রিয়া হিসেবে, নারী হিসেবে তার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা চেয়েছে। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, স্তিতপ্রজ্ঞ, স্বল্পভাষী মহিমের সঙ্গে অচলার আলাপ হয় মহিমের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সংযোগ থাকার সুবাদে। অচলার পিতা কেদার মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ-ভূক্ত হলেও তার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। হিন্দু সমাজের শিক্ষিত মহিমকে তিনি পছন্দ করতেন। মহিমের গ্রামের বাড়িতে কিছু জমি জায়গা অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকায় তার হাতে তিনি কন্যা সম্প্রদান করাকে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করেছিলেন। পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে অচলা ও মহিমের প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয়। তাদের বিবাহ ও একপ্রকার ঠিক হয়ে যায়।

মহিমের বন্ধু সুরেশ। সুরেশ মহিমের একেবারে বিপরীত প্রকৃতির। অত্যন্ত আবেগ প্রবণতা ও প্রবৃত্তির অসংযম তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে নাস্তিক ও ঘোরতর ব্রাহ্ম বিদ্বেষী। মহিমের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সে দু'দুবার তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তার প্রিয় বন্ধু ব্রাহ্ম মেয়ের মোহে ধর্ম বিসর্জন দিতে চলেছে জেনে সে খুব উত্তেজিত হয়ে বন্ধুকে ব্রাহ্ম মেয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কেদার বাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কেদারবাবুর বাড়ীতে অচলাকে দেখার পর সুরেশের আদিম প্রবৃত্তি (Id) দুর্বার হয়ে ওঠে। সে তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। আবেগের উদ্দামতায় সে হিতহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। বৈষয়িক বুদ্ধিসর্বস্ব, সংকীর্ণচিত্ত কেদার বাবুর কাছে সে মহিমের দারিদ্র্যের কথা জানিয়ে তাদের বিবাহ ভঙ্গ করতে প্রয়াসী হয়। এরপর দেখা যায়, কেদারবাবু সুরেশের অগাধ ঐশ্বর্যের কথা জানতে পেরে তার হাতেই মেয়েকে সম্প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগী হন। সুরেশ অচলাকে পাবার জন্য অর্থলিপ্সু কেদারবাবুকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। অচলা ঋণগ্রস্ত পিতার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে মহিমের পরিবর্তে সুরেশকে স্বামী হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। সুরেশ অচলার মেলা মেশার পর্বে অবশ্য বেশ কিছুদিন অচলার সঙ্গে মহিমের সাক্ষাৎ ঘটে নি। মহিম

তার আত্মপরায়ণ মানসিকতার জন্য অচলাকে কোন খবর না দিয়েই গ্রামের বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। মহিমের আবেগহীন নিরুত্তাপ ব্যবহার ও ঔদাসীন্যে অচলার মনের গভীরে তার প্রতি এক ধরনের ক্ষোভ ছিল। মহিমের আত্মসংবৃত স্বভাবের তুলনায় সুরেশের দ্বিধাসংকোচহীন উদ্দাম আবেগ তার নির্জ্ঞান মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করায় তার মন সুরেশের গলায় বরমাল্য দিতে চায়। সে বুঝতে পারে নি যে, ঐ মোহ দুর্বলতা কত ক্ষণস্থায়ী। তাই দেশের বাড়ি থেকে মহিম তার সামনে এসে দাঁড়ালে তার মনে সুরেশের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা জাগে। অচলাকে লাভের জন্য সুরেশের সক্রিয়তাকে তার নিষ্ঠুর উৎপীড়ন বলে মনে হয়।

মহিম ও অচলার পারস্পরিক আকর্ষণের মূলে ছিল কৃষ্টিগত সাম্য। তাই সে মহিমকে অনুরোধ করেছিল তার রাক্ষস বন্ধুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। মহিমের উপস্থিতির পর মহিমের প্রতি অচলার আবেগ ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে সুরেশের নির্জ্ঞান ইচ্ছা বেআব্রু ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সে আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিতে ক্ষোভে, দুঃখে উন্মত্ত হয়ে কেদারবাবু ও অচলাকে ভীষণভাবে অপমান করে উধাও হয়ে যায়। এরপর কেদারবাবু মহিমের সঙ্গেই অচলার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। বিবাহের পর কলকাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ ছেড়ে অচলা মহিমের সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়িতে যায়। গ্রামের মাটির বাড়ি, আত্মীয় স্বজনহীন নিরানন্দময় পরিবেশ, তার সম্পর্কে গ্রাম্য-সমাজের মানুষের বিরূপ মন্তব্য তার মনকে নৈরাশ্য ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সময়ে তাদের সংসারে মহিমের দূর সম্পর্কের এক বোন মৃণাল তার স্বামী সহ এসে উপস্থিত হয়। মৃণালের প্রাণোচ্ছল ব্যবহারে নিরানন্দময় পরিবেশে বৈচিত্র্য আসলেও তার গ্রাম্য পরিহাস রসিকতা অচলার মার্জিত রুচিতে আঘাত করে। তাছাড়া, মৃণালের সঙ্গে একসময় মহিমের বিবাহের সম্ভবনা তৈরি হয়েছিল জেনে এক ধরণের ঈর্ষাবোধ তার মনে জেগে ওঠে। এরপর অচলার হাতের রান্না মৃণাল খেতে না চাইলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহিমের নিরুত্তাপ আচরণে অচলা ক্ষোভে দুঃখে অস্থির হয়ে ওঠে। 'চোখের বালি' (১৯০৩খ্রি.), 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬ খ্রি.) প্রভৃতি উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টির পূর্বেকার সুখী-দাম্পত্য জীবনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু

'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম-অচলার দাম্পত্য জীবনের পরিচয় না থাকলেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নির্ভরতার পরিচয় যথেষ্ট আছে।

মৃণালকে কেন্দ্র করে মহিমের প্রতি অচলার অভিমান ও ক্ষোভ যখন চরম সীমা স্পর্শ করে ঠিক সেই সময়ে উত্তপ্ত দাম্পত্যের মাঝে অশুভ গ্রহের মতো সুরেশের আবির্ভাব ঘটে। সুরেশ আবির্ভূত হলে প্রথম দিকে দেখা যায়, অচলার প্রবৃত্তি বা অদস্ (Id) সংযতই ছিল, মহিমের প্রতি তার নির্ভরতাও যে কিছুমাত্র কমে নি,তার পরিচয় রয়েছে অচলাকে আবেগ প্রবণ সুরেশের কাছে রেখে সন্ধ্যাবেলায় মহিম জমিদারের ছেলেকে পড়াতে যেতে চাইলে অচলার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে —" এই সন্ধ্যায় তাহারই সহিত তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সে মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া কহিল, বাঃ, সে কি হয়? অতিথিকে একেলা ফেলে — মহিম, তাতে অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি হবে না। তা ছাড়া তুমি ত করলে — অচলা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু আমিও থাকতে পারব না।"[১৭]

এরপর কাহিনী অন্য দিকে বাঁক পরিবর্তন করে। আবেগহীন, আত্মকেন্দ্রিক মহিমের নিস্পৃহতার বিপরীতে সুরেশের আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয়ে অচলার চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তার বাবার অসুস্থতার বিষয়ে সুরেশ-মহিমের কিছু কথোপকথন সে আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিল। মহিম সে বিষয়ে তাকে কিছু না জানালে তার ক্ষোভ তীব্রতর হয়ে ওঠে। স্বামীর উপস্থিতিতেই সে সুরেশের কাছে স্বামীগৃহ ছেড়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। অচলা-মহিমের দাম্পত্যের তীব্র সংকটমুহূর্তে তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে—অন্ধকার রাত্রে তাদের গৃহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অচলার শাড়ী ও গয়নার বাক্স উদ্ধার করতে গিয়ে মহিম গুরুতর আহত হয়। অচলাকে মহিম সুরেশের সঙ্গে কেদারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পর নিজে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ মহিমকে সুরেশ তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে। অসুস্থ মহিমের সেবা করার জন্য মৃণাল আসে সুরেশের বাড়িতে। এর-পর অচলা সেখানে মৃণালের কাছ থেকে স্বামীর সেবা শুশ্রূষার ভার নেয়। মহিমের এই অসুস্থতার সময়েই

আবার মহিম ও সুরেশকে কেন্দ্র করে অচলার চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। যে বাসনাকে সে তার বিবেক বুদ্ধির দ্বারা অবদমিত করেছিল সেই বাসনাই আকস্মিক ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে অসুস্থ মহিমের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জব্বলপুরে চেঞ্জে যাবার দিন। সুরেশের শুষ্ক মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন অচলা ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে, তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। চোখের জল মুছে হঠাৎ সুরেশকে বলে —"তোমার কখ্‌খনো শরীর ভাল নেই সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।"[১৮]

সুরেশকে তাদের সঙ্গে চেঞ্জে যাবার আমন্ত্রণ-ই অচলার দাম্পত্যে ট্র্যাজিক পরিণতির প্রতীক। সুরেশ তাদের সঙ্গে না গেলে হয়ত তারা নতুন করে সুখী-দাম্পত্যের পত্তন করতে পারত। তার ইঙ্গিতে রয়েছে উপন্যাসের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে অচলার প্রতি মহিমের নির্ভরশীলতা ও তার প্রতিক্রিয়ায় অচলার হৃদয়াবৃত্তির উদ্বোধনের মধ্যে— "মহিম কহিল, তোমরা সকলে আমাকে যতটা সুস্থ সবল ভাবছ, ততটা এখনো আমি হইনি। কোনদিন হব কিনা, তার আমি আশা করিনে।

অচলা বলিল, সেই জন্যই ত ডাক্তার তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা করেছেন। একবার ঘুরে এলেই সমস্ত সেরে যাবে।

মহিম ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থায় আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর করে স্বর্গ যেতেও ভরসা পায় না। অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্বল, বড় অসুস্থ। তুমি কাছে না থাকলে হয়ত আমি বেশী দিন বাঁচবো না। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সজল হইয়া উঠিল।

যে মুখ ফুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের দুঃখ অভাব ব্যক্ত করে না, তাহারই মুখের এই আকুল ভিক্ষা ঠিক যেন শূলের মত আঘাত করিয়া অচলার হৃদয়ে যত স্নেহ, যত করুণা, যত মাধুর্য এতদিন রুদ্ধ হইয়া ছিল, সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু-একটা করিয়া বসে এই ভয়ে চক্ষের জল চাপিতে চাপিতে একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।"[১৯]

সুরেশের চেঞ্জে যাবার বিষয়ে মহিম সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে প্রকান্ড একটা ব্যাগ হাতে করে সুরেশ উপস্থিত হলে অচলার পিতা কেদারবাবু শুধু বিস্মিতই হন নি, প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কেদারবাবু —"চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সুরেশ? তুমি কোথায় চলেছ?

জবাবটা সুরেশ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, নাঃ — তোমার উপদেশ, নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না দেখলুম। আজ সকালবেলা তুমি অমন করে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে হয়ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত খারাপ হয়ে গেছে! চল, তোমাদের অতিথি হয়েই দিন-কতক দেখি, সারতে পারি কি না ! বাস্তবিক বলচি ম —

বেশ ত, বেশ ত সুরেশ। তা ছাড়া, নূতন জায়গায় আমাদেরও ঢের সাহায্য হবে; বলিয়া মহিম পলকের জন্য একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্তের নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন? যাহার স্বাস্থ্য লইয়া মনে মনে এত উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছে, আজ সকালবেলা পর্যন্ত উভয়ে যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘুণাগ্রে জানিতে দাও নাই কেন? এই লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল, অচলা!"[২০]

— এই ঘটনা শান্ত, স্বপ্নভাষী অসুস্থ মহিমের হৃদয়ে তীব্র বেদনার সঞ্চার করে। অচলার প্রতি তার বিশ্বাসের মর্মমূলে তীব্র-আঘাত হেনে তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে, মুখে যতই 'বেশত, বেশত সুরেশ' বলুক না কেন। এরপর দেখা যায়, যাত্রা পথে সুরেশ দুর্যোগময় রাত্রির অন্ধকারে অচলাকে ভুল বুঝিয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এলাহাবাদে নামার পরিবর্তে মোগলসরাইয়ে নেমে সে অচলাকে নিয়ে অন্য ট্রেনে উঠে পড়ে। অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় সে রুগ্ন ও অসহায় বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অচলা বুঝতে পারে, সে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তবুও সে মহিমের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ও সতীত্বের সংস্কারের জন্য সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় নি।

ডিহরীতে এক পান্থশালায় সুরেশ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ঘটনাধারা অন্যখাতে বইতে শুরু করে। তারা আশ্রয় পায় রামবাবুর বাড়িতে। পরিচিত হয় স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয়ে। রামবাবুর বাড়িতে অবস্থানকালে সুরেশ সম্পর্কে অচলার মনের অনুভবের বিবরণে তার মর্মযন্ত্রণার দিকটিই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে — "এই জনহীন পুরীর মধ্যে কেবলমাত্র সুরেশকে লইয়া জীবনযাপন করিতে হইবে এবং সেই দুর্দিন প্রতি মুহূর্তে আসন্ন হইয়া আসিতেছে। বাধা নাই, ব্যবধান নাই, লজ্জা নাই — আজ নয় কাল বলিয়া একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিবার পর্যন্ত সুযোগ মিলিবে না।"[২১]

সুরেশের অসুস্থতার পর থেকে অচলার একটু একটু করে মানস-পরিবর্তন ঘটে। সে ভাবে মহিমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর সুরেশ তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। সুরেশ ডিহরীতে বাড়ি কিনতে চাইলে তাই অচলা সম্মতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য তার সামনে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। অসুস্থ মহিমকে ত্যাগ করে আসার পর এক ধরণের অপরাধবোধ তার মনে জাগ্রত হয়। এই অপরাধবোধ ও লোকলজ্জার ভয় তাকে তাড়না করায় সে স্বামীর কাছে বা পিতৃগৃহে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারে না।

অচলা তাই সুরেশের নতুন ক্রীত বাড়িতে গিয়ে ওঠে। এই বাড়িতেই এক ঝড়-জলের রাতে রামবাবুর অনুরোধে অচলা সুরেশের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, প্রতারণার দ্বারাই অচলা বৃদ্ধ রামবাবুর স্নেহ-ভালবাসা লাভ করেছিল, তা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়েই সে সুরেশের ঘরে গিয়ে রাত্রিযাপন করে। সুরেশের প্রবৃত্তি দুর্বার। সংযম শব্দটি তার অভিধানে নেই। সে তার অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চেয়েছে অচলাকে কাছে পেয়ে। তাই সুরেশের শয্যায় অচলাকে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে।

সুরেশের শয্যায় সতীত্ব বিসর্জন দেওয়ার পর সীমাহীন গ্লানিবোধে অচলার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়। সতীত্ব বা স্বামী-সংস্কার অচলার হৃদয়ের গভীরে নিহিত ছিল। তাই

সাময়িক বিভ্রান্তি বা উত্তেজনার বশে স্বামী সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে সে যত গুরুতর অপরাধ করুক না কেন, কখনোই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিসর্জন দিতে চায় নি। তাই তার অপরাধ বোধ মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। সুরেশের শয্যায় রাত কাটানোর পরদিন প্রভাতে অচলার চোখে-মুখে রামবাবু অচলার দুঃখ-যন্ত্রনার প্রতিফলণ দেখতে পেয়েছে — ''তাহার মুখ মড়ার মত সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরনার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।''[২২]

এরপর অচলার কাছে জীবন অর্থহীন বলে মনে হয়। তার নিস্পন্দ অর্থহীন জীবন সুরেশের কাছে বোঝা বলে মনে হয়। আবেগপ্রবণ সুরেশ তাই অচলার সাহচর্য পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার বিষয়ে প্রায় মনঃস্থির করে ফেলে। এই সময় হঠাৎ-ই রামবাবুর বাড়িতে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে মহিমের। মহিমকে দেখে অচলা মূর্চ্ছিত হয়। অচলার মূর্চ্ছা সুরেশকে তার সিদ্ধান্তের বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় করেছে। সুরেশের পরিকল্পনা আন্দাজ করেই অচলা তাকে প্রশ্ন করেছে —''তুমি কি আমাকে ফেলে চলে যাবে?'' সুরেশ এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর না দিলে অচলা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করে ''...আর কি তুমি আমাকে ভালবাস না?'' উত্তরে সুরেশ বলেছে — ''... এ প্রশ্নের জবাব তেমন নিঃশংসয়ে দিতে পারি নে অচলা, মনে হয় সে যাই হোক, একথা সত্য যে, এই ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াবার আর আমার শক্তি নেই।''[২৩] একাকীত্ব, মহাশূন্যতা অচলাকে গ্রাস করে। তার জীবনবৃত্তে মহিম অনুপস্থিত — তাকে সে ছেড়ে এসেছে; সুরেশ নেই সে তাকে ছেড়ে গেছে। সুরেশের মৃত্যুর পর অসহায় অচলার একাকিত্ব তথা শূন্যতার চেহারাটি শরৎচন্দ্রের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। —'' সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই — যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার রঙ নাই, মূর্তি নাই, গতি নাই, প্রকৃতি নাই— একেবারে নির্বিকার, একেবারে একান্ত শূন্য।''[২৪]

অচলা প্রথমে মহিমকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু মহিমের আবেগহীন নিরুত্তাপ ভালোবাসায় তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নি। তাই মহিমের বন্ধু, মহিমের ঠিক বিপরীত স্বভাবের সুরেশের দুর্বার আবেগ ও প্রাণোচ্ছলতা তাকে তীব্র ভাবে আকর্ষণ করে। তার অবচেতন মনে সুরেশের প্রতিও ভালবাসা জাগ্রত হয়। কিন্তু তার এই ভালোবাসা সমাজ স্বীকৃত নয় বলে মনের সচেতন স্তরে তাকে তুলে আনতে পারে নি। সুরেশের সঙ্গে ডিহরীবাস কালে তাই সে স্বামী মহিমকে ছেড়ে আসার জন্য তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

সুরেশের মৃত্যুর পর স্বামী মহিমের হাত ধরে অচলাকে বলতে শোনা যায় —"আমি আর দুর্বল নয়, তোমার হাত ধরে যতদূর বল যেতে পারব।"[২৫]

অচলার এই কথার মধ্যে মহিমের সঙ্গে নতুন করে জীবন শুরুর একটা প্রত্যাশা হয়তো ছিল, কিন্তু তার সেই প্রত্যাশায় জীবনের স্পন্দন ধরা পড়ে না তার অন্তরের পাপবোধের চেতনা সক্রিয় থাকায় সে মহিমকে বলে—"তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই, কেউ ত আমার সঙ্গে কথা কবে না!"[২৬]

অচলাকে ডিহরীতে একলা ফেলে মহিম চলে যেতে উদ্যোগী হলে অচলা তার কাছে একটা আশ্রম বা আশ্রয়ের সন্ধান জানতে চেয়েছিল —" শুনেচি বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয় আমি জানি নে, কিন্তু এদেশে কি তেমন কিছু, — বলিতে বলিতে তাহার বড় বড় চোখ দুটি জলে টলমল করিতে লাগিল।"[২৭]

মহিম অচলাকে কোন আশ্রম বা আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারে নি। তবে অচলা মৃণালের কাছে হয়তো আশ্রয়ের সন্ধান পাবে, কিন্তু সে আশ্রয়-ই, সেখানে জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হবে না। ডিহরীতে ঝড়-জলের রাতে সুরেশের সঙ্গে রাত কাটানোর পরে অচলার পরিণতির অনিবার্যতায় আর কোনো সংশয় থাকে না — ঔপন্যাসিক তাকে প্রত্যাবর্তনহীনতার জগতে পৌঁছে দেন।

অচলা মহিমকে স্বামীত্বের আসনে বসিয়ে তাকে নিয়েই সুখী দাম্পত্যের নীড় গড়ে তুলতে চেয়েছিল— শুভদৃষ্টির সময় তার সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছিল। তবে কেন মহিম ও অচলার দাম্পত্যের নীড়ে ভিতর ও বাহির-উভয় দিক থেকেই জ্বলে পুড়ে যায়। উপন্যাসে দেখা যায় মহিম ও সুরেশের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণকে কেন্দ্র করেই অচলার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বই মূলত দাম্পত্য-সম্পর্ককে 'ভিতরও বাহির'— উভয় দিক থেকেই জ্বলে উঠতে সাহায্য করেছে। উপন্যাসে শেষে মহিমের অনুভব ব্যক্ত করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন—"এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবনের উপর দিয়া যাহা বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন প্রলয়ের মত অসীম, তেমনি উপমাবিহীন।"[২৮]

'গৃহদাহ' উপন্যাস ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনি পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্প ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সাদৃশ্য এবং পরোক্ষ প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপের সঙ্গে 'গৃহদাহ'-এর অচলা, মহিম ও সুরেশের ব্যাপক সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। অবশ্য 'ঘরে-বাইরে'-র বিমলা বা 'নষ্টনীড়'-এর চারুর জীবন-সমস্যার সঙ্গে অচলার জীবন-সংকটের পার্থক্য প্রচুর। ভূপতির স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের বিষয়ে উদাসীন ছিল। নিজের কাজের বিষয়ে অধিক আগ্রহের জন্য সে স্ত্রীকে সময় দিতে পারে নি। তার ঔদাসীন্যের ছিদ্র পথ ধরে দেবর অমল প্রবেশ করেছে চারুর জীবনে। তার প্রাণবন্ত সঙ্গদানে চারুর হৃদয়ে প্রেমতৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। অমলকে আশ্রয় করেই তার শূন্য হৃদয় পূর্ণতার পথ খুঁজে পেতে চায়। অমলের প্রতি আকর্ষণই ভূপতি-চারুর দাম্পত্যের নীড়-কে নষ্ট নীড়ে পরিণত করে। চারু নিজের অজান্তেই অমলকে ভালোবেসেছিল, অমলকেই মনে মনে তার হৃদয় সমর্পন করেছিল। কিন্তু অচলা স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা মনের গভীরে পোষণ করেও সুরেশের দিকে এগিয়ে গেছে। সুরেশের প্রতি তার মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হলেও তার প্রতি তার মোহ-দুর্বলতাকে হৃদয়ের গভীরে প্রদেশ থেকে সমূলে উপরে ফেলতে পারে নি।

রাজপুরে মহিমের গৃহদাহের ঘটনার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অচলার জীবনের অদস বা আদিম প্রবৃত্তি আত্মসুখপরায়ণতা নীতির দ্বারা তাড়িত ফলে তার মধ্যে বহুবল্লভতার কামনা লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য শক্তি লক্ষ্য করা যায়। এক প্রেমপাত্র পরিবর্তন করে অন্যত্র সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খোঁজে। শরৎচন্দ্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অচলার বহুগামী মানসিকতার দিকটি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কলকাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্থ অচলা বিবাহ পূর্ব জীবনে দাম্পত্য-প্রেমের অমরাবতী রচনার স্বপ্ন দেখেছিল। পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেই সাধারণত ব্যক্তির চরিত্র এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে। পরিবেশ বলতে পরিবার ও পরিবারবৃত্তের অন্যান্য নর-নারী এবং অন্যান্য উপাদান যা ব্যক্তি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকেই বোঝাতে চেয়েছি। এক্ষেত্রে অচলার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা তাই আমাদের অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কেননা, অচলা ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা হওয়ায় স্বাধীন-ভাবে জীবন সঙ্গী নির্বাচন করার অধিকার সে অর্জন করেছিল। মহিমকে সে নিজেই জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করে তাদের রাজপুরের বাড়িতে গিয়েছিল। রাজপুরে বসবাস কালেই গ্রাম্য ও শহুরে পরিবেশের বৈপরীত্য সে প্রথম অনুভব করে। শুধু তাই নয় মৃণালের স্থূল রঙ্গ রসিকতা তার মনকে আহত করে। মৃণালের সম্পর্কে তার মনে ঈর্ষাবোধ জাগ্রত হয়। মহিমের আত্মমগ্ন মানসিকতাও আবেগহীন নিরুত্তাপ ব্যবহার ও শহুরে পরিবেশে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠা অচলার মনে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে।

রাজপুরের পরিপার্শ্বিকতা যখন অচলার মনকে বিষন্নতায় ভরিয়ে দিয়েছে তখনও মহিমকে বন্ধুর মতো অচলার পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। মৃণাল-সম্পর্কে বিশেষত তার লেখা চিঠিকে কেন্দ্র করে অচলার মনের কোনে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার জন্য মহিম কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নি।

মহিমের প্রতি মৃণালের মনের গোপন কক্ষে যে একধরণের দুর্বলতা ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মৃণাল ও মহিম বাল্যকালে একই সঙ্গে বেড়ে ওঠায় তাদের পরস্পরের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিল। মহিমের সঙ্গে মৃণালের বিবাহের

কথাও উঠেছিল। কিন্তু বংশাভিজাত্যের কারণে তাদের বিবাহে বাধ সেধেছিল মহিমের বাবা। মৃণালের পিতা-মাতার মৃত্যু হলে মহিম তাদের আশ্রিতা মৃণালের বিবাহ দেয় পলাশী গ্রামের এক বৃদ্ধের সঙ্গে। হিন্দু নারীর স্বামী সংস্কারকে মেনে নিয়ে মৃণাল ভবানী ঘোষালকে গুরুর আসনে বসালেও মহিমের প্রতি তার প্রেম-ভালবাসাকে মন থেকে উৎপাটিত করতে পারে নি। তার সেই অবদমিত প্রেম ঠাট্টা-তামাশার ছদ্মরূপ ধরেই অচলার সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মহিম সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের মানুষ হয়েও এ বিষয়ে এক প্রকার নির্বিকার থেকেছে, বেড়েছে অচলার ক্ষোভ —— বিবাহিত দম্পতির জীবনে সমস্যা জট পাকাতে শুরু করেছে।

রুশ মনোবিজ্ঞানী আইভান পাওলভ (Ivan P. Pavlov) মানব মনের জটিলতার বিশ্লেষণে পরিবেশের প্রভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে দেখা যায়, অচলার মনে জটিলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। কলকাতার পরিবেশ থেকে অচলা মহিমকে ভালোবেসে স্বপ্নের নীড় রচনা করতে চেয়েছিল। আত্মীয়হীন গ্রাম্য পরিবেশে এসে তার মোহভঙ্গ ঘটেছিল এবং সাময়িকভাবে স্বামীর প্রতি মনে বিরূপতা জেগেছিল।

অচলার মন যখন মহিমের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ তখন রাজপুরে সুরেশের আবির্ভাব ঘটে। সুরেশ প্রবৃত্তি তাড়িত। অচলার প্রতি তার মোহ ইদ (Id) বা অদসেরই অভিব্যক্তি। তার (Super ego) বা অধিশাস্তা খুবই দুর্বল। বাল্যকালে মা বাবাকে হারিয়ে সে পিসিমার স্নেহ-ভালোবাসায় বেড়ে উঠেছে। পিসিমার প্রশ্রয় ও অর্থ প্রাচুর্যের জন্য সুরেশের প্রবৃত্তির প্রাবল্য দিন দিন বেড়ে উঠেছে। পরম বন্ধু মহিমকে ব্রাহ্মকন্যা অচলার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাই সে নিজেই অচলার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে। তার প্রবৃত্তি এতই দুর্বার হয়ে উঠেছে যে, সে বন্ধুর অবর্তমানে বন্ধুর ভাবী স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করতেও দ্বিধা করে নি। আসলে তার এই আত্মসুখ পরায়ণতা বা শিশুসুলভ স্বার্থপরতার মূলে যে পিসিমার স্নেহ প্রশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেকথা বলা-ই যায়। সুরেশের চরিত্রের সঙ্গে 'চোখের বালি' উপন্যাসের মহেন্দ্র ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপের প্রবৃত্তিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মহেন্দ্র মায়ের

স্নেহ ভালবাসার প্রশয়ে বেড়ে ওঠায় আত্মকেন্দ্রিকতা ও শিশুসুলভ স্বার্থপরতাবোধ তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা গেছে। আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া অন্যের কথা কিছুমাত্র ভাবে নি। আর শিশু সুলভ স্বার্থপরতার জন্য আশা ও বিনোদিনী দুজনকেই নিজের অধিকারে রাখতে চেয়েছে। প্রবৃত্তি বা অদসের প্রভাবে মহেন্দ্রের মধ্যে দেখা দিয়েছে বহুবল্লভতার কামনা। সুরেশ ও মহেন্দ্রের বাস্তব বুদ্ধি বা ইগো দুর্বল। সন্দীপের প্রবৃত্তি বা অদসের তুলনায় ইগো বা অহং শক্তিশালী। তাই প্রবৃত্তিকে ইগো (ego) দ্বারা পরিচালিত করেছে। বাস্তব বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে স্থূল প্রবৃত্তিকে মহত্তের আবরণে মুড়ে রেখেছে। মহেন্দ্র বা সুরেশ তা পারে নি।

সুরেশ প্রবৃত্তির তাড়িত হয়ে যে সব কাজ করেছে তার জন্য নিজেও পীড়িত হয়েছে, অপরকেও পীড়িত করেছে। সে নাস্তিক। কৃতকর্মের জন্য পাপ-পুণ্য বোধে সে বিশ্বাস করে না। তবে হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মদের কাছে হেরে যাক —তার মনে এতে সায় দেয় নি বলেই সে মহিমের উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তার রাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে মহিমকে বলেছে—"তুমি জান আমাদের সমাজের প্রতি আমার কত মমতা। সে সমাজকে যারা দেশের কাছে, বিদেশের কাছে, সকলের কাছে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের ভাল তাদের থাক, আমার তারা শত্রু।"[২৯] কিন্তু ব্রাহ্ম অচলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সে পরাজিত হয়। অচলার দৃষ্টিতে 'স্থির-বুদ্ধির আভা' সুরেশের মনকে টলিয়ে দেয়; তার মনে অচলাকে অধিকার করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

ঔপন্যাসিক সুরেশ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ভাষায় ধরিয়ে দিয়েছেন, জটিল মনস্তত্ত্বের মোড়কে তাকে মুড়ে ফেলা হয় নি। আবেগ, অভিমান, অসংযম তার চরিত্রে উচ্চ মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। অহংবোধও তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। তাই সে জীবনে চলার পথে হার স্বীকার করতে চায় নি। অচলাকে মহিমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিজের অধিকারে আনবার জন্য সুরেশ যা যা করেছে, তাতে তার ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। অচলার সঙ্গে সামান্য আলাপ পরিচয়ের পর তার শরীরে সংস্পর্শে এসে তীব্র আবেগে অচলার দুই হাত নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে

''সুরেশ সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার ডান হাত ধরিয়া টান দিল। সেই উন্মত্ত ও আকস্মিক আকর্ষণ সহ্য করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। সে উপুর হইয়া সুরেশের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল।''[৩০] এরপর ''অচলার দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, অচলা একটি বার ভূমিকম্পের এই প্রচন্ড হৃদস্পন্দন নিজের দুটি হাতে অনুভব করে দেখ — কী ভীষণ তান্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।''[৩১] কেদার বাবুর চার হাজার টাকার ঋণ মিটিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

কেদার বাবুর ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে সুরেশ ভেবেছিল অন্তত কৃতজ্ঞতার কারণে অচলা তাকে ভালোবাসবে। এরপর অচলার আচরণ দেখে তার মনে হয়েছিল, অচলার হৃদয়কে জয় করে নিয়েছে। উপন্যাসে এর সমর্থন আছে। সুরেশ অচলাকে বলে—''তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত টলতে থাকে।''[৩২] প্রতিক্রিয়ায় অচলা ''মুহূর্তের করুণায় সে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার (সুরেশের) অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।''[৩৩] এরপর ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর মহিম এসে উপস্থিত হলে অচলা সুরেশের প্রতি দৌর্বল্য কাটিয়ে উঠে মহিমকেই জীবনসঙ্গী রূপে নির্বাচন করে। ক্ষুব্ধ সুরেশ কেদারবাবু ও অচলাকে অপমান করে চলে যায় — এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সুরেশের বেপাত্তা হয়ে যাবার কিছুদিন পর একদিন সংবাদপত্রে তার খবর প্রকাশিত হয় — ফয়জাবাদে প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রজ্জ্বলিত গৃহ থেকে রোগশয্যায় শায়িত স্ত্রীলোককে সুরেশ উদ্ধার করেছে। এই সক্রিয়তা হল মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় উদ্‌গতি বা (Sublimation)। অচলাকে না পেয়ে সে তার অবরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে কল্যাণমূলক কর্ম অর্থাৎ সমাজ সেবার দিকে চালিত করেছে। পরের বিপদে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সুরেশের ছেলে

বেলাকার স্বভাবের মধ্যেই ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অচলার মোহ দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে। জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করে রোগীকে উদ্ধার করতে গিয়ে সুরেশের পিঠ পুড়ে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। কেদার বাবুর বাড়িতে সুরেশের অসতর্ক অবস্থায় ক্ষতের ব্যান্ডেজ খুলে যায়। তখন ''তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া আসিয়া ব্যান্ডেজ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ভয় কি, আমি ঠিক করে বেঁধে দিচ্ছি। বলিয়া তাহাকে ও-ধারের সোফার উপর বসাইয়া দিয়া, সযত্নে সাবধানে ব্যান্ডেজটা যথাস্থানে বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল।''[৩৪]

অচলার বিবাহের পরে সুরেশ রাজপুর মহিমের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল প্রবৃত্তির দুর্বার টানে। সে অচলার প্রতি তার প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে অবদমনের জন্য সমাজ-সেবামূলক কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে অসামাজিক লক্ষ্য হতে সরাতে চেয়েছিল কিন্তু তার পরাভবের যন্ত্রণাকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। তাছাড়া অচলার নারী সুলভ মমত্ববোধ বা সাময়িক দুর্বলতাকে সে তার প্রতি অচলার প্রগাঢ় অনুরাগ বলে ভুল করে।

অনাহূত সুরেশ মহিমের বাড়িতে গিয়েছিল বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর নতুন সংসার দেখার জন্য নয়। তার তীব্র কামনা, অলীক আশায় মায়াবী আকর্ষণেই সে সেখানে যায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে সুরেশ মহিম অচলার দাম্পত্য-সম্পর্কে দ্বন্দ্বময়তার দিকটি দেখতে পায়। ঐ সময় অচলার মন মহিমের প্রতি সাময়িকভাবে বিরূপ ছিল তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা দূরত্ব ও সৃষ্টি হয়েছিল। সুরেশ অচলার আচার আচরণ দেখে অনুমান করল অচলার মনের কোনে তার আসনটি পাতা আছে। এসব কিছু অনুমানের পিছনে সত্য যে কিছু মাত্র ছিল না, এমন নয়। কিন্তু তার সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হওয়ায় তার মন আবার অচলা অভীমুখীন হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়েই সুরেশের উদ্দেশ্যে অচলা বলেছে '' তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নাই। সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও — যাকে ভালবাসি নে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না।''[৩৫]

অচলার মনের এই রন্ধ্রপথেই অশুভ গ্রহের মতো সুরেশের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিপর্যস্ত হয়েছে তাদের দাম্পত্য জীবন—'গৃহ' ভিতর বাহির উভয় দিক থেকেই দগ্ধ হয়েছে।

মহিম-অচলার দাম্পত্যের ট্রাজিক পরিণতির জন্য সুরেশের অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি কিছুটা দায়ী। কিন্তু সর্বাংশে সুরেশকে দায়ী করা যায় না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "গৃহদাহের জন্য সুরেশের দায়িত্ব সত্যসত্যই আছে কিনা তাহা লেখক স্পষ্টতঃ নির্দেশ করেন নাই। একবার মাত্র অচলা সুরেশকে এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু তখন সে সর্বনাশের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, সুতরাং ইহাই যে তাহার আন্তরিক বিশ্বাস তাহা ঠিক বলা যায় না।"[৩৬]

রাজপুরের বাড়ীতে আগুন লাগানোর জন্য অচলার অভিযোগের ভিত্তিতে সুরেশকে নিশ্চিত ভাবে অপরাধী ভাবা যায় না — এ কথা ঠিক। কিন্তু দাম্পত্যের নীড় নষ্টের জন্য সে তার দায়কে স্বীকার করে নিয়ে মৃত্যুর পূর্বে মহিমকে জানিয়েছে যে, তার ভুল হয়েছিল, অচলা যে মহিমকে খুব ভালোবাসত তা সে বুঝতে পারে নি, এমন কি মহিমও বুঝতে পারে নি।

রাজপুরে গিয়ে নববধূ অচলার মনে বিরূপতা সৃষ্টি হলেও সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার সুযোগ মহিমকে দিয়েছিল। কিন্তু মহিমের বিবেচনাবোধের কারণে তাদের সম্পর্কে স্বাভাবিকতা ফিরে এল না। মহিম যে মৃণাল প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে অচলার উত্তপ্ত হৃদয়ে শীতলতার প্রলেপ দিতে অগ্রসর হয় নি আমরা জানি। তার একান্তই অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্য সে গাম্ভীর্যে অটল থেকেছে। অটল গাম্ভীর্য নির্বাক সহিষ্ণুতা, উচ্ছ্বাসহীন মিতভাষণ তার চরিত্রের গুণ হতে পারে কিন্তু দাম্পত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সহানুভূতি, সহমর্মিতাবোধ আলাপচারিতা প্রভৃতি গুনের বিশেষ প্রয়োজন হয়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই সুখী-দাম্পত্যের নীড় রচিত হয়। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষেত্রেই (বিশেষত গৃহদাহের পর) মহিম অচলাকে সহযোগী ভাবতে পারে নি। এক্ষেত্রে সুরেশ তাদের সম্পর্কের ভঙ্গুরতার কথা ভাবতেই পারে। অচলাও তার বিষয়ে মহিমের আগ্রহহীনতার কথা ভাবতে পারে। মহিম অচলার

সঙ্গে কখনো তার সুখ-দুঃখ শেয়ার করে নি। তাদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা-মেলা আলাপ-আলোচনার পরিচয়ও উপন্যাসে নেই। সুরেশের বাড়িতে অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় অচলাকেই মহিম পরম নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিল।

মহিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হীনতাবোধের ধারণা (Inferionity complex) সৃষ্টি হয়েছিল বাল্য কালেই। তাই তাকে সব সময়ে নিজের মধ্যে এক প্রকার গুটিয়ে থাকতে দেখা যায়। হীনমন্যতাবোধের জন্যই সে কখনোই বন্ধু সুরেশের সঙ্গে বিরোধের সময় যুক্তির মাধ্যমে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তার জীবনে আবেগ উচ্ছ্বসের কোনো সন্ধান নেই। তার হীনমন্যতাজাত অত্যধিক বিনয় সুরেশ এবং অচলাকে পরস্পরের কাছে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। মহিমের নিরুত্তাপ ব্যবহারের জন্য অচলাও মহিমকে ঠিক বুঝতে পারে নি। এর পরিচয় ফুটে উঠেছে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে অচলা ও মহিমের কথোপকথনে —"অচলা অশ্রু-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যতদূর সাধ্য সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া চুপি চুপি বলিল, তুমিও ত ভালবাসো না।

মহিম আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কথা কে বললে? আমি ত কখনো বলিনি।

অচলার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না; কহিল, শুধু কথাই কি সব? শুধু মুখের বলাই সত্যি, আর সব মিথ্যে? রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকেই কেবল সত্যি ধরে নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও? তোমার মতন নিক্তির ওজনে কথা বলতে না পারলেই কি তার মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে? বলিতে বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। মহিম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, তার মানে? অচলা উচ্ছ্বসিত রোদন চাপিয়া বলিল, মনে করো না—তোমার মত সাবধানী লোকেও মিথ্যেকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখতে পারে! তোমারও কত ভুল হতে পারে— দেখ গে চেয়ে, তোমারই টেবিলের ওপর।"[৩৭]

অচলার জীবনে গুরুতর সমস্যা ও তার জীবনের ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—''অচলার সচেতন বুদ্ধি যাহা বুঝাইয়াছে তাহার গুহাতিত আত্মা অজ্ঞাতসারে ঠিক তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি জাগাইয়াছে।''[৩৮]

'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে আনা মাতৃত্ব ও নারীত্বের দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে নি বলেই তার জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। 'গৃহদাহ' উপন্যাসেও দুই বন্ধু-মহিম ও সুরেশের মধ্যে যে কোনো একজনকে অচলা হৃদয় সমর্পণ করতে পারে নি। তাই তাকে ব্যর্থ জীবনের গ্লানি বহন করে চলতে হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় বিবাহিত আনা ভ্রণস্কির (Vronsky-র) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বামীর প্রতি তার বিরূপতা ছিল না। অচলার ভালবাসা ছিল মহিমের প্রতি। প্রবৃত্তির তাড়নায় সুরেশের প্রতিও সে অদৃশ্য একটা আকর্ষণ অনুভব করেছে। তবে ভ্রনস্কির প্রতি আনার দুর্বলতার সঙ্গে সুরেশের প্রতি অচলার দুর্বলতা একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মহিম ও সুরেশ দু'জন পুরুষকেই অচলা হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। সুরেশকে কেন্দ্র করে আবার তার হৃদয়ে সুরেশের প্রতি আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলাও চলেছে। একই সঙ্গে অচলা সুরেশকে ভালোবেসেছে আবার ঘৃণাও করেছে। একই সঙ্গে মনে প্রেম-ঘৃণা, আগ্রহ-ঔদাসীণ্য প্রভৃতি বিপরীত ধর্মী ভাবের সমাবেশকে সমস্তত্ত্বের পরিভাষায় উভাবেগ বা Ambivalence বলে। অচলার চরিত্রে এই ভাবটির প্রকাশ ঘটায় তার চরিত্র জটিলতর হয়ে উঠেছে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ যেমন সত্য, তেমনি বিকর্ষণও সমান সত্য। সুরেশের ঔদার্য, আবেগ কখনও অচলার চোখে জল ঝরিয়েছে, কখনও বা তার আবেগের উদ্দামতায় অচলা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে — মহিমকে অনুরোধ করেছে তার রাক্ষস বন্ধুর (সুরেশের) হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রসঙ্গে শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—''মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিক দিয়া গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় মহিম ও সুরেশের প্রতি অচলার দোলাচল চিত্তবৃত্তি। দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত স্ত্রীর মন সর্বদা অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর দিকেই ফিরিয়া থাকে, ইহা আমরা পুরাণ কাহিনি বা রোমান্সে পাইয়া থাকি। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই যে নিষ্ঠার এতটুকু নড়চড় হয় না,চিত্ত মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ-দোলায় দোলায়িত হয় না, ইহা জোর করিয়া বলা যায়

না। দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আকর্ষণে অচলার মনে এইরূপ একটা দ্বিধা অনিশ্চয়ের ভাব যে জাগিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এক দিকে মহিমের শান্ত, একান্ত ভাবাবেগহীন, প্রস্তর কঠিন আবেদন—— অপর দিকে সুরেশের ব্যগ্র-ব্যকুল, উন্মত্ত আবেগ —— এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝে অচলার হৃদয় দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে।''[৩৯]

অচলার এই দোলাচল চিত্তবৃত্তির মধ্যেই 'গৃহদাহ' উপন্যাসের আধুনিকতা ও অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকের রচনা 'বিরাজ বৌ', 'চন্দ্রনাথ' বড়দিদি প্রভৃতি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নারীর নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য নির্জ্ঞান আকাঙ্ক্ষার অবদমনের দিকটিকেই বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ফ্রয়েডীয় মনো বিকলন পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা প্রেমের নতুন দেহবাদী বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন। ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী, রক্ষণশীল শরৎচন্দ্র উপন্যাসটিতে অচলার অসংযমী প্রেমের অবস্থানকে যে সাহসী সততায় প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁর দুঃসাহসিকতা ও আধুনিক মনস্তত্ত্ব-সচেতনতার পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

উৎস সূত্র

১। উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৩০।

২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৩৭।

৩। বিরাজ বৌ, শরৎ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, পৃ. ৪।

৪। তদেব; পৃ. ৭।

৫। তদেব; পৃ. ৮।

৬। তদেব; পৃ. ৪৩-৪৪।

৭। তদেব; পৃ. ৪৪।

৮। তদেব; পৃ. ৪৪।

৯। তদেব; পৃ. ৫১।

১০। তদেব; পৃ. ৫২।

১১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৯।

১২। গৃহদাহ, শরৎ রচনাবলী, (চতুর্থ খন্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা-০৯, পৃ. ২২৫।

১৩। শরৎচন্দ্রঃ পুনর্বিচার, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১০, পৃ. ৭৪।

১৪। গৃহদাহ, শরৎ রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, পৃ. ২৬০।

১৫। তদেব; পৃ. ২৭৪।

১৬। তদেব; পৃ. ২৯৭।

১৭। তদেব; পৃ. ২৮৭।

১৮। তদেব; পৃ. ২৩৮।

১৯। তদেব; পৃ. ২৩৬।

২০। তদেব; পৃ. ৩২৯।

২১। তদেব; পৃ. ৩৪৯।

২২। তদেব; পৃ. ৩৬৯।

২৩। তদেব; পৃ. ৩৮৩।

২৪। তদেব; পৃ. ৩৯৮।

২৫। তদেব; পৃ. ৩৯৮।

২৬। তদেব; পৃ. ৩৯৮।

২৭। তদেব; পৃ. ৩৯৯।

২৮। তদেব; পৃ. ৩৯৯।

২৯। তদেব; পৃ. ২৩৫।

৩০। তদেব; পৃ. ২৪৮।

৩১। তদেব; পৃ. ২৪৮।

৩২। তদেব; পৃ. ২৫৬।

৩৩। তদেব; পৃ. ২৫৭।

৩৪। তদেব; পৃ. ২৭০।

৩৫। তদেব; পৃ. ২৯৬-৯৭।

৩৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৬।

৩৭। গৃহদাহ, শরৎ রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, পৃ. ৩০০।

৩৮। শরৎচন্দ্র (সমালোচনা সাহিত্য), সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জ এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৭৩, অষ্টাদশ সংস্করণ, ১৪১৪, পৃ. ৫১।

৩৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., অষ্টম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ২৫৭।

উপসংহার

বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের আলোকে দাম্পত্য-সমস্যা রূপায়ণের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হয়ে আমরা বর্তমান সন্দর্ভে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথমদিকের তিন মহারথীর উপন্যাস-কৃতি বিশ্লেষণের মধ্যেই আমাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রেখেছি। প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের আলোকে কীভাবে দাম্পত্য-সমস্যার দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে এবং ফুটে উঠেছে তাই আমাদের প্রধান অণ্বিষ্ট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনঃসমীক্ষণ ও মনোবিশ্লেষণ-সংক্রান্ত ফ্রয়েডের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি সবই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত ('The Interpretaton of Dreams- 1900' এবং 'Psycho-Pathology of Everyday Life- 1904') হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলি (দাম্পত্য-সমস্যা কেন্দ্রিক) প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাই বঙ্কিম উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রতিফলন খুঁজতে গেলে তা কালাতিক্রমণের দোষে অভিযুক্ত হতে পারে। বঙ্কিমের পক্ষে ফ্রয়েডের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না ঐতিহাসিক কারণেই। অনুমান করি, 'চোখের বালি' (১৯০৩) লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও এই তত্ত্বের গভীরে অবগাহন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) বা 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের রচনাকালে এই সমস্যা ছিল না। তাই 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে যে দাম্পত্য সমস্যাকে মনস্তত্ত্বের আলোকে দেখার সম্ভাবনা মাত্র সূচিত হয়েছিল, 'চোখের বলি'-র পথ ধরে তার পূর্ণবিকশিত ও সমুন্নত রূপ দেখা গেল 'যোগাযোগ' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে।

ফ্রয়েডের বিজ্ঞানভিত্তিক মনঃসমীক্ষণ ও মনোবিশ্লেষণের প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বের সাথে পরিচিত না থাকলেও নর-নারীর, বিশেষতঃ দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব, আকাঙ্ক্ষার অবদমন ও তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণজাত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কে যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন, তা 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নিবিড় পাঠ থেকেই বোঝা যায়। যদিও বিধবাবিবাহের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে, এই সমস্যকে কেন্দ্রে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস দুটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের সঙ্কট, অনণ্বয় ও ভাঙনকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন। সমালোচকদের বিচারে অবশ্য 'বিষবৃক্ষ'-এর তুলনায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উন্নততর ও অধিক শিল্পসার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু, আমাদের অন্বেষণ এবং বিশ্লষণের পটভূমিতে বলা যায়, ১৮৭৩- এ প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' দাম্পত্য সমস্যামূলক একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস।

কিন্তু, শুধু কী 'বিষবৃক্ষ' থেকেই প্রকৃত অর্থে দাম্পত্য সমস্যা উপস্থাপনের সূত্রপাত বাংলা উপন্যাসে ? তারও আগে, 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) তে, কী এই জাতীয় সমস্যার সূত্রপাত হয়নি ? যদিও এই উপন্যাসে ইতিহাসের ধূসর পটে রোমান্সের রঙীন প্রলেপ রয়েছে, তবুও

সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাংলার সপ্তগ্রামের এক যুবকের এক বছরের দাম্পত্যজীবনের শীতলতা ও তার মধ্যে ইতিহাস ও অলৌকিকতার অনুপ্রবেশকে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি দিতে বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও।

এরপরেই 'বিষবৃক্ষ'। বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখে এখানে এক ত্রিকোণ প্রেমের আবহ রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি একথা সর্বজনবিদিত, তিনি মনে করেছিলেন যে, বিধবার পুনর্বিবাহ ঘটলে সমাজে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হবে। এই সামাজিক বক্তব্যকে সামনে রেখেই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনি-কাঠামোর পরিকল্পনা। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর সুখী দাম্পত্যের মধ্যে হঠাৎই অসহায় সুন্দরী কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব। ক্রমে নগেন্দ্রনাথের কুন্দ-আসক্তি তীব্র হয়ে উঠল এবং ত্রিকোণ প্রেমের তথা দাম্পত্য দুরত্ব ও জটিলতা গভীরতা অর্জন করল। বিধবাবিবাহের প্রশ্নটিকে দূরে সরিয়ে রাখলেও, এই অবৈধ সম্পর্কের ট্র্যাজিক পরিণতি ও শেষে অনেক মূল্য দিয়ে নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর মধুর পুনর্মিলন ভারতীয় তথা হিন্দু দাম্পত্যের মাধুর্য ও অটুট স্থায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ় আস্থার মনোভাবকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। কুন্দনন্দিনী তাঁদের সুখের সংসারে প্রবেশের পর নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর নিবিড় সম্পর্কের দেওয়ালে যে ফাটল দেখা দেয়-সেই ঘটনা-সূত্র থেকে শুরু করে কাহিনির পরিণতি পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মনোবিশ্লষণে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। (যদিও উদ্দশ্যমূলকতা কখনো কখনো এ উপন্যাসের স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিবন্ধক হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেছেন)। বলা চলে, 'কপালকুন্ডলা' থেকে 'বিষবৃক্ষ'-এ এসে দাম্পত্য সমস্যার মনোবিশ্লেষণে এক ধাপ অগ্রসর হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, অগ্রসর হলো বাংলা উপন্যাস।

'বিষবৃক্ষ'-এর পরে, শিল্পগুণসমৃদ্ধ দাম্পত্য সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাস হলো 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)। বলা যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', পূর্ববর্তী 'বিষবৃক্ষ'-এর তুলনায় শিল্পগুণে উন্নততর উপন্যাস। যদিও, উভয় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় অভিমুখ এবং কাহিনি-কাঠামো প্রায় একই ধরনের। এর আগে রচিত দুটি উপন্যাসে--'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'রজনী'তে (১৮৭৭) দাম্পত্য সমস্যার প্রসঙ্গ উকিঝুঁকি দিলেও তা মনোবিশ্লেষণে ও শিল্পগুণে 'বিষবৃক্ষ'-এর মতো সমৃদ্ধ নয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লেখকের একটি ঘোষিত বক্তব্য আছে, তা হলো বাল্যপ্রণয়ের অভিশপ্ত পরিণতি দেখনো। প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় অচরিতার্থ থেকে গিয়েছিল। তার বিবাহ হয় চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তার দীর্ঘ আট বছরের দাম্পত্যজীবনেও পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্বাদ পায়নি শৈবলিনী। এখান থেকেই তার চরিত্রে জটিলতার সূচনা এবং সেই জটিলতা অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে উপন্যাসের স্বাদ বৃদ্ধি করেছে। তবে, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেয়ে অধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে সমকালীন দেশকালের প্রভাব। তবুও সীমিত পরিসরে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর দাম্পত্য সমস্যা বর্ণনায় মনোবিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।

সবদিক বিচারেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা উপন্যাসের একটি মাইলস্টোন। ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে, কাহিনি বয়নের জটিলতার ক্ষেত্রে, উপন্যাসের আধারে ট্র্যাজিক সংবিদ সঞ্চারের ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি মনস্তত্ত্বের আলোকে দাম্পত্য সমস্যা রূপায়ণের ক্ষেত্রেও এই উপন্যাসটি পরবর্তী লেখকদের কাছে পথ প্রদর্শকের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। এই উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব এক চমৎকার প্রতীকী প্রয়োগ। তাছাড়াও, মনে রাখা প্রয়োজন যে, নগেন্দ্রনাথ (বিষবৃক্ষ) যেভাবে খুব সহজেই কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, যে আসক্তিকে বৈধতা দিতে নিজের জমিদারি ক্ষমতাও প্রয়োগ করেছেন, সেখানে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি তাঁর ক্রমজাগ্রত আসক্তি প্রতিহত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। গোবিন্দলালের আত্মদমনের প্রয়াস উপন্যাস-কাহিনিতে মনোবিশ্লষণের এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। আবার, আভিমানবশত ভ্রমর পিত্রালয়ে চলে যাবার পর গোবিন্দলালের ক্রোধ এবং 'ভ্রমরকে একটু কাঁদাইব' ভেবে তাঁর ক্রমবর্ধমান জেদ তাঁকে ক্রমশ রোহিণীর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই অংশে, লেখকের মতে গোবিন্দলালের দ্রুত অধঃপতনের অংশে গোাবিন্দলালের মনোবিশ্লেষণ আধুনিক ও বিশ্বাসযোগ্য। আবার, কলসী, বারুণী পুষ্করিণীর সঙ্গে, এমনকি একান্ত নিভৃতে রোহিণীর নিজের সঙ্গে কথোপকথনেও রোহিণীর মনোবিশ্লেষণ শৈল্পিক সার্থকতা অর্জন করেছে। রোহিণীর মনস্তত্ত্ব সবচেয়ে ভালো ফুটেছে হরলাল-সন্নিধানে। আর কিশোরী, অপরিণতমনস্কা ভ্রমরের ক্রমশ পরিণতবুদ্ধি নারী হয়ে ওঠার বিবর্তন এই উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সবচেয়ে শিল্পসার্থক দিক ! কাহিনির শেষে সন্ন্যাসীবেশে রিক্ত নিঃস্ব গোবিন্দলালের আবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরে আসার বর্ণনায় যে গাঢ় দীর্ঘশ্বাস উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়, তা নতুন করে দাম্পত্যের মধুর নিবিড় বন্ধনের শাশ্বত প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমাদের বর্তমান অন্বেষণের ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি তাৎপর্যপুর্ণ দিকনির্দেশক উপন্যাস।

মনন ও চেতনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় আধুনিকতার অগ্রপথিক। স্বভাবতই বঙ্কিম-যুগের নীতিবোধের পীড়া ও উদ্দেশ্যমূলকতা তাঁর উপন্যাস-ভাবনাকে প্রভাবিত করেনি। বিশেষ তত্ত্ব বা আদর্শের মোড়কে নয়, তিনি আধুনিক মানুষকে দেখতে চেয়েছিলেন তার ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রতা দিয়ে। এই সমগ্রতা-সন্ধানী দৃষ্টিতেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বিনোদিনীকে, যে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনীর চেয়ে অনেকটাই আলাদা। যদিও বিবর্তনের ধারায় রোহিণীর পথেই বিনোদিনীর আবির্ভাব ! 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের সমকালে বাঙালি পাঠকের মনন ও প্রস্তুতি অনেকটাই বদলে গেছে। তাই উপন্যাসের নতুন অবলম্বন যে 'আঁতের কথা' অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, একথা রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'তেই স্বীকার করে নিলেন। মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্য জীবনেও এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জাগ্রত চৈতন্য বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। অত্যন্ত নিবিড় প্রযত্নে দেখিয়েছেন মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্য জীবনে কোথায় কোন গোপন ছিদ্র ছিল ! যে ছিদ্রপথে বিনোদিনীর অনুপ্রবেশ, মহেন্দ্র ও আশার ভঙ্গুর দাম্পত্য এবং শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রের গৃহত্যাগ 'চোখের বালি' উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যাকে আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে লগ্ন করতে পেরেছে।

দাম্পত্য সমস্যা কেন্দ্রিক মনোবিশ্লেষণ-নির্ভর রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'যোগাযোগ'(১৯২৯) আমাদের আলোচ্য কালপর্বে, আদি যুগের তিন মহারথীর এ-জাতীয় যাবতীয় উপন্যাসের ধারায় 'যোগাযোগ' শ্রেষ্ঠতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও সামগ্রিক বিচারে এ উপন্যাস প্রসঙ্গে অনেকেই 'খণ্ডিত' এবং অনুপযুক্ত ও আরোপিত উপসংহারের অভিযোগ করেছেন। ঘোষাল বংশের তিন প্রজন্মের কাহিনি বলবেন বলে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের প্রাথমিক নামকরণ করেছিলেন 'তিনপুরুষ'। পরবর্তীকালে, যেকোনো কারণেই, হোক এক প্রজন্মের (মধুসূদন ঘোষাল) কাহিনি বলেই যেন ঔপন্যাসিক ছুটি নিতে চেয়েছেন। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এবং পারিবারিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টি মানুষের চরিত্রগঠনে কতখানি সক্রিয় ভূমিকা নেয় তা এই উপন্যাসে পরস্পর বিপরীতধর্মী রুচি ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি স্বামী-স্ত্রীকে দেখলেই বোঝা যায়। মধুসূদন মুৎসুদ্দি-বানিয়ার স্থূল রুচির প্রতিনিধি, দেহকেন্দ্রিক ভোগই যার কাছে প্রেমের পরাকাষ্ঠা ! অন্যদিকে স্নিগ্ধ, সুন্দর, সূক্ষ্ম রুচিবোধ সম্পন্না কুমুদিনী বরাবরই আদর্শ ও মননকে স্থান দিয়েছে দেহের ওপরে। ফলে এদের দুজনের মধ্যে সংঘাত অনিবার্যই ছিল।স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘ্যত ও দুরত্বের চিত্র ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেখা দিয়েছে 'স্ত্রীর পত্র', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি গল্পে। যাই হোক, দাদা বিপ্রদাসের আদর্শে উজ্জীবিত কুমুদিনী আশা করেছিল তার বিদ্রোহিনী সত্তা যথোচিত পারিবারিক ও সামাজিক সমর্থন পাবে, কিন্তু কুমুদিনীর সন্তান-সম্ভাবনা যাবতীয় বিতর্ক বা বিদ্রোহের অবসান ঘটায়। যে কুমুদিনী দাম্পত্য সম্পর্কের অনন্বয়ের সমাধান খুঁজেছিল বিদ্রোহাত্মক গৃহত্যাগের পথে, সেই কুমুদিনীকেই শেষ পর্যন্ত ভাবী সন্তানের পিতৃপরিচয়ের তাগিদে আবার ফিরে আসতে হলো স্বামীগৃহে ! কুমুর এই প্রত্যাবর্তন অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এই জন্য 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পরিণতি যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও দাম্পত্য সমস্যা-কেন্দ্রিক উপন্যাসের ধারায় 'যোগাযোগ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি, হয়তো বা সার্থকতম সৃষ্টি !

'যোগাযোগ' উপন্যাসের আগে রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন চিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিখিলেশ ও বিমলার মধুর দাম্পত্যের মধ্যে শনিগ্রহের মতো ঢুকে পড়েছিল সন্দীপ। সাময়িকভাবে বিমলা সন্দীপের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়, মোহমুক্ত হতেও বেশি সময় লাগেনি ! কিন্তু সন্দীপের প্রবেশের পর এদের দাম্পত্য জীবনে যে অস্থিরতা ও সঙ্কট দেখ দেয়, তা মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। আত্মকথন রীতির বর্ণনাভঙ্গি লেখককে এক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। তবে, দাম্পত্য সমস্যা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের একমাত্র ও একক বিষয় নয়। ঘর ও বাহির তথা সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব এবং সমকালীন স্বদেশী রাজনীতির প্রলেপ এই উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যার বিষয়টিকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলতেই হবে। একই কথা প্রযোজ্য 'মালঞ্চ' উপন্যাস প্রসঙ্গেও। এই উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নেই বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রিয় 'দুই নারী' তত্ত্বের উপস্থাপন এ উপন্যাসেরও শিল্পগুণকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছে বলতে হবে। তবে, 'মালঞ্চ' উপন্যাসে অসুস্থ নীরজার মনস্তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎ-উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার চিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণ আরও আধুনিক স্তরে উত্তীর্ণ হবে এমনটাই ছিল পাঠকদের প্রত্যাশা। কিন্তু এক্ষেত্রে, কিরণময়ী ও কমলের চরিত্র ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, শরৎচন্দ্র কোনো অগ্রসর মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। শরৎচন্দ্র সামাজিক বর্ণভেদ, গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের বাস্তবতা, নারীর সামাজিক অবদমন ইত্যাদি ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই মনোবিশ্লেষণে যথোচিত প্রযত্ন দেখাতে পারেননি। 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাস দুটি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তবুও বলতে হবে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসটির কাহিনি-গ্রন্থন আকস্মিকতা, অবিশ্বাস্যতা ও নাটকীয়তায় ভরপুর। তাছাড়া এ উপন্যাসের নায়িকা অচলার দোলাচলচিত্ততা এক অপরিণত নারীর 'মূঢ়তা'র দায়ে অভিযুক্ত। তবে, 'ঘরে-বাইরে' বা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের তুলনায় শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্রে সাহসী নিরীক্ষাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিমলা মোহগ্রস্ত হয়েও অমূল্যর অদৃশ্য প্রেরণায় দ্রুত মোহমুক্তির পথে ফিরে এসেছে, স্বামী চরিত্রহীন জেনেও কুমুদিনী কোনো মূল্যেই বিপথগামিনী হয়নি। কিন্তু, অচলা মুহূর্তের ভ্রান্তিতে, স্বামীর বন্ধু সুরেশের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছে। তারপরে অবশ্য অচলার পরম সম্পদ হারানোর শোচনীয় অনুভূতি হয়েছে ! কিন্তু এই দেহমিলনও ঘটনাধারার অনিবার্য পরম্পরায় নয়, দ্রুত আকস্মিকতায় সংঘঠিত হয়েছে। ফলে দাম্পত্য সমস্যার সাহসী উপস্থাপন থাকলেও 'গৃহদাহ'কে শিল্পসার্থক উপন্যাস বলা যায় না। তুলনায় 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে অভিযোগ কম, কিরণময়ীর চারিত্রিক অবস্থান নৈতিক দিক থেকে নয়, যৌক্তিক দিক থেকে অনেকের কাছে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়েছে। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে কমলের দ্বিতীয় দাম্পত্যকে কিছুটা 'লিভ টুগেদার'-এর গোত্রভুক্ত করে শরৎচন্দ্র আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কমলের উত্থাপিত প্রশ্নগুলিও অকাট্য। কিন্তু প্রশ্নে যুক্তিতে উপস্থাপনায় যথেষ্ট আধুনিক হলেও শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' শেষ বিচারে তত্ত্বভারাক্রান্ত উপন্যাস।

আমাদের আলোচ্য পরিধির মধ্যে দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাসের ধারায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গৃহদাহ' এবং 'যোগাযোগ'কেই শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস বলা যায়। চরিত্রহীন বা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে সাহসী পদক্ষেপ থাকলেও মনোবিশ্লেষণের গভীরতা, সূক্ষ্মতা এবং শিল্পসম্মত যৌক্তিক পারম্পর্য কিছুটা উপেক্ষিতই বলা যায়। পরিকল্পনার ত্রুটি, আবেগ-বাহুল্য এবং অন্য নানা রূপ অসঙ্গতি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে রাবীন্দ্রিক শিল্পোৎকর্ষে পৌঁছুতে দেয়নি।

গ্রন্থপঞ্জি

ক) আকর গ্রন্থ

১। বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড,সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা, দশম প্রকাশ,শ্রাবণ ১৩৮৯।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, (প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম-পঞ্চদশ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮।

৩। শরৎ রচনাবলী, (১ম-৫ম খণ্ড) জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, ৩১ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা-২৯, প্রথম প্রকাশ, ১ম, ২য় খণ্ড, ১৩৮৩; তয় ও ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮৩; ৫ম খণ্ড, ১৩৮৪।

খ) সহায়ক গ্রন্থ

১। অজিত কুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৭।

২। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে স্বপ্নতত্ত্ব ও অদৃষ্টবাদ, ভারতীয় শিক্ষণ মন্ডল, ২৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর -১৯৯১।

৩। অমরেশ দাশ, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নবমূল্যায়ন, পুস্তক বিপনি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২।

৪। অমিতাভ চৌধুরী, একত্রে রবীন্দ্রনাথ (২য় খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

৫। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিম সৃষ্টি সমীক্ষা, দে'জ পাবলিসিং কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০১১।

৬। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সম্পর্ক কবি ও কবিপত্নী,
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩,
প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪১০।

৭। অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপনি, কলকাতা -৯,
নবম মুদ্রণঃ ডিসেম্বর -২০০৩।

৮। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে,
দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০০৯ ।

৯। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রঃ পুনর্বিচার, দে'জ পাবলিশিং,
১৩, বঙ্কিমচ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১০ ।

১০। অরুণ কুমার রায়চৌধুরী, অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,
৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা -১৩,
১ম প্রকাশ তৃতীয় মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, ২০০০ ।

১১। অরূপ রতন বসু, সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা,
স্নায়ুরোগ, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা - ০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৭ ।

১২। অলোক রায়, বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন
রো, কলকাতা -৬, প্রথম প্রকাশ- (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; ডিসেম্বর
২০০৯।

১৩। অশোক কুমার মিশ্র, উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ,
দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০৯ ।

১৪। অশ্রু কুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী,
৭ যুগল কিশোর দাস লেন, কলকাতা - ০৬,চতুর্থ সংস্করণ ২০০৮।

১৫। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. রবীন্দ্র প্রসঙ্গে
কবিশেখর কালিদাস রায়, রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন,
কলকাতা - ০৭, প্রথম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৯২ ।

১৬। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত রাতের তারা দিনের রবি, আনন্দ পাবলিশার্স,
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, ১ম সংস্করণ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪১৬ ।

১৭। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, উপন্যাস পাঠকের ডায়রি,
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬২ রমনাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৯ ।

১৮। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, উপন্যাসে জীবন ও শিল্প,
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ ।

১৯। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত শরৎচন্দ্র দেশ কাল সাহিত্য,
সোনার তরী, ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড,
কলকাতা - ৫৭, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারী , ২০০৭ ।

২০। কৃষ্ণগোপাল রায়, ঘরে বাইরে নবনিরীক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,
৬ /২ রমনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ০৯, দ্বিতীয় সং ২০১০ ।

২১। ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ৫৯ / ১বি পটুয়াটোলা
লেন, কলকাতা-৯, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮ ।

২২। গিরীন্দ্র শেখর বসু, স্বপ্ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩ /১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
রোড, কলকাতা-৬, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ আষাঢ় ১৪১৩ ।

২৩। গোপিকা নাথ রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মান শিল্প,
দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা - ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০ ।

২৪। গোপিকা নাথ রায় চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মান শিল্প,
দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা - ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০ ।

২৫। জগদিন্দ্র মন্ডল, মনোবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/ ১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা -২০, প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১০।

২৬। জহর সেনমজুমদার, উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশঃ মে ২০০১ ।

২৭। জহিরুল হক, সমাজ মনোবিজ্ঞান, আলেয়া বুক ডিপো, ৩৮/ ২ ক বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৭।

২৮। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় , উপন্যাসে সমাজ দৃষ্টিঃ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রকাশ কাল- নভেম্বর ১৯৯০।

২৯। জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ট্রাজেডি চেতনা, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, প্রথম নবপত্র সংস্করণ ২০০৮।

৩০। দিগ্বিজয় দে সরকার, রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী চরিত্র, এন. ই. পাবলিশার্স , ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ৩৫, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫ ।

৩১। দেবকুমার বসু, কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশণী, প্রাগুক্ত , দ্বিতীয় করুণা সংস্করণ, আগষ্ট ২০০৮।

৩২। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ফ্রয়েড প্রসঙ্গে, অনুষ্টুপ ২৬ই নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ন ১৩৫৯, অনুষ্টুপ প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৪।

৩৩। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পাভলভ পরিচিতি, পাভলভ ইনস্টিটিউট, ৯৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৭, পরিমার্জিত অখন্ড সংস্করণ, জানুয়ারী - ২০০০।

৩৪। ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার, অস্বভাবী মনোবিদ্যা এবং মনোরোগ বিদ্যার অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯১।

৩৫। নারায়ণ চৌধুরী, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৮২।

৩৬। নাড়ুগোপাল দে, উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, বঙ্কিম জন্মজয়ন্তী, ২০১০।

৩৭। নিতাই বসু, কথাশিল্পীর অ্যালবাম, অভিজাত প্রকাশণী, ১২২ / ৩ রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর -১৯৯৯।

৩৮। নিতাই বসু, রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/ ৩ এ, কলেজস্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০২।

৩৯। নীহার রঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১২বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, অঘ্রাণ, ১৪১০।

৪০। নৃপেন্দ্র কুমার বসু, ফ্রয়েডের ভালবাসা, বাণী লাইব্রেরী, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ০৯, জানুয়ারী ২০০৩।

৪১। নৃপেন্দ্রকুমার বসু, ফ্রয়েডের নারী চরিত্র, বীণা লাইব্রেরী, ষষ্ট সংস্করণ ১৪১৫।

৪২। পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, সিগ্‌মন্ড ফ্রয়েড মনঃ সমীক্ষণের রূপরেখা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা) লিঃ, ৮/ ১ চিন্তামনি দাস লেন, কলকাতা - ০৯, সেপ্টেম্বর ২০০৭।

৪৩। প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯ / ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০।

৪৪। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি, গবেষণা প্রকাশন সমিতি, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ,২২শ্রাবণ ১৩৮৫ ।

৪৫। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, ১০ নং পিটোরিয়া স্ট্রীট, কলকাতা -৭১, চতুর্থ সংস্করণ , ১৩৮৩ চৈত্র ।

৪৬। প্রলয় শূর, বিমলা এলা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ , ২০০৯ ।

৪৭। প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ - জানুয়ারী ২০০৪ ।

৪৮। প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, মনোবিদ্যা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, নবম সংস্করণ (পুণর্মুদ্রণ) ২০১১-১২ ।

৪৯। বার্ট্রান্ড রাসেল, বিবাহ ও নৈতিকতা , র‍্যাডিক্যাল, ৪৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশঃ মে, ২০০১ ।

৫০। বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র কথা সাহিত্যে চরিত্র ব্যাখান, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, ৩য় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৯ ।

৫১। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, মনোবিদ্যার অভিধান, পাভলভ ইনস্টিটিউট, ৯৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ০৭, প্রথম প্রকাশ , জানুয়ারী ২০১১ ।

৫২। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশকাল ঃ মে ১৯৯১ , ৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১৩।

৫৩। বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, ৪র্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৮৩ ।

৫৪। ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দে'জ পাবলিসিং,
কলকাতা - ৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৮।

৫৫। ভব রায়, মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা
ভুল ও অন্যান্য সিগমুন্ড ফ্রয়েড, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট,
কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০৪ ।

৫৬। ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে , দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০১।

৫৭। মানব গঙ্গোপাধ্যায়, উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র , প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, পুনমুর্দ্রণ ঃ জুন, ২০১১।

৫৮। মোহিত লাল মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও বঙ্কিমবরণ,
করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা -৯,
প্রথম প্রকাশ , ২০০৫।

৫৯। রথীন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্র মনন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর-১৯৮৭ ।

৬০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খন্ড),
ওরিয়েন্ট বুক কম্পানি, ৯ শ্যামচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭৩, ৪র্থ সং ২০০৮।

৬১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, অষ্টম পুণর্মুদ্রন সংস্করণ, ১৯৮৮।

৬২। পরেশনাথ ভট্টাচার্য, মনোবিদ্যা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পনী প্রা. লি. ,
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ১২, প্রথম সং ১৩৭০ ।

৬৩। প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সরণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণঃ মাঘ ১৪১৬।

৬৪। ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ২য় সং ২০০১ ।

৬৫। সত্যবতী গিরিও সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, ৫৫ ডি কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা -৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯।

৬৬। সত্যব্রত দে, রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রাগুক্ত, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১০।

৬৭। সর্বানী বিশ্বাস, রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী, পুনশ্চ, ৯ এ, নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭ ।

৬৮। সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, মনোবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রা. লি., ৩৫ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, ৪র্থ সংস্করণ আগষ্ট, ২০১১ ।

৬৯। সমরেশ মজুমদার, বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, রত্নাবলী,৫৯ এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ নভেম্বর ১৯৮৬।

৭০। সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), জগদীশ গুপ্তঃ জীবন ও সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬ ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা -০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা বইমেলা, ২০১২।

৭১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং , প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮০ ।

৭২। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনোবিশ্লেষণ, ভাষান্তর, সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপায়ন, প্রাগুক্ত , দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৫।

৭৩। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা-স্বপ্ন , ভাষান্তর, অরূপ রতন বসু, চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই ২০০৭।

৭৪। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, স্বপ্ন বিশ্লেষণ, ভাষান্তর, অরূপ রতন বসু, দীপায়ন প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৪।

৭৫। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাগুক্ত, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১২।

৭৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র সমালোচনা সাহিত্য,
এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রা. লি., ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩,
অষ্টাদশ সংস্করণ ঃ মাঘ ১৪১৪ ।

৭৭। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড,
২বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩, চতুর্থ সংস্করণ ঃ নভেম্বর ২০০০।

৭৮। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র (সমালোচনা সাহিত্য), প্রাগুক্ত, এয়োদশ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৯২।

৭৯। সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাসের বহুরূপে, অক্ষর প্রকাশণী, প্রগুক্ত, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১০।

৮০। সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা (সঙ্কলন),
পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রা. লি., ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, ডিসেম্বর ২০০০।

৮১। স্বাগতা দাসমোহান্ত, বিষয় ঃ রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রাগুক্ত , প্রথম প্রকাশ, ২২শ্রাবণ, ১৪১৭।

৮২। স্মরণ আচার্য, রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, সাহিত্য শ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৬।

৮৩। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদিনী কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রূপসী বাংলা, ২০ এ রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা - ০৬, প্রথম প্রকাশ , ১৪১৫।

৮৪। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিচিত্র বিষয় ও রীতি রজনী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬ / ২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ (পুনর্মুদ্রন), বইমেলা ২০১০ ।

(1) ALFRED ADLER, AN INTRODUCTION TO HIS PSYCHOLOGY, EDITED BY LEWIS WAY PUBLISHER, HARMONDSWORTH, MIDDLESEX, PENGUINE (1956 ed.)

(2) CALVIN SPRINGER HALL, A PRIMER OF FREUDIAN PSYCHOLOGY, PUBLISHER, NEW AMERICAN LIBRARY (1954 ed.) ORIGINAL FROM INDIAN UNIVERSITY.

(3) FORDHAM FRIEDA, AN INTRODUCTION TO JUNGS PHYCHOLOGY , PUBLISHER, PELICAN BOOKS (1956 ed.)

(4) SIGMUND FREUD , INTRODUCTORY LECTURES ON PSYCHOANALYSIS, TRANSLATED BY JOAN RIVIERE , PUBLISHER, GEORGE ALLEN & UNWIN, LONDON (1922 ed.)

(5) SIGMUND FREUD , THE BASIC WRITING OF SIGMUND FREUD, EDITED BY A.A. BRILL, PUBLISHER, NEW YORK, MODERN LIBRARY (1938 ed.)

(6) WOLFGANG KOHLER, GESTALT PSYCHOLOGY, PUBLISHER, SIGNET, FIRST EDITION (1959 ed.)

গ) সহায়ক সাময়িক পত্রপত্রিকা

১। পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্র সংখ্যা), দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), ১৪০২, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা -৭০০০০১।

২। বঙ্কিম স্মারক সংখ্যা, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত, দশম বর্ষ ১৯৮৯, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা -৭৩ ।

৩। বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, মানস মজুমদার ও বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম সম্পা.) চতুর্দশ সংখ্যা, ২০০৫, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা -৭৩।

৪। বিজ্ঞাপন পর্ব, রবিন ঘোষ (সম্পা.) সিগমুন্ড ফ্রয়েড সংখ্যা, ৩০ তম বর্ষঃ কার্তিক ১৪০৯, ১৪, হেয়ার স্ট্রীট, কলকাতা -৭০০০০১।

৫। শুভশ্রী, পুলক কুমার সরকার (সম্পা.) ৪২বর্ষ, ১৪১০, ৭, রামবাবু লেন, খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০৩।

LIBRARY
NBU. DARJEELING